# KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No. KLMLGK 2007 | Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩ |
| Collection : KLMLGK | Publisher মীর ওসমান |
| Title চতুরঙ্গ | Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m. |
| Vol & Number : ৫৩/৩<br>৫৩/৪<br>৫৩/৫-৬<br>৫৩/৮ | Year of Publication : আষাঢ় ১৩৯৯ // July 1992<br>শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৯৯ // Aug 1992<br>ভাদ্র-কার্তিক ১৩৯৯ // Sep-Oct 1992<br>অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ // Dec 1992 |
| | Condition : Brittle Good |
| Editor : আবদুর রউফ | Remarks : |

CD Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

# চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ৪ আগষ্ট, ১৯৯২

বিশ্বসাহিত্যের চর্চা এবং মাতৃভাষার সমৃদ্ধিসাধনের মধ্যে সাবলীল সমন্বয় স্থাপনে তিরিশের দশকের সবচেয়ে বেশি সফল কবি অমিয় চক্রবর্তীকে নিয়ে শিবনারায়ণ রায়ের দীর্ঘ নিবন্ধ ''লাটিম থেকে লাটাই''।

ইংরেজি সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি পার্সি বিশ্ শেলির জন্মের দ্বিশত বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিশেষ প্রবন্ধ 'শেলি চিরকালের'।

সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ্ পর্যালোচনা করেছেন বর্গাদার প্রশ্নটির চরিত্র এবং সংগঠনের শতবর্ষব্যাপী ক্রমবিবর্তনের ধারা।

বাংলায় পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের পথিকৃৎ ভূমিকা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য-সম্বলিত আলোচনা।

বিদ্যাসাগরের বাড়ি সংক্রান্ত বহু দুর্লভ তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনায় ইতিহাস এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই মহান পুরুষকে অন্তরঙ্গভাবে জানার ভিন্ন ধরনের সুযোগ।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-র সুবর্ণরেখা সংস্করণে নকশাবর্ণিত বড়লোকদের শনাক্তকরণ প্রয়াস কতখানি সার্থক? এই নিয়ে অধ্যাপক অলোক রায়ের আলোচনা।

ভারতের ব্যাঙ্কিং শিল্পের বর্তমান সংকটের স্বরূপ বিশ্লেষণ।

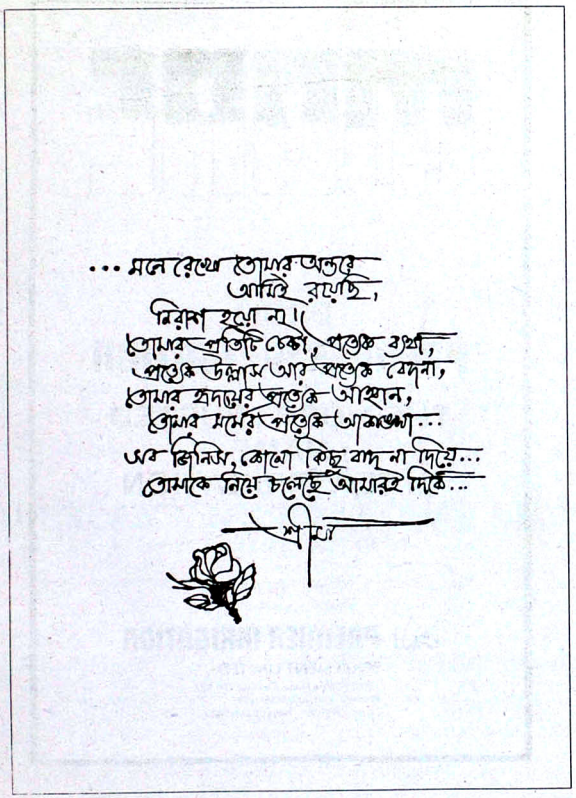

...মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যর্থতা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্খা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা



বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ৪
অগস্ট ১৯৯২
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৯৯

লাটিম থেকে লাটাই : বিশ্বপথিক কবি ও মনীষী অমিয় চক্রবর্তী শিবনারায়ণ রায় ২৪৯
শেলি চিরকালের সনাতন মিত্র ২৬৪
বিদ্যাসাগরের বাড়ি অমিয়কুমার সামন্ত ২৭৭
বাংলা পরিভাষার সূচনাকাল ও বিদ্যাসাগরের পরিভাষা চিন্তা অশোক রায় ২৯১
জাত বৈষ্ণব কথা অজিত দাস ২৯৮
বর্গাদার প্রসঙ্গ সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ ৩০৫

**কবিতা**

পরম্পরা সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ২৬০
কিছু না রত্নেশ্বর হাজরা ২৬১
সে একটি চন্দ্রমল্লিকা নাসের হোসেন ২৬২
এক টুকরো কবিতার জন্য রমা পাহাড়ী ২৬৩

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

**গল্প**

মুখের খোঁজে অসীম রেজ ২৭৩

**গ্রন্থ সমালোচনা**

হুতোমের নতুন সংস্করণ অলোক রায় ৩০৮
বাঙালির ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ পুলকনারায়ণ ধর ৩১১
বাংলাদেশের দুই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের জীবন ও সাধনা নিবেদিতা চক্রবর্তী ৩১৩
স্মৃতি সুধা ভবতোষ দত্ত ৩১৫
জাস্টিস মামুদ শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৬
কার্পেটের অন্য দিক ও 'নরকে এক ঋতু' মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ৩১৭
বিচিত্র কাহিনী সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৩১৭

**অর্থনীতি**

এক নজরে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং শিল্পের বর্তমান সংকট বেণু গুহঠাকুরতা ৩২০

**মতামত**

SAARC-এর অভিজ্ঞতা কনফেডারেশন ব্যবস্থার পক্ষে আশাব্যঞ্জক নয় পার্থসারথী রুদ্র ৩২৪
ফকিরমোহন সেনাপতি সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৩২৫
'১৩৫০-এর মন্বন্তর...' অশোক মিত্র ৩২৫
প্রমথ চৌধুরীর ছেলের রবীন্দ্রনাথের জামাই নন হাসির মল্লিক ৩২৫
প্রমাদ সংশোধন অতীন্দ্রমোহন গুণ ৩২৬

শ্রীমতি নীরা রহমান কর্তৃক পি এম বাক্‌চি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলি - ৬
থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা - ১৩
থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত

*অফিস ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলি - ১৩* *দূরভাষ ২৭ ৬৩২৭*

শিল্প পরিকল্পনা রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক আবদুর রউফ

সংখ্যা ৩ জুলাই ১৯৯২-এর চতুরঙ্গে কে পি বাগ্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ঘটায় আমরা দুঃখিত। ওই বিজ্ঞাপনের পুস্তকের নামগুলি পুনর্মুদ্রিত হল।

*সদ্য প্রকাশিত বই*

**বিশ্ব-ইতিহাস অভিধানঃ ১৭৮৯-১৯৫০**
সুভাষ ভট্টাচার্য — দাম: ৮০.০০

**সংহতি লাঙ্গল গণবাণী**
গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত — দাম: ৭০.০০
*আমাদের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই*

**কাকে বলে ইতিহাস?**
ই এইচ কার — Rs. 60.00

**সমাজবিদ্যাঃ তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা**
টম বটোমোর — Rs. 80.00

**মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি**
অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত — Rs 80.00

**বাংলার আর্থিক ইতিহাস (বিংশ শতাব্দী)**
সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় — Rs. 60.00

**The Roles of sense and Thought in Knowledge**
**By Pranab Kumar De** — **Rs. 150.00**

**Ecological and Resource study of the Ganga Delta**
**By A. K. Basu** — **Rs. 130.00**

**Political Economy of Indian Agriculture.** — **Rs. 300.00 (H.B.), Rs. 120.00 (P.B.)**
**By Ashok Rudra**

**The Agrarian Economy of Tamilnadu: 1820-1855**
**By Arun Bandopadhyay** — **Rs. 250.00**

**A Greek Interlude—Kuruvila Zachariah: His life and Writings**
**(ed.) Shireen Maswood** — **Rs. 150.00**

**কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী**
২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১২

**প্রতিটি গ্রন্থই চিরায়ত চিরনতুন নিত্যসঙ্গী**

কলকাতার ইতিহাসের সর্বকালের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ
হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
**কলিকাতা সেকালের ও একালের**
সম্পাদনা : নিশীথরঞ্জন রায় — ১২৮.০০

প্রাচীন ভারতীয় প্রজ্ঞার আকর
তারাকান্ত কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য
**শ্রীমদ্ভাগবত (গদ্যে)** — ৮০.০০

আদি কবির অমর মহাগ্রন্থ
**বাল্মীকি রামায়ণ (গদ্যে)** — ৯০.০০
**শ্রীমদ্ভগবদগীতা** — ১২.০০

অমর কবি জয়দেবের অমর কীর্তি
অমরেন্দ্র নাথ রায়
**শ্রীগীতগোবিন্দম্** — ২০.০০

হিন্দুর গৌরব জ্যোতি : মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত
**মহাভারত (অষ্টাদশ পর্ব)** ১ম খন্ড ৯৫.০০

নয়জন অসামান্য ভারতীয় নারীর জীবন আলেখ্য
**নবনারী** — ১২.০০
১৪২ টি আগমনী ও বিজয়ার গান
অমরেন্দ্র নাথ রায় সংকলিত
**শারদীয় সঙ্গীত** — ১২.০০

হিন্দুধর্মের যাবতীয় শাস্ত্রসম্মত আচার অনুষ্ঠানের একমাত্র দলিল
**পুরোহিত দর্পণ (অখন্ড)** — ৮০.০০

**পি. এম. বাক্‌চি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড**
১৯, গুরুওস্তাগর লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৬
২৪ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১

# লাটিম থেকে লাটাই : বিশ্বপথিক কবি ও মনীষী অমিয় চক্রবর্তী

শিবনারায়ণ রায়

আমাদের যুবকালে যখন অখণ্ড বঙ্গদেশ দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবমান, যখন বিশ্বযুদ্ধের মহাবর্তে এবং হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের আগুন বিস্তারে বাঙালির সামূহিক বিনাশ প্রায় অনিবার্য, তিরিশের শেষার্ধ এবং গোটা চল্লিশ দশক জুড়ে ইতিহাসের সেই অমাবস্যা পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যের প্রায় একই সঙ্গে অবিশ্বাস্য সমারোহে অনেকগুলি প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে। সামাজিক-রাষ্ট্রিক-আর্থিক বিপর্যয় এবং সৃজনশক্তির প্রস্ফুটন যে কখনো কখনো যুগপৎ ঘটতে পারে বিশের দশকের হাইমার জার্মানি এবং তিরিশ-চল্লিশের বঙ্গদেশ তার দুটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

তখন বুঝতে পারি নি, কিন্তু এখন পিছন ফিরে চাইলে প্রত্যক্ষ হয় যে মানব- ইতিহাসের সবগুলি তরঙ্গ একই সময়ে একই দিকে অথবা সমান গতিবেগে সর্বদা প্রবাহিত হয় না। শুধু যে বিভিন্ন দেশে বা অঞ্চলে সভ্যতার বিনাশ ও বিকাশ বিভিন্ন সময়ে ঘটে তাই নয়— যাকে সচরাচর বলা হয় পশ্চিম ইয়োরোপের অন্ধকার যুগ সেই কালেই আরব সভ্যতার দ্রুত বিস্তার এবং বিকাশ স্মরণীয়— একই অঞ্চলে ও সমাজে সভ্যতার একটি দিক যখন স্পষ্টতই মুমূর্ষু অন্য আরেকটি দিক হয়ত ঠিক তখনই নবনব উদ্ভাবনায় প্রথ্যাপিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অবসিত হয় নি, বঙ্গদেশবাসীদেরও আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সর্বনাশ ঘটে। দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ স্ত্রীপুরুষ মারা যায়; 'একটু ফ্যান দাও গো'-র সেই অসহায় নিরন্তর হাহাকার ধ্বনি আর কলকাতার পথেঘাটে পড়ে থাকা অনাহারে কংকালপ্রায় মৃতদেহের অভিশপ্ত স্মৃতি আমার প্রজন্মকে গ্রীক ফিউরিদের মতো আমৃত্যু তাড়না করবে। তারপর ধর্মযুদ্ধের নামে সেই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড, দেশবিভাগ, অগণিত উৎখাত স্ত্রীপুরুষের নিরাশ্রয় অবস্থায় দেশান্তর, শিয়ালদা স্টেশনে হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের অমানুষিক দুর্গতি। পিছনে তাকিয়ে আজ প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয় যে নিরবচ্ছিন্ন এই দুর্দশাপ্রবাহে নিতান্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সেদিন তলিয়ে যাই নি, বিপর্যয়ের নাকানিচোবানি খেয়েও মানুষী সৃজনসামর্থ্যে আস্থা অটুট ছিল। আমি আকৈশোর নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক, কিন্তু কোনোদিনই শুভনাস্তিক নই। মানবতন্ত্রী প্রত্যয়ের পোষণে ও বর্ধনে বহু খ্যাতনামা ও অখ্যাতনামা স্ত্রীপুরুষের সহায়তা পেয়েছি। কবি ও মনীষী অমিয় চক্রবর্তী তাঁদের ভিতরে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বয়সের ব্যবধান ছিল বিশ বছরের; প্রজ্ঞা ও প্রতিভার দূরত্ব ছিল অপরিমেয়। তবু অতি সহজেই তিনি আমাকে বন্ধুত্বের মর্যাদা দিলেন, এবং আমৃত্যু সেই সম্পর্কে গ্লানি স্পর্শ করে নি।

তিরিশ এবং চল্লিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে বহুজনিক প্রতিভার সেই একই সঙ্গে প্রস্ফুটন আজও অপ্রতিম। বঙ্কিমের পরে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যের বস্তুত একচ্ছত্র সম্রাট ; তাঁর অনিঃশেষ প্রতিভা তাকে নানা ভাবে পরিপুষ্ট এবং চালিত করে এসেছে ; শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী এবং নজরুল ইসলাম তাঁর সমকালের শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী লেখক হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যে পর্বান্তর ঘটান নি। রবীন্দ্রপ্রতিভার বর্ণাঢ্য সূর্যাস্তকালে সাময়িকভাবে হলেও নতুন পর্ব সূচিত হয় ; গদ্যে পদ্যে যুগপৎ দেখা দেয় অনেকগুলি প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব — বিষয়-নির্বাচনে, প্রতিন্যাসে, রীতিসংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষায় যাঁদের মৌলিকতা আজ প্রশ্নাতীত। কবিতায় জসীমউদ্দীন, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্র, অমিয়, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু, সমর, সুভাষ ; কথাসাহিত্যে প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, অন্নদাশঙ্কর, মানিক, শরদিন্দু, ধূর্জটিপ্রসাদ প্রত্যেকের সাহিত্যসৃষ্টি নিজস্বতার দ্বারা চিহ্নিত এবং সমবেতভাবে নতুন পর্বের স্বাক্ষরবাহী। আর সাহিত্যপত্রিকা ? আমার তরুণ বয়সে একই সঙ্গে যতগুলি সাহিত্যপত্রিকা নিয়মিত বেরোতো তার আগে অথবা পরে অতগুলি বিচিত্র প্রকৃতির উৎকৃষ্ট পত্রিকা একই সময়ে বাংলাভাষায় দেখা যায় না। *প্রবাসী, বিচিত্রা, মাসিক মোহাম্মদী, পরিচয়, কবিতা, চতুরঙ্গ, পূর্বাশা* — সাহিত্য পরিষদের পাঠাগারে প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের প্রায় প্রহরব্যাপী ভোজে পদের অভাব ছিল না। কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বিবিধ অনুশীলনের বিষয় ছিল দর্শন, ইতিহাস, বিশ্বসাহিত্য, বটানি, রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্র, এবং সব বিষয়েই মাধ্যম ছিল ইংরেজি কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ কৈশোরে কাশীরাম দাশ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত গড়ে দিয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের পরে তাকে পুষ্ট করে তোলেন মুখ্যত তিরিশের এবং চল্লিশের প্রতিভাবান কবি ও কথা-সাহিত্যিকবৃন্দ। জাত-পাত, পূজা-পার্বণ, সাম্প্রদায়িকতা-অধ্যুষিত বাঙালি জাতি বা সমাজ আমাকে কখনো বিশেষ আকৃষ্ট করে নি, কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সামর্থ্য ও সম্ভাবনা অল্পবয়েস থেকেই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। ইংরেজি ভাষা ও বিশ্ব সাহিত্যের চর্চা এবং মাতৃভাষার সমৃদ্ধিসাধনের ভিতরে যে কোনো প্রকৃত বিরোধ নেই, তিরিশ-চল্লিশের দশকের কবিদের ভিতরে এটি আমার কাছে সব চাইতে পরিস্ফুট করে তোলেন অমিয় চক্রবর্তী।

*খসড়া* (১৩৪৫) কাব্যগ্রন্থ যখন প্রথম পড়ি তখন আমি কলকাতায় কলেজের ছাত্র, অমিয় চক্রবর্তী সে সময়ে লাহোরে অধ্যাপনা করতেন। তাঁকে দেখি নি, তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না, কিন্তু মনে হল আমার সেই সময়কার দুই প্রিয় কবি রবার্ট ব্রাউনিং এবং ওয়াল্ট হুইটম্যানের সঙ্গে এই বাঙালি কবির যেন আত্মীয়তা আছে। সুধীন্দ্রনাথ নাকি 'কুক্কুট' লিখে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে কবিকল্পনা সর্বভুক্। অমিয় বললেন, 'আধুনিকের কাব্য/ সামনে খোঁজে অভাব্য/ ভিত্তি, মনের ধারণ—/ হার-মানা তার বারণ'— কারণ তার হাতে আছে 'চিন্ময় দেয়াশালাই' ('অতি-আধুনিক')। তাই তিনি দেখতে পেলেন 'ধ্যানের সিনেমাতে/ মুদির দোকান, মাছি মাতে' ('পুকুর')। ধুলোয়, মগজের গলিতে বিচিত্র দাগ, সতত আসা-যাওয়া, সবই অপূর্ণ, খসড়া, আর তা নিয়েই কবিতা, 'খসড়া'য় যার আভাস ছিল, হাত তখনো পাকে নি, তা আরো স্পষ্ট এবং ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ হয়ে আকার পেল পরের বই *এক মুঠো* (১৩৪৬)য়। বিষয়, উপমা, ছন্দ, মিল, শব্দচয়ন, দেখার চোখ সবই অভিনব, অনাস্বাদিতপূর্ব, রবীন্দ্রনাথের প্রবল, মহাসম্পন্ন, বহুপ্রসারিত ঐতিহ্য থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। অমিয় চক্রবর্তী যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অন্তরঙ্গ, তিনি যে বেশ কিছুকাল মহাকবির সাহিত্যসচিব হিসেবে কাজ করেছেন, বিশের দশকের বেশিটাই তাঁর কেটেছে শান্তিনিকেতনে— এসব কথা 'এক মুঠো' পড়বার আগে জানতে পারি। অথচ তাঁর কবিতার দেহে, মেজাজে রীতিতে রাবীন্দ্রিকতার চিহ্ন চোখে পড়ে না।

> এক্কার ঘণ্টা, হুড়মুড়ে চাকায়, ডুব
> মাছি ধুলো, ছেঁড়া খানিক দাড়ি চুলে
> তালিদেওয়া সাল্‌ওয়ার চটা কামিজে ডুব ডুব
> বাঁ পাশের গলির গিজগিজে ডুব
> নীল টালি গম্বুজের ফালি
> গ'লে গেছে দুপুরের হাওয়ায় ঝিলমিল ( *সঙ্গং* )
>
> ড্রেন, ধুলো, মাছি, মশা, ঘেয়ো কুত্তোর
> আড়ং বেঁধে আছো, বাঁচো ( *কিমাশ্চর্য বাঁচা* )

এবং

> যমের কৃপায় মরা
> অমৃতস্য অধমপুত্র, বন্দী স্যাঁৎস্যাঁতে গলির ঘরে ইঁদুর ভরা ;
> নেই রাগ। — অবশ্য। আছো আনন্দে।
> খাও ভেজাল ঘিয়ের জিলিপি,
> শিশু কাঁদায়, ধোঁয়ার সংসার, খুলে ওষুধের ছিপি





> মা-বোনকে খাওয়াও — দয়ার ডাক্তার অন্তিম লাগলে,
> তৎপূর্বাবধি রান্নার পাকে ক'ষে চড়াও : নিজে ভাগলে
> শক্ত সিনেমার সীটে, ইতর প্রাণের গিল্টি
> মুখ-ভরা পান, দৃশ্য হলিউড, মোমের পিল্‌টি
> ভোলায় ধিক্কার, সঙ্কোটা কাটে। ( *চেতন স্যাকরা* )

টেলিগ্রাফিক ভাষায়, ছন্দমিলের অভিনবত্বে, লঘুগুরুর বিস্ময়কর মিশ্রণে তিনি বিশেষ নিপুণতায় যে একান্তভাবে নিজস্ব কাব্যরীতি প্রণয়ন করলেন তা প্রায় মাইকেলের অমিত্রাক্ষরের মতোই বৈপ্লবিক। এবং এখন মনে হয় তা প্রায় মাইকেলের মতোই পূর্বেপরে পরম্পরাহীন। 'আছি এখন মার্স-এ। দেউলে লাল বাতি জ্বালা। // শ্যামল পূর্বগ্রহ থেকে/ রেলেটিভ্ শূন্যে বেঁকে/ এলো স্বাদ, চেনা' ( *মাঙ্গলিক* )। এ স্টাইল বাংলা কবিতায় অনাস্বাদিতপূর্ব। দর্শন বিজ্ঞান, বাজার বস্তি, উপনিষদ এবং স্ল্যাং, ফার্সি, ইংরেজি, মমতা, বিদ্রূপ — সব মিলিয়ে এক নতুন ধরনের কম্পোজিশন।

ফলত তাঁর কবিতার সূত্রেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হই। কলেজে ছাত্রাবস্থায় মার্কসের রচনাবলী পড়ে গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম। ইয়োরোপে ফাসিস্ত-নাত্‌সি রাষ্ট্রের বীভৎস স্বরূপ ও সম্প্রসার বিষয়েও অজ্ঞ ছিলাম না। সভিয়েট-জার্মান চুক্তির অব্যবহিত পরেই যখন মহাযুদ্ধ বাধল, অল্প সময়ের ভিতরে পশ্চিম ইয়োরোপের বেশিটাই নাত্‌সি-ফাসিস্তদের দখলে এসে গেল, কোথাও আশা-ভরসার চিহ্ন দেখি না, সেই সময়ে পড়ি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা 'যুদ্ধের খবর'। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'প্রাণের দুঃখ ছোঁয় সর্বত্র, সৃজনাকাশ বাঁধা চেতনায়'। কিন্তু এখন দেখছেন, 'নাক্ষত্রিক বিশ্বে, মায়াহীন মাটিতে, প্রাচীন// জলে নেই মমতা, বিন্দু করুণা বোবা ঝড়ে।' মহাসৃষ্টি উদাসীন, নিরুত্তর, আবেদন ; 'বেদনার শিরা নেই সমাজে-ও'। তাহলে আমরা কী করব ? অমিয় লিখলেন, 'খোঁজো ধারা', 'সবের মধ্যে প্যাটার্ন মনুষ্যধর্মী', 'চাও প্রাণের সমাজ, নূতন উপনিবেশ', 'বদলাও, বদলাও পরিবেশ' যেখানে প্রাণ, অন্ন, বিদ্যা ব্যাপ্ত সংসারে। বললেন দেখতে সেই 'অদৃশ্য ছবি'। মানুষটিকে জানবার জন্য মনে আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠল।

তার সুযোগ ঘটল স্নাতকোত্তর বিভাগে ভরতি হবার কিছু পরে। আমি ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে বেশিটা সময় পড়াশুনো করি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে। এজরা পাউণ্ড এবং টি. এস. এলিয়টকে কিছু দিন হল আবিষ্কার করেছি। অভিলাষ হল পাউণ্ড-এলিয়ট থেকে অডেন পর্যন্ত দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালের কিছু কবিকে নিয়ে একটি গবেষণানিবন্ধ লিখব, এবং অনুমতি পেলে এম.এ.-এর দুটি পেপারের পরিবর্তে সেটি পেশ করব। কিন্তু তখন যিনি ইংরেজি বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক মোহিনী ভট্টাচার্য, তিনি আপত্তি তুললেন। তিনি স্বয়ং এঁদের লেখা আদৌ পড়েন নি, এবং তাঁর ধারণা বিভাগীয় অন্য সহকর্মীদের কাছেও এঁরা অজ্ঞাতকুলশীল। আমার প্রস্তাবটি যখন প্রায় নাকচ হবার উপক্রম তখন খবর পেয়ে এগিয়ে এলেন অমিয় চক্রবর্তী। তিনি ১৯৪০ সালে লাহোর থেকে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। পড়াতেন রোমাণ্টিক কাব্যসাহিত্য, কিন্তু তাঁর বক্তৃতা সে সময়ে আমার মনে দাগ ফেলে নি। আমার নির্বাচিত বিষয়ের কথা জেনে তিনি স্বয়ং নির্দেশকের দায়িত্ব নিলেন ; তাছাড়া আমার প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন তারকনাথ সেন। (এই অসামান্য শিক্ষকের প্রতিটি ক্লাস আমি করেছি এবং ছাত্র হিসাবে তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।) ফলে অনুমতি মিলল। পরে অমিয় আমাকে বলেন, তিনি নিজে এলিয়ট এবং পাউণ্ডের উপর গবেষণা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁকে অনুমতি দেন নি, কারণ কর্তৃপক্ষের মতে এঁরা না কবি না ইংরেজ (They are neither poets nor Englishmen) ! ফলে তাঁকে টমাস হার্ডির ডাইনাস্টস এবং কবিতায় যুদ্ধোত্তর যুগ বিষয়ে গবেষণা নিবন্ধ লিখে ডক্টরেট অর্জন করতে হয়। এ কারণেই আমার প্রস্তাবটির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অমিয় চক্রবর্তীর বসবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত জায়গা ছিল না। বিনা দ্বিধায় এই মনস্বী কবি-অধ্যাপক তাঁর এলগিন রোডে ফ্ল্যাটের দ্বার আমার জন্য অবারিত করে দিলেন। ১৯৪১-৪২ সালে আমি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একদিন, কখনো দুদিন, তাঁর কাছে যেতাম ; গবেষণার কাজ যে সব সময় এগোতো এমন নয় ; কিন্তু সমকালীন ইংরেজ কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে তাঁর কাছে বিস্তর সংবাদ পাওয়া যেত। তাঁর নিজের সংগ্রহ থেকে অকৃপণ ভাবে বই, পত্রপত্রিকা পড়তে দিতেন। আমাদের আলোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকত না। দশটা নাগাদ তাঁর ফ্ল্যাটে গেলে কথায় কথায় দুপুর হয়ে যেত। হৈমন্তী দেবী ডাক দিতেন তাঁদের লাঞ্চে অংশভাক্ হবার জন্য। আমি থাকি উত্তর কলকাতায়। প্রায়ই এলগিন রোড থেকে ফিরতে বিকেল হয়ে যেত।

লাঞ্চ প্রসঙ্গে কিছু স্মৃতি আছে। অমিয় এবং হৈমন্তী

দুজনেই খুব মিতাহারী — একজন যদি প্লেটে নেন এক বা দু চামচ ভাত, অন্যজন বড়োজোর তিন কি চার চামচ। আমাকে পাঁচ চামচ ভাত নিয়ে হৈমন্তী শুধোতেন, আরেক চামচ দিই। আমার বয়স তখন কুড়ি/ একুশ। পেটে দুরন্ত খিদে, কিন্তু চাইতে লজ্জা করত। ফলে তাঁদের সঙ্গে লাঞ্চের পর আমি কিছুটা সময়ের জন্য নীচে নেমে যেতাম। অমিয় লক্ষ করেন নি, কিন্তু দু-তিন দিন নীচ থেকে ঘুরে আসবার পর হৈমন্তী একদিন বললেন, শিবনারায়ণ, সিগারেট খাবার জন্য বাইরে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই, আমরা সিগারেট খাই না বটে, কিন্তু আপনি অবশ্যই এখানে সিগারেট খেতে পারেন। বলে তিনি একটি সুদৃশ্য ছাইদানী এগিয়ে দিলেন। সঙ্কোচবশত আমি তাঁদের বলতে পারি না, ধূম্রপানের নেশায় নয়, তাঁদের সঙ্গে লাঞ্চের পরে এলগিন রোডের কোণের দোকানে রুটি এবং ডাল খাবার জন্য নীচে নামি। হৈমন্তী প্রথম থেকেই আমাকে পরিবারের একজন করে নিয়েছিলেন ; কিন্তু তাঁর সামনে আমার আড়ষ্টতা জয় করতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল।

অমিয় চক্রবর্তী যে জগতে বাস করতেন সেই চিত্তলোকে ঘোরাফেরায় কিন্তু আমার কোন সঙ্কোচ ছিল না। পাউণ্ড এবং এলিয়টের কাব্যের অনেকটাই দুরূহ ; আমরা দুজনে মিলে অর্থোদ্ধারের চেষ্টা করেছি ; অনেক সময় গ্রন্থিমোচন করেছেন তিনি কখনো সখনো আমি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা একটি কবিতা বা কাব্যাংশের ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছি। তাঁর মস্ত গুণ ছিল বয়সে এবং বিদ্যায় আমার চাইতে অনেক বড়ো হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিজের ধারণা কখনো আমার উপর চাপানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নি। সুধীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে নিজের বক্তব্য এবং যুক্তি ঘোষণা করতেন ; তর্কে তাঁর আনন্দ ছিল ; কোনো সিদ্ধান্তই তাঁর কাছে চরম সিদ্ধান্ত ছিল না, কিন্তু যখন যেটি বলতেন তখন সেটিই মাত্রাধিক জোর পেত। বুদ্ধদেবও উচ্চকণ্ঠে মতপ্রকাশ করতেন — ভিন্ন মত প্রকাশ করলে তর্ক তুমুল হয়ে উঠত। সৌভাগ্যবশত সুধীন্দ্রের অকপট সৌজন্য এবং বুদ্ধদেবের স্বতঃস্ফূর্ত দমকে দমকে সিলিং ছোওয়া হাসি মতভেদকে তিক্ততার আক্রমণ থেকে সতত রক্ষা করত। তবে দুজনেই ছিলেন মেজাজ এবং ক্রিয়াকলাপে গোষ্ঠীপতি — সুধীন্দ্র 'পরিচয়' গোষ্ঠীর, বুদ্ধদেব 'কবিতা' গোষ্ঠীর। অমিয়-র কোনো নিজস্ব পত্রিকা অথবা গোষ্ঠী ছিল না। ক্ষীণকায় মৃদুভাষী মানুষটির কিছু গভীর প্রত্যয় ছিল, কিন্তু বিতর্কে তিনি অনাগ্রহী অথবা আস্থাহীন। অপরপক্ষে জীবনানন্দের মত তিনি সঙ্গ-বিমুখ ছিলেন না — বস্তুত নরনারী, পশুপাখি, শহরগ্রাম, বিশ্বের বিচিত্র অধিবাসী এবং বিভিন্ন অঞ্চলের হরেক রকম প্রাকৃতিক রূপ সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ছিল অপরিসীম। সঙ্গ ভালোবাসতেন, কিন্তু সব সময়েই মনে হয় তাঁর অস্তিত্বের কেন্দ্রে এক গভীর নিরাসক্তি তাঁকে সচল রাখত। প্যাশন বা আবেগের আতিশয্যকে তিনি সচেতনভাবে এড়িয়ে চলতেন। তাঁর কাব্যরীতির অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আমার মনে হয় প্যাশনের প্রাবল্যকে দমন করবার সাধনায় অর্জিত— সংক্ষিপ্ত বাক্যগঠন, উলম্ফ ছন্দ, চিত্র থেকে চিত্রান্তরে দ্রুত চলাচল, কথ্যশব্দের ব্যাপক প্রয়োগ, বেদনার সঙ্গে কৌতুকের মিশ্রণ— থলিটি পিঠে ফেলে যেন দেশান্তরী হবার জন্য তিনি নিয়তই প্রস্তুত। তাঁর যৌবনকালে এক মর্মান্তিক ট্রাজেডির অভিজ্ঞতা হয়েছিল— অনেক পরে যখন তিনি মেলবোর্নে আমাদের অতিথি তখন সে বিষয়ে জানতে পারি। এই অভিজ্ঞতাই সম্ভবত তাঁর মনের রূপান্তর ঘটায়— প্যাশনকে বর্জন করে নিরাসক্ত বিস্ময় এবং বেদনাবোধের অনুশীলনে তাঁকে নিবিষ্ট করে।

অমিয় চক্রবর্তীর চরিত্র এবং জীবনদর্শনের একটি সূত্র পাই অনন্যপূর্ব কবিতা 'উদ্ভট'-এ। শব্দচয়ন, ছন্দ, মিল, চিত্রকল্প, দার্শনিকতা সব মিলিয়ে এটি যথার্থই অভিনব। 'বন বন ঘুরছে বিশ্বের লাট্টু' আর ব্রহ্মের লেত্তি হচ্ছে 'ধক্‌ধক্ সূর্যের মনটা'। এদিকে ভাড়াটে বাড়ির অলিন্দে চাটাই বিছিয়ে কবি আকাশ-জোড়া লাটাই ঘোরাচ্ছেন। অর্থাৎ তিনি আছেন বটে বিশ্বের লাটিমে, কিন্তু তাঁর হাতে আছে শূন্য-বাসিন্দের নিয়ন্ত্রক লাটাইটি। সেই ঘুড়ির খেলায় তন্ময় হতে বাধা নেই। তিনি পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন দিয়ে সব দেখছেন, অস্তিত্বের নিয়ত ঘূর্ণমানতার তিনি অংশ, তাঁর চেতনায় আনন্দ এবং বেদনা ঢেউ তোলে, তবু তিনি মুক্ত এবং নির্লিপ্ত, কারণ তিনি চৈতন্যের অধিকারী।

অমিয়-র সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে আলাপ করা আমার পক্ষে সহজ হয়েছিল কারণ আমরা উভয়েই বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতাম, আমাদের সাহিত্যপাঠে এবং সাহিত্যরুচিতে দুস্তর ব্যবধান ছিল না, এবং সবচাইতে বড়ো কথা, তিনি গোড়া থেকেই বন্ধুর মতো ব্যবহার করেছেন, মাস্টারি করবার সামান্যতম চেষ্টাও করেন নি। তবে সাহিত্যের বাইরেও নানা ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ ছিল, এবং সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের ভিতরে চিন্তার আর প্রত্যয়ের পার্থক্য অল্পকালের ভিতরেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে সময়ে আমি মার্ক্সীয় দর্শনে অনুরক্ত ছিলাম, যদিও



এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আমাকে আকৃষ্ট করে নি। অমিয় গান্ধীর আদর্শে এবং নেতৃত্বে আস্থা রাখতেন, মার্ক্সীয় দর্শন তাঁর কাছে অগ্রহণীয় ঠেকত। নাত্‌সি-ফাসিস্তদের সর্বগ্রাসী নির্বিবেক জুলুমতন্ত্রের উচ্ছেদ অহিংস পদ্ধতিতে সম্ভব কিনা, এ নিয়ে আমাদের সুস্পষ্ট মতভেদ ছিল। ফাসিবিরোধী যুদ্ধের সমর্থনে মার্টিন বুবার এবং রোম্যাঁ রোলাঁর বক্তব্য আমার কাছে গান্ধীর বক্তব্যের চাইতে বেশি যুক্তিসিদ্ধ এবং ন্যায়সঙ্গত মনে হয়। হৈমন্তী কখনো সখনো কিছুটা উত্তেজিতভাবে গান্ধীকে সমর্থন করতেন ; কিন্তু অমিয় মৃদু অথচ দৃঢ় ভাবে নিজের বক্তব্যটি বলে প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতেন। আমার তার্কিক মন কিছু অতৃপ্ত থাকত ; ফলে হয়ত্ নীচের দোকানে দু'একটা রুটি বেশি খাওয়ার প্রয়োজন ঘটত, কিন্তু ফিরে এসে যখন অহিংসাতত্ত্বকে সরিয়ে রেখে সুর্‌রিয়ালিজ্‌ম্-এর আলোচনায় বসতাম তখন আমরা আবার মানসলোকে সহযাত্রী যেখানে সোনালি ডানার চিলে আর হংসবলাকায় কোনো বিরোধ নেই।

ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্বপথিক অমিয় চক্রবর্তীকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন, কিন্তু বিশ্বভারতী থেকে তাঁকে সরে আসতে হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে তাঁর সহকর্মীরা এবং কর্তৃপক্ষ তার যোগ্যতার স্বীকৃতি দেন নি। অনেকদিন পর্যন্ত তিনি প্রকাশক এবং পুস্তকবিক্রেতাদের দ্বারা অবহেলিত। 'খসড়া', 'এক মুঠো', 'অভিজ্ঞান বসন্ত' তিনি নিজের খরচায় ছাপিয়ে ছিলেন। সিগনেট প্রেস 'দূরযানী' প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু বইটি প্রচারের কোনো ব্যবস্থা হয় নি। তাঁর মনঃপীড়ার কিছু কিছু আভাস আমি পেতাম। ১৯৪৮ সালে তিনি কলকাতা ত্যাগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। তখন থেকেই তিনি প্রবাসী। ভারতের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ অবশ্য বজায় রেখেছিলেন ; মাঝে মাঝেই ঘুরে যেতেন ; বাংলা কবিতা লেখার ধারাও প্রায় অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু বিশেষ করে ভারতে ফিরে এসে বসবাস করার ইচ্ছা তাঁর আর ছিল না। মৃত্যুর কিছুকাল আগে যখন তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন তখন এই সিদ্ধান্তের পিছনে প্রধান শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল হৈমন্তীর আগ্রহ। অমিয়ের আশঙ্কা ছিল শান্তিনিকেতন তাঁকে স্থানু করে রাখবে ; যে ভ্রাম্যমানতা তাঁর চারিত্র্য এবং কবিকল্পনাকে অবসিত হতে দেয় না, শান্তিনিকেতনে এসে তা হারিয়ে ফেলবেন। তিনি চেয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত নিউ পল্‌জ্-এই থাকবেন, এবং সেখান থেকে সাধ্যমতো ঘোরাফেরা করবেন। কিন্তু বয়স আশি পেরিয়েছিল শরীর জীর্ণ হয়ে পড়েছিল, হৈমন্তী তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসাই সঙ্গত বিবেচনা করলেন। তবে লাটাই গোটানো থামে নি। একেবারে শেষ দিকে যখনই রাস্তায় গিয়েছি, হুইল চেয়ারে বসে ফিসফিস গলায় তিনি তাঁর নানা চিন্তাভাবনার কথা বলেছেন। অমর্ত্য কি শুধুই কল্পনা, নীহারিকা থেকে ব্যক্তিসত্তার বিবর্তন এসবেরই কি পরিসমাপ্তি পঞ্চভূতে ? কানে প্রায় শুনতে পেতেন না, উত্তর দেবার দায় ছিল না, কিন্তু তাঁর উত্তরহীন প্রশ্নগুলি আমার নাস্তিক্যে আলোড়ন তুলত, এখনও তোলে। তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা আমার কাছে মোটেই অবান্তর বা অসংলগ্ন ঠেকে নি।

তিনি মার্কিন দেশে চলে যাবার পর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় থাকে মুখ্যত চিঠিপত্রের মাধ্যমে। ঘোরায় তাঁর ক্লান্তি নেই ; কখনো ইয়াসনায়া পলিয়ানা, কখনো ল্যাম্বারেহ্‌ন, কখনো দক্ষিণ আমেরিকা, কখনো জাপান — বিভিন্ন জায়গা থেকে ছবিওয়ালা পোস্টকার্ডে চিঠি দিতেন, জানতাম লেত্তির টান সমান জোরালোই আছে। দূর দেশে থাকার ফলে তাঁর কবিতাগুলি সংকলিত হয়ে বই আকারে প্রকাশে দেরি হত — 'দূরযানী' বেরিয়েছিল ১৩৫১ সালে, তার পরের সংকলন 'পারাপার' বার হয় ১৩৬০, অর্থাৎ নয় বছর পরে। কিন্তু কী সব আশ্চর্য কবিতা— 'তাঁতে এনে বসালেম বুক থেকে রোদ্দুরের সুতো', 'অন্ধকার সাঁতরিয়ে প্লেন চলে শূন্যে ঢেউ-এ দুলে', 'অন্যমনস্ক মস্ত শহরে হঠাৎ কুয়াশায়/ ইস্পাতী রেলের ধারে হুহু শীত হাওয়া টলে যায়', 'আশ্চর্যের কান কালা, দৈব তাই হরবোলা খোঁজে', 'কেঁদেও পাবে না তাঁকে বর্ষার অজস্র জলধারে'।

চিঠিপত্র ছাড়াও পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে এবং ষাটের দশকের সূচনায় বস্টনে দু-একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয় — সেখানেও লাঞ্চে গিয়ে দেখি দইয়ের ব্যবস্থা। ততদিন আমারও ঘোরার পর্ব শুরু হয়েছিল। ক্রমাগত ঠিকানা পালটায়, চিঠি কাগজ-পত্র হারিয়ে যায়, জমে ওঠা সংসারে বিবিধ উপচার-উপকরণ পিছনে পড়ে থাকে। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে অমিয় চক্রবর্তীর জগৎটাকে আরেকটু ভালো করে বুঝতে শিখি। নিরাসক্ত তাঁর আগ্রহ, প্যাশনমুক্ত তাঁর বেদনাবোধ ও মমতা, নিরন্তর তাঁর পথচলা এবং পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও ঘটনাকে চেতনার ফ্রেমে আশ্রয় দেওয়া, বহুমুখী তাঁর কৌতূহল অথচ কোনো কিছুতেই স্বামিত্ব স্থাপনে আন্তরিক অনীহা, এবং পিঁপড়ে, আহা পিঁপড়ে ছোটো

পিপড়ে থেকে মহাবিশ্বের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য তাঁর আজীবন সাধনা — সব মিলিয়ে মানুষটির আকর্ষণ দিনে দিনে আমার কাছে বাড়ে। আমি যখন মেলবোর্নে অধ্যাপনা করি তখন তাঁকে দুবার আমাদের বিভাগে নিমন্ত্রণ করবার সৌভাগ্য হয়। প্রথমবার আসেন ১৯৬৭ সালে, দ্বিতীয়বার ১৯৭৫ সালে। নরেশ গুহ তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা সংগ্রহ' প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত জীবনীপঞ্জিতে এবং সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর ''কবি অমিয় চক্রবর্তী'' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে ১৯৭৭ সালের উল্লেখ করেছেন ; এটি ভুল তারিখ। ১৯৬৭ থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের যোগাযোগ প্রায় অব্যাহত থাকে। এই সময়কালে তিনি আমাকে শতাধিক চিঠি লেখেন ; সৌভাগ্যবশত তার অধিকাংশই আমার কাছে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। শেষ দিকে চোখ অশক্ত হয়েছিল ; চিঠিতে লেখাগুলি অনেক সময়ে পরস্পরের ঘাড়ে উঠে পড়ত, পাঠোদ্ধার করা যেত না। আমি তাঁকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলাম তাদের ভিতরে কয়েকটি বেছে নিয়ে হৈমন্তী নিজের কাছে রেখেছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীর মৃত্যুর পরে তিনি সেগুলি স্নেহভরে আমাকে প্রত্যর্পণ করেন।

ষাটের এবং সত্তরের দশকে তিনি কয়েকটি ব্যাপারে আমার সহায়ক হন। আমার একটি ছাত্রী, সহকর্মিণী এবং সুহৃদ ম্যারিয়ান ম্যাড্যান খুব যত্ন করে বাংলাভাষা শিখেছিলেন। সমকালীন বাংলা কবিতার একটি ইংরেজি অনুবাদ সংকলন আমরা দুজনে সম্পাদনা করি ; এটির জন্য অমিয় নিজের কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করে দেন, ম্যারিয়ানের করা অনুবাদ দেখে দেন, এবং বইটির একটি মার্কিন সংস্করণ প্রকাশের জন্য চেষ্টা করেন। 'আই হ্যাভ সিন বেঙ্গলস্ ফেস' নামে বইটি ইউনেস্কোর সমর্থনে এবং আংশিকভাবে আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে এবং মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়-ও এই সংকলনটির জন্য নিজের নিজের কিছু কবিতা অনুবাদ করে পাঠিয়েছিলেন। এই বইটি প্রকাশের (১৯৭৪) কয়েকবছর আগে আর একটি প্রকল্পেও তাঁর বিশেষ মূল্যবান সহযোগিতা পাই। গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ম পরিকল্পনার ও সম্পাদনার দায়িত্ব আমার উপরে অর্পিত হয়েছিল। আমি গান্ধীবাদী নই ; তাঁর চিন্তার এবং ক্রিয়াকলাপের বেশ কয়েকটি দিক আমার কাছে সমর্থনের অযোগ্য ঠেকে ; কিন্তু তিনি যে এ শতকের ইতিহাসের একজন প্রধান পুরুষ এবং অন্যায়ের বিরোধিতায় অহিংস অসহযোগ যে একটি গভীর সম্ভাবনাময় পদ্ধতি তা নিয়ে আমার মনে সংশয় নেই ; এবং জীবনের সর্বশেষ পর্বে গান্ধীর সত্যাগ্রহী একাকিতা এবং ট্রাজিক পরিসমাপ্তি আমার চেতনায় আত্যন্তিক আলোড়ন তোলে। গান্ধী-অনুরাগীদের ভিতরে যাঁরা আমার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তাঁদের ভিতরে নির্মল কুমার বসু, জয়প্রকাশ নারায়ণ, অমিয় চক্রবর্তী এবং অন্নদা দত্তকে প্রকল্পিত সিম্পোজিয়ামে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করি। তাঁরা প্রত্যেকেই গান্ধীবাদী আদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি করে প্রবন্ধ লেখেন। মোট কুড়িটি প্রবন্ধের এই আলোচনা গ্রন্থটি 'গান্ধী, ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড দ্য ওয়ার্ল্ড' নামে একই সঙ্গে আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান এবং ভারতীয় তিনটি স্বতন্ত্র সংস্করণে (১৯৭০) প্রকাশিত হয়। মার্কিন সংস্করণটি বেরোয় ফিলাডেলফিয়া থেকে ; প্রকাশক টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন অমিয় ; তাঁর বন্ধু, গান্ধী-অনুরাগী এবং বিখ্যাত শান্তিকামী হোরেস আলেকজাণ্ডার মার্কিন সংস্করণটির মুখপত্র লিখেছিলেন। অন্য দুটি সংস্করণের মুখপত্র লেখেন আমার বন্ধু শ্রদ্ধাভাজন ঐতিহাসিক এ. এল. ব্যাশম।

মার্কিন সংস্করণটির মুখপত্র নিয়ে একটু সমস্যা দেখা দেয়। সিম্পোজিয়ামে অন্য যাঁদের আমন্ত্রণ করি তাঁদের ভিতরে ছিলেন তন্ত্রবিদ নৃতাত্ত্বিক অগেহানন্দ ভারতী। তাঁর প্রবন্ধটিতে গান্ধীর গীতা ব্যাখ্যার কঠোর সমালোচনা ছিল। হোরেস আলেকজাণ্ডার তাঁর মুখপত্রে অগেহানন্দকে আক্রমণ করেন। মুখপত্রটি তিনি লিখেছেন অমিয় এবং টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে, আমি তাঁকে অনুরোধ করি নি। আমি বিব্রত হয়ে অমিয়কে জানাই যে অগেহানন্দ আমার আমন্ত্রণে এই আলোচনায় যোগ দিয়েছেন ; মুখপত্রে তাঁর প্রতি অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ অক্ষমার্হ অসৌজন্যের পরিচায়ক। হোরেস আলেকজাণ্ডার যদি কোথাও বইটির রিহিয়্যু সূত্রে অগেহানন্দের বক্তব্যের কড়া সমালোচনা বা খণ্ডন করেন তাতে কোনও আপত্তির কারণ দেখি না ; কিন্তু আমন্ত্রিত ব্যক্তির উপরে মুখপত্রে তীব্র আক্রমণ সম্পাদক হিসেবে আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। অমিয়-র অনুরোধে শেষ পর্যন্ত হোরেস আলেকজাণ্ডার তাঁর লিখিত মুখপত্র থেকে আপত্তিকর সেই অনুচ্ছেদটি বর্জন করেন ; তা না হলে মার্কিন সংস্করণটি সম্ভবত বার হত না।

নিরাসক্ত দার্শনিক, কৌতূহলী বিশ্বপথিক, অভিনব কল্পনা এবং নিপুণ শব্দশিল্পের অধিকারী অমিয় চক্রবর্তী কিন্তু সেই গুঁয়োপা থেকে নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে



পারেন নি যা একসময়ে বিলেতে ভিক্টোরিয়াল সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ছিল এবং যা বাঙালি ভদ্রলোকের নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। প্যাশনের প্রাবল্য বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল ; ভাষায় এবং চিন্তায় তিনি সযত্নে অশ্লীলতাকে এড়িয়ে চলতেন ; ভাবরূপকে যা খর্ব করে এমন তথ্য তিনি অপ্রকাশ রাখাই পছন্দ করতেন। রবীন্দ্রনাথ যে কিছুকাল প্রেতচর্চা করেছিলেন একথা অনেকেই জানতেন ; কিন্তু সেই প্রেতচর্চার বিবরণ এবং অনুলিখন যে সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের সচিব অমিয় চক্রবর্তী স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এটি আমার অন্তত জানা ছিল না। অমিতাভ চৌধুরী সেই খাতাগুলি রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহ থেকে পড়ে সে সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বিবরণ প্রথমে একটি পত্রিকায় পরে পুস্তকাকারে বার করেন। তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে বইটির একটি ভূমিকা লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। অমিয়-র ব্যাপারটা একেবারেই পছন্দ হয় নি। গুরুদেবের সাময়িক দুর্বলতার বিবরণ এভাবে লোকসমক্ষে উপস্থিত করা তাঁর কাছে অসঙ্গত ঠেকে। বইটির একটি ফটো কপি এবং অমিতাভ চৌধুরীকে লেখা তাঁর উত্তরের একটি কপি তিনি আমাকে পাঠান। প্রেতচর্চাকে তাঁর মতো আমিও ''একটি কাল্পনিক মনোবৃত্তি'' বিবেচনা করি। কিন্তু তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছবি-আঁকার গূঢ় সম্পর্ক থাকতেও পারে। ঘটনার অর্থভেদে অক্ষম হলেও যা বাস্তবিকই ঘটেছিল তাকে চেপে যাওয়ার চেষ্টাকে অকর্তব্য মনে হয়।

অমিয় চক্রবর্তীর যে ভাবমূর্তির সঙ্গে তাঁর লেখার সূত্রে আমরা পরিচিত এবং সযত্ন অনুশীলনে যেটি সম্ভবত তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, যৌবনকালে ঠিক সেটি অনুসারেই যে তিনি জীবন যাপন করেন নি তার আভাস পাই যখন তিনি মেলবোর্নে দুবার আমাদের অতিথি হয়ে আসেন। তাঁর যুবকালে যে সব ভিনদেশী পণ্ডিত শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে আসতেন তাঁদের ভিতরে একজনের নাম ডক্টর গেমানুস। এই হাঙ্গেরিয়ান অতিথি-অধ্যাপকটি তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রে, বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম বিষয়ে, আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী অমিয়-র বিশেষ বন্ধু ছিলেন। মাদাম গেমানুস তাঁদের শান্তিনিকেতনবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় একটি বিরাট বই লেখেন ; তাঁর স্বদেশে বইটি জনপ্রিয় হয়। এই বইটির প্রধান চরিত্র স্বয়ং অমিয় চক্রবর্তী ; প্যাশন যে একদা তাঁকেও প্রবল বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল যার পরিণতি ঘটেছিল চরম ট্র্যাজেডিতে — এই বইটিতে সেই কাহিনী বিবৃত।

কিন্তু বইটি হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় লেখা, সুতরাং আমাদের পাঠক্ষম্য নয়। অমিয় যখন প্রথমবার মেলবোর্নে আমাদের অতিথি হয়ে আসেন তখন আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর পড়াবার কোনো বিশেষ দায়িত্ব ছিল না। বিভাগে তাঁর নিজস্ব একটি বসবার ঘর ছিল ; ছাত্রছাত্রী এবং সহকর্মীরা তাঁর সঙ্গে বসে নানা বিষয়ে আলাপ করতেন ; আমাদের ক্লাসে এবং সেমিনারের আলোচনায় তিনি কখনো কখনো যোগ দিতেন। অল্প সময়ের ভিতরেই আমাদের ছাত্রছাত্রীরা তাঁর বিশেষ অনুরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মনে তিনি এতটাই দাগ কেটেছিলেন যে তিনি চলে যাবার পর বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত তারা তাঁর খোঁজ-খবর করতেন। একদিন আমার একটি হাঙ্গেরিয়ান ছাত্রী হেলেন আডোরিয়ান মাদাম গেমানুসের বইটি আবিষ্কার করে উৎফুল্ল চিত্তে সেটি আমার কাছে নিয়ে আসেন, এবং তা থেকে কিছু কিছু টুকরো অংশ ইংরেজিতে ভাবানুবাদ করে শোনান। আমি অমিয়কে লিখি এই বইয়ের কিছু অংশ ইংরেজি বা বাংলায় তর্জমা করিয়ে ছাপানোতে তাঁর সম্মতি আছে কিনা। তিনি সম্ভবত তখন জানতেন না মাদাম গেমানুস বইটিতে কী লিখেছিলেন। ফলে তখন আপত্তি করেন নি। পরে দ্বিতীয়বার যখন কিছুটা বেশি সময়ের জন্য অতিথি অধ্যাপক হয়ে মেলবোর্নে আসেন তখন হাঙ্গেরিয়ান ছাত্রীটির মুখে শুনে বুঝতে পারেন বইটিতে তাঁর জীবনের এমন একটি পর্বের কাহিনী আছে যা তাঁর সযত্নে অনুশীলিত ও আত্তীকৃত ভাবমূর্তির সঙ্গে আদৌ মেলে না। তাঁর সুস্পষ্ট অনিচ্ছার কথা বুঝতে পেরে তর্জমা প্রকাশের ব্যাপারে আমি আর কোনো উৎসাহ দেখাই নি। তিনি ঐ পর্ব এবং গেমানুস দম্পতি সম্পর্কে সামান্য বিচলিত অবস্থায় নিভৃতে আমাকে কিছু কথা বলেন ; কিন্তু তাঁর দ্বিধা এবং কুণ্ঠা অনুভব করে আমি তাঁকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যাই।

অনেক বছর পরে মাদাম গেমানুসের বইটির একটি পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি তর্জমা পাণ্ডুলিপি আকারে একজন তরুণ ইংরেজ কবির সূত্রে আমার কাছে আসে। আমার মতামত সমেত পাণ্ডুলিপিটি ফেরৎ দিই। লোক মুখে শুনেছি কিছুকাল আগে নাকি বইটি প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু আমি এখনও পর্যন্ত কপি দেখিনি। পাণ্ডুলিপিটি এতই দীর্ঘ যে যদি সংক্ষেপন না করেই প্রকাশিত হয়ে থাকে সেই বই কেনা আমাদের সাধ্যের বাইরে। অমিয় বলেছিলেন মাদাম গেমানুস একটু বেশি পরিমাণে কল্পনাপ্রবণ। ফলে তাঁর কাহিনীতে প্রকৃত

ঘটনার সঙ্গে বেশ কিছুটা কল্পনার মিশাল থাকতে পারে। ভবিষ্যতে কোন গবেষক হয়তো এ নিয়ে অনুসন্ধান করবেন। অমিয়র জীবনচরিত রচনা করতে গেলে মাদাম গোর্মানুসের বইটিকে উপেক্ষা করা যাবে না।

প্রেতচর্চা এবং প্যাশন সম্পর্কে সন্ধোচ থাকলেও রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির বিশিষ্টতা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। আমাদের আরেকটি হাঙ্গেরিয়ান ছাত্রী এলিজাবেথ বাচকোভস্কি রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম এবং শেষ জীবনের সাহিত্যকর্মের ভিতরে সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি যত্ন করে বাংলা শিখেছিলেন, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং গীতালি নিয়ে পূর্বে গবেষণা নিবন্ধ লিখেছিলেন, কিছুকাল শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনেও রবীন্দ্র চর্চা করেন। পি. এইচ. ডি উপাধির জন্য পেশ করা রবীন্দ্রচিত্রকলা বিষয়ক গবেষণা নিবন্ধটির অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী; অপর দুই পরীক্ষকের ভিতরে যোসেফ বার্ক পশ্চিমী চিত্রকলার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, এবং ইনগ্রিড আল ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইন আর্টস-এর অধ্যাপিকা। ইনগ্রিড দক্ষিণ এশিয়ার শিল্প বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, বেশ কিছুকাল ভারতবর্ষে ছিলেন, রাজস্থানী চিত্রকলা নিয়ে কাজ করেছেন, অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ঘরানা সম্পর্কে তাঁর বইটি মূল্যবান। এলিজাবেথ তাঁর গবেষণার জন্য অক্সফোর্ড পেয়েছিলেন। কিন্তু যা আমার কাছে মনস্তাপের বিষয়, আমাদের সেমিনারে, ঘরোয়া আলাপে রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে অমিয় অনেক বিস্ময়কর কথা বলতেন যা মূল্যবাবশত আমরা টেপ রেকর্ড করে রাখি নি। বস্তুত রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অমিয় যে বুদ্ধদেবের মতো কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনাগ্রন্থ লেখেন নি এটি বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য বলেই মনে করি। তাঁর বিচিত্র ভাবনাচিন্তা এবং অভিজ্ঞতাকে তিনি কবিতা ছাড়া লিপিবদ্ধ করতে ভালোবাসতেন চিঠির আকারে। প্রায় সারা জীবন অধ্যাপনা করা সত্ত্বেও প্রবন্ধ অথবা গদ্যগ্রন্থ রচনায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ঘোরা এবং ওড়ার ভিতরে তাঁর দেহমন আনন্দ পেত — খুব বেশি সময় কোনো কিছুতে আটকে থাকা তাঁর ধাতে ছিল না।

এমনই তাঁর ঘোরবার টান যে মেলবোর্নে অতিথি অধ্যাপকরূপে উপস্থিত হয়ে প্রথম দিনই আমাকে বলেন পাপুয়ানিউগিনি, টাসমেনিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডে এ যাত্রায় ঘুরে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারলে তাঁর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। সৌভাগ্যবশত সে ব্যবস্থা করা কঠিন হয় নি; লাট্টু এবং লাটাই দুজনকেই তৃপ্ত করা গিয়েছিল। কিন্তু সেজন্য আমাদের বিভাগীয় কর্মসূচীকে কিছুমাত্র অবহেলা করেন নি; বিভিন্ন প্রস্তাবিত বিষয়ে ক্লাস এবং সেমিনার নিয়েছেন, ছাত্রছাত্রী এবং সহকর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলাচনা করেছেন, গবেষকদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। প্রবন্ধ ক্বচিৎ লিখেছেন বটে, কিন্তু যখনই কোনো বিষয়ে আলাচনা করতেন তাতে অন্তর্দৃষ্টি এবং স্বকীয়তার পরিচয় থাকত। ছোট সেমিনার বা ঘরোয়া আলাপেই তাঁর বক্তব্য বিশেষ স্ফূর্তি পেত, কিন্তু কখনো কখনো বড় সভাতেও তাঁর স্মরণীয় বক্তৃতা শুনেছি। তাঁর কবিতার মতো তাঁর বক্তৃতাতেও উল্লম্ফনের প্রবণতা ছিল, প্রথমে মনে হতে পারত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাচ্ছেন, যুক্তির ধাপগুলি কিছুটা অবিন্যস্ত, কিন্তু পুরো বক্তৃতা শোনার পর বোঝা যেত তাঁর কবিতার মতো বক্তৃতাতেও একটি সমগ্রতা আছে যা অনুভবের ঐক্যে গ্রথিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে তাঁর একটি বক্তৃতার কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। ঘোষিত বিষয়টি ছিল শিল্পীর ধর্ম। শুরু করেন ইতালিতে পাহাড়ের চূড়ায় ফ্রান্সিসকান একটি মঠের অভিজ্ঞতা দিয়ে; সেখান থেকে চলে গেলেন জাপানে কিওটোর বসন্ত উৎসবে, শেষ করলেন নিউ ইয়র্কের স্কাইস্ক্র্যাপারে। চিত্রবিচিত্র পরিবেশে পর্যটনের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠল মানুষের আপনাকে অতিক্রম করে সৃজনশীল হবার সাধনা, আর তাই হল বিশেষ করে শিল্পীর ধর্ম। ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকদের সেই মস্ত সমাবেশ প্রায় অভিভূত হয়ে তাঁর ভাষণ শুনল। সম্ভবত সে বক্তব্যটি টেপরেকর্ডিং করা হয়েছিল; কিন্তু তার প্রতিলিপি আমি সংগ্রহ করতে পারি নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় গান্ধীকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছুটা মতানৈক্য হয়েছিল; সত্তরের দশকে এমার্জেন্সির সময়ে অন্য-এক গান্ধীকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে আরেকবার মতভেদ ঘটে। আমি প্রথম থেকেই অধ্যাদেশের বিরোধী; যেটুকু ব্যক্তিস্বাধীনতা ভারতবর্ষে অর্জিত হয়েছে মৌল অধিকারাবলীর নিলম্বন এবং রাষ্ট্রিক উৎত্রাসনের ফলে তা যে বিলুপ্ত হবে চিঠিতে এবং নানা লেখায় এসব আশঙ্কার কথা আমি জানাই। অমিয়বাবু ইন্দিরা গান্ধীকে স্নেহ এবং শ্রদ্ধা দুই ই করতেন; ইন্দিরা স্বার্থবুদ্ধি থেকে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করতে পারে একথা তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য



ঠেকে নি। অপরপক্ষে জয়প্রকাশ নারায়ণকেও তিনি বিশেষ সম্মান করতেন। ফলে দোটানায় পড়েন, কিন্তু ইন্দিরার দিকে টানটাই প্রবলতর। আমাকে লেখেন বটে যে ''সভ্যতা যদি মানুষকে স্বাধীন মতামতের অধিকার না দেয় তবে সেটা সভ্যতা নয়। পৃথক রকম মতবাদের জন্যে লোকদের জেলে দেয়া তো একবারেই বর্বরতা'' (২৬.১১.৭৫), কিন্তু এমার্জেন্সির সময়ে ভারতে গিয়েও তাঁর মনে হয়েছে ''শ্রীমতী ইন্দিরার তেজস্বিতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, চারিত্রের একাগ্রতা নূতন শক্তির সঞ্চার করেছে'' (১.২.৭৬)। সেই চিঠিতেই লিখেছেন ভারতে যা ঘটেছে তা ''গ্রীকড্রামার মতো হঠাৎ ট্রাজেডি....এ যেন অমোঘ নিয়মের সংঘর্ষ''। ইন্দিরা এবং জয়প্রকাশ দুজনের সঙ্গেই দেখা করেছেন। দুজনেই তাঁর কাছে ''প্রোজ্জ্বলমানস''; ইন্দিরার ব্যবহার ''শান্ত, বিনীত, সৌজন্যদৃঢ়''; হাসপাতালে জয়প্রকাশের ''শরীর মন নিরতিশয় ক্লান্ত'', তাঁর চোখে ''আহত বীরপুরুষের অভিমান'', মুখে ''সত্যব্রতীর নম্র অথচ অনমিত বাক্য''। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন; তাঁর মনে আশা ছিল কিছুটা সুফল ফলবে; কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হয়ে ভেবেছেন বুঝিবা বিদ্রোহ, এমনকি বিপ্লব অনিবার্য। এদিকে ভারতের বিরুদ্ধে পশ্চিমের দেশগুলিতে, বিশেষ করে মার্কিনে ক্রমাগত যে সব তীক্ষ্ণ সমালোচনা বেরোচ্ছিল তাতে তিনি দুঃসহ পীড়া বোধ করেছেন। দেশ থেকে ঘুরে এসে চিঠিতে স্বীকার করেছেন ''ভারতবর্ষের সব ব্যাপারে বিতৃষ্ণায় মন ভরেছে...অন্যায়ের পথে চলে মোড় ঘোরাবার মতো শক্তি ওদের নেই বলে মনে হয়'' (১৪.৩.৭৬)। অথচ মাস খানেক পরেই লিখেছেন ''ভারতবর্ষের অবস্থা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে মনে হয়'' (২২.৪.৭৬)। মাস ছয়েক পর আরেক বার ঘুরে এসে তাঁর ধারণা হয়েছে ''অনেকখানি দেশ এগিয়ে গেছে...আর্থিক, নৈতিক দায়িত্বজ্ঞান এবং বাঁচবার উপকরণ বেড়েছে'' (২৬.১০.৭৬)। ''ইন্দিরা গান্ধী বুদ্ধিমতী এবং দেশের কল্যাণব্রতী — তাঁকে সাম্যিক পথে আকৃষ্ট করা অসম্ভব মনে হয় না'' (২৪.১১.৭৬)। ইন্দিরা নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে তিনি ''শঙ্কিত''। তবে নির্বাচনের ফল বেরোবার পর নিঃসঙ্কোচে জানিয়েছেন তিনি আমার ''সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত''। ইন্দিরার ''প্রতি স্নেহবশত আমি সমস্ত জিনিষটা ঠিক বুঝতে পারিনি'' (২০.৪.৭৭)। এবং তার পরের চিঠিতে: ঠিক কতদূর শাসনত্রাসন অন্যায় দেশের বুকে চেপে বসেছিল তা কিছুই ঠিক ভাবে বুঝিনি''(২৩.৬.৭৭)। ভুল আমরা সকলেই করি, কিন্তু সেটি বুঝতে পারলে স্বীকার করবার মনস্থিতা কজনের থাকে?

অমিয় কোনোদিনই মতবাদগ্রস্ত মানুষ ছিলেন না। পথ চলবার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতাকে আগেকার ধ্যানধারণার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন, ধারণাকে ''আমার'' অথবা অপরিবর্তনীয় বলে আঁকড়ে ধরতেন না, ইন্দ্রিয়গ্রাম দিয়ে যেমন বিশ্বের অফুরন্ত বৈচিত্র্যকে নিজের চেতনায় গ্রথিত করতেন তেমনই বিশ্বের অর্থ নিয়ে জিজ্ঞাসা তাঁর ভিতরে নিয়ত জাগ্রত ছিল। আমাদের বন্ধুত্বের একটি সূত্র ছিল এই প্রশ্নশীলতা; অপরপক্ষে অর্থভেদ করতে পারি বা না পারি বিচিত্র এই বিশ্বের প্রতি আমাদের অনুরাগ কখনো শিথিল হয় নি। আমি নাস্তিক; মানুষের কল্পনার বাইরে ঈশ্বর, দেবদেবী, আত্মা, পরলোক ইত্যাদির অস্তিত্ব আমার বিচারে অপ্রতিপাদিত এবং অপ্রামাণ্য। কিন্তু অমিয় আমাকে বহুবার বলেছেন এবং পত্রে জানিয়েছেন ''আমার বিশ্বাস যাকে 'নাস্তিক' বলা হয় আপনি তা নন। আপনি 'আস্তিক'— সূক্ষ্মতম, শ্রেষ্ঠ অর্থে'' (১৮.১.৭৮)। প্রচলিত প্রয়োগ অনুসারে অমিয়কে সম্ভবত ধার্মিক বলা চলে না। তাঁর অনুসন্ধান এবং অনুভব নানা কবিতা এবং কিছু চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে যে ভাবে আভাসিত তাতে মনে হয় নাস্তিক না হলেও কোনো নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাসে তিনি আশ্রয় নেন নি। ১৯৭৬ সালের একটি চিঠিতে আমাকে লিখছেন:

> ''আপনি অনেকান্তবাদের বিষয়ে যা লিখেছেন তা আমার কাছে গভীরার্থপূর্ণ — এ নিয়ে প্রায়ই ভাবতে হচ্ছে। জগৎ সংসার জটিল সূত্রের সমন্বয়, মনের তন্তুতে চৈতন্যের বদ্ধশীল ক্রিয়ার প্রবাহ চলেছে—দুয়ের যোগ কোথায়? হয়তো যুক্তি দিয়ে কোনো সঙ্গতি পাওয়া যায়না অথচ যোগের একটা চেষ্টা মনুষ্য প্রকৃতির স্বভাবগত; আকাশ সূর্য ধরণীর সঙ্গে চিন্তাভাবনা বেদনার বোধ উজ্জ্বল হয়ে উঠে আবার নিভে যায় অথচ আমরা বোধটুকু ধানের খেতে, বাড়ি বানানোয়, ফুলের পাত্রে, ছবিতে, সৃষ্টিকাব্যে, মঙ্গলকর্মে জাগিয়ে রাখতে চাই'' (৫.১১.৭৬)।

এক বছর পরে ৯ই নভেম্বর ১৯৭৭ আরেকটি চিঠিতে:

> যখন 'মেলাবেন' লিখেছিলাম তখনো ভাবিনি নরম মেঘের উপর বিরাজমান কোনো জাদুবিদের কথা, যে

বিশ্বের যত ভাঙা দরোজা, উৎকণ্ঠিত চাপ, দুঃসহ অন্যায় জোড়া দেবার শক্তি রাখে— কোনো 'শ্রীভগবানের' সাধ্য নয় সংসারকে ওভাবে মেলানোর। আমি চেয়েছিলাম মানুষের প্রশ্নোত্থিত আত্মশক্তির কথা জানাতে।

এবং ১৯৭৯ সালের ১লা আগস্ট আমার 'নাস্তিকের ধর্মজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধটি পড়ে লেখা একটি চিঠিতে :

বিশ্বের প্রচলিত বিবিধ 'ধর্মের' কোনোটাই গ্রহণ করা আমার সাধ্যাতীত কিন্তু সম্মুখ সমরে নামতে পারিনি কেননা তর্কের কুঠার আমার আয়ত্ত হয় নি, তাছাড়া বিপক্ষ দলও সংখ্যাতীত। ...কিন্তু ঐ কথাটা ('নাস্তিকতা') নিয়ে আমার মুস্কিল আছে — আগেও তা আপনাকে লিখেছি। যা যথার্থ আস্তিক, যে বীর্য-সৌজন্য-কল্যাণের পক্ষ নিয়ে আপনি দাঁড়িয়েছেন তাকে নাস্তিক বলি কী করে? ...কিন্তু সব 'ধর্মেই' স্রষ্টার ব্যক্তিত্বের প্রতীকী তর্ক উঠল, 'ধর্ম' এলো, পাণ্ডা পুরোহিত মূর্তি বিগ্রহে সভাতা ছেয়ে গেল।... প্রতিদিন সূর্যের কিরীটপরা, সমুদ্রের নীলাবিভাব দেখেছি, বাগানে অগণ্য পরমাশ্চর্য ফুল এবং ঘাসে ঘাসে তারই সবুজ বিস্মিত পরিচয় দেখে মন যেন 'প্রকৃতিস্থ' হত। যাকে লোকে বলে ধর্ম তাকে প্রায় কোণঠেসা করে জীবনের, চৈতন্যের ব্যাপার চলেছে। সেই 'অস্তীতি'তে অবগাহন করে অধার্মিক জীবনকে 'ধর্মের' হাত থেকে বাঁচানোর পথ পেয়েছি।

শেষ জীবনে প্রায় অকার্যক্ষম অবস্থায় যখন তাঁকে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল তখন তিনি আর বিশ্বের লাট্টুর মতো ঘূর্ণমান নন বটে, কিন্তু তখনও লাটাই ঘোরানো থামে নি। চোখে ভালো দেখেন না, কানে প্রায় শুনতে পান না, নিজের শক্তিতে দাঁড়ানো এবং চলাফেরা তখন সাধ্যাতীত, তাঁর সঙ্গে যখন দেখা করতে যেতাম তিনি তাঁর গৃহ 'রাস্কা'র বারান্দায় চাকা লাগানো কুর্শিতে অধিষ্ঠিত, তাঁকে অভ্যর্থনা করে এক ফালি রোদ এসে পড়েছে তাঁর জানুতে জঙ্ঘায়, বহুরেখাঙ্কিত তাঁর সেই শীর্ণ পরিচিত মুখে প্রসন্নতার আভাস মেশানো বিদায়বোধের বিষাদ। তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য খুব কাছ ঘেঁষে বসতে হত। কিছুটা সময় একটানা বলে যেতেন; বিরতি; আমার হয়ত একটি বা দুটি প্রশ্ন বা মন্তব্য; শ্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত আকাশে ঘুড়ি উড়ত। সেই কোটি কোটি বছর আগেকার নীহারিকাপুঞ্জ থেকে ধাপে ধাপে নানা রূপান্তরের ভিতর দিয়ে অবশেষে সৃষ্টিধর্মী মনুষ্যচেতনার উদ্ভব কি মৃত্যুর ভিতর দিয়ে শূন্যে নিলীন হয়ে যাবার জন্য? পঞ্চভূতে ফিরে যাবে পঞ্চভূতে, কিন্তু শরীরধৃত যে চেতনা সেই বিচিত্র উপাদানকে ধারণ করেছিল সেই চেতনাও কি চিরতরে নির্বাসিত হবে? এই উত্তরহীন প্রশ্ন তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করত। তাঁর বড়ো ভাই অরুণ চক্রবর্তী সতরো বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন, কিন্তু অমিয় কল্পনা করতেন যে মৃত্যুর পরে কী হয় জানবার জন্যই কৌতূহলী অরুণ ভেবেচিন্তেই মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। অমিয় একদিন বললেন, ঈশ্বর আছেন কিনা জানি না, কিন্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল, নিয়ত নির্মীয়মান যে ঐক্য নিজের চেতনায় অপরোক্ষভাবে দীপ্যমান তা কি ভ্রান্তিমাত্র? তিনি জানতেন অনেক প্রশ্ন আছে যা উত্তরহীন। চিঠিতে লিখেছেন, ''প্রশ্ন-উত্তরের পরবর্তী রহস্যে তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) মন নিমগ্ন ছিল'' (২০.৯.৭৭)। অন্যত্র লেখেন: ''আমাদের বিচার-প্রবণ মনকে যদি পূর্ণতর আস্তিকতার একটি পূর্বাভাস বলতে চাই তাহলে হয়তো তেমন ভুল হবে না, কিন্তু এই ''অস্তীতি'' চেতনা অপ্রমাণিত, অপ্রমেয়'' (১৫.৭.৭৬)। একেবার শেষ দিকে অর্থর্ব হয়ে পড়া সত্ত্বেও আমার ধারণা আস্তিত্বিক রহস্যবোধ এবং কৌতূহল তাঁর লাটাইয়ের সুতো ফুরোতে দেয় নি।

শ্রীরামপুর, গৌরীপুর, পুরী, কলকাতা, হাজারিবাগ, শান্তিনিকেতন, অক্সফোর্ড, লাহোর— যে ভ্রামাণিকতার সূত্রপাত বলা যায় জন্মকাল থেকেই সেটি পাকা হয় আমেরিকায় যাবার পরে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীর মতো এত দেশে ঘোরেন নি। তার চাইতেও যা লক্ষণীয়, অমিয় যেখানেই গেছেন সেখানকার ভূপ্রকৃতি, সমাজ, ব্যক্তি তাঁর চেতনায় প্রতিফলিত হয়ে কখনো কবিতায়, কখনো চিঠিতে রূপ পরিগ্রহ করেছে। নিরাকাঙ্ক্ষ, নিরহঙ্কার, নির্মৎসর তাঁর দৃষ্টি; প্রমিত কয়েকটি শব্দের ইঙ্গিতসমৃদ্ধ বিন্যাসে ছবির পরে ছবি; যথার্থই বসুধা তাঁর কুটুম্ব। ''গভীর প্রাণসূত্রে, প্রেমসূত্রে জড়ানো'' (১৩.৯.৮০ তারিখের চিঠি) ''চিরন্তন বাংলাদেশ''-এর সঙ্গে যুক্ত হল অ্যান আবার, ক্যানস্‌সের গ্রাম, আগ্নিক আয়ুতে ওঠা ওক-আকাছাম, ক্যালডিয় নক্ষত্র, লিওপোল্ডভিল, নাইরোবি, কংগো নদী, যোহান সেবাস্টিয়ান বাখ, ম্যানিক, আথেন্স, বার্বাডোস, হাইতি, মাদ্রিদ, কাইরো, ল্যাম্বারেনের সন্ত অ্যালবার্ট, পিৎসার কল্যানী ওয়েট্রেস, সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা হাইফার মেয়েটি, বোমা-ভাঙা



অবসানের ডুসেলডর্ফ, ''অনিবার্য আস্যা / প্রকাণ্ড আমেরিন্ডিয়ান মৃত্যু'', ইউক্যালিপটাসবাসী অস্ট্রেলিয়ান কোয়ালা। বিরাট এবং বিচিত্র বিশ্বজগতের গ্রহনক্ষত্র থেকে পোকামাকড় পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর সংবেদিতা সঞ্চারমাণ। স্বর্গ অথবা মোক্ষ তাঁর জীবনের উদ্দিষ্ট নয়। দেহ এবং মনের বিশ্বপরিক্রমার আদিতে এবং অন্তে বিদ্যমান এই মহাপৃথিবীর তিনি কবি।

কচি ঘাস, মাঠ, পাশে জল,
বসুধা, তোমার আঁচল
এখানে বিছাও—
মাথা রেখে শোবো আর দেখবো উষাও
মেঘে- মেঘে চলে নীলাকাশ;
শেষ ক'রে দূর পরবাস
ফিরে আসি ধরিত্রীর ছেলে,
মাটি, তুমি নাও বুক মেলে।

(''আঁচল'', অমরাবতী)

---

চতুরঙ্গ-র (সংখ্যা ৩ জুলাই ১৯৯২) প্রথম নিবন্ধে (বুদ্ধ থেকে মার্কস : রাহুল সাংকৃত্যায়নের অভিযাত্রা) কিছু অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদ ঘটে যাওয়ায় আমরা আন্তরিক দুঃখিত। নীচে শুদ্ধরূপ উল্লেখ করা হল :—

| পৃষ্ঠা | স্তম্ভ | পঙ্‌ক্তি | মুদ্রিত রূপ | শুদ্ধ রূপ |
|---|---|---|---|---|
| ১৭১ | ২ | ৫ | দিয়ে যে | দিয়ে যে] |
| ,, | ,, | ১১ | ব্যক্তির | ব্যষ্টির |
| ১৭২ | ১ | ১১ | বুদ্ধ শুনলেন, | বুদ্ধ বললেন, |
| ,, | ২ | ২ | সমান-বাস্তবতার | সমাজ-বাস্তবতার |
| ,, | ২ | ৭ | নিবাচনের | নির্বাণের |
| ১৭৩ | ১ | ৪ | সুখের — অবস্থা | সুখের অবস্থা — |
| ,, | ২ | ৩ | গোড়ার | গোড়ায় |
| ,, | ২ | ৩৩ | বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ | বুদ্ধ-ধম্ম-সঙ্ঘ |
| ১৭৫ | ১ | ৬ | বিনয় পিটক | বিনয়পিটক |
| ,, | ২ | ১৫-১৬ | করতে পারবেন অভাব ও ভয় থেকে। | করতে পারবেন, মুক্তি পাবেন অভাব ও ভয় থেকে। |
| ১৭৬ | ১ | ৬ | মনে | মানে |
| ১৭৭ | ২ | ৩ | সিলভিসা | সিলভিআ |
| ১৭৯ | ১ | ২৩-২৪ | ('দীর্ঘ নিকায়' ৩০) | ('দীঘ নিকায়' ৩০) |
| ,, | ২ | ১৬ | থলি | ফলা |
| ১৮০ | ১ | ৬ | তারাই | তাহারাই |

# পরম্পরা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কুটুম্ব! বলোতো তুমি কতদিন পরে আজ এলে,
বসুধা টুকরো, আমি তারই একখণ্ড নিয়ে
ভাল করে দেখছি, যাকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নিরীক্ষণ বলে,
দেখে কিছু সত্য লিখছি, কিছু লিখছি খেলাচ্ছলে
ইনিয়ে বিনিয়ে আর বানিয়ে বানিয়ে,
যেমন সাগর, ঝর্ণা, যেমত বা যৌনপ্রভা পঞ্চমী জ্যোৎস্নার,
ঐ সব সদাসত্যের সঙ্গেও আমাকে
মেশাতে হবেই কিছু উপমার মহামিথ্যা, যাকে
মিথ্যা না বলে কেউ কেউ বলতে পারে ভাষাশোধ আত্ম-অলংকার।
আসলেতো ভাষা বেশীদূর এখনো নিলোনা আমাদের
আমরা যাকে দুঃখ ভাবি, কেউ তাকে ভাবে আমোদের!

কুটুম্ব বলোতো তুমি এসব কি কিছুই জানতেনা,
জানতেনা বসুধার যতো সুধা সবই পান করে চেনা
আমাদেরই প্রত্ন-পার্লামেন্ট, কুটুম্ব তুমি তা দেখেও দেখলেনা,
না হলে দেখতেই পেতে কাদের মাথার পেছনে আছে এন্টেনার টিকি
যে তা দেখতে চায় সে তা দ্যাখে ঠিকঠিকই,
আমাদের দুঃখ এখন আর দুঃখিত হয়না
যে এমনিই পরিণামনিরাশ এক বুড়ো,
শুধু তুমি মাঝে, মাঝে অতি কাছে আসো
আলতোভাবে স্পর্শ রাখো পিঠে, হাত ধরো
নতুন ভাঙন শুরু করো, বসুধা যেমন ভাঙে, তেমনি ভেঙে ভেঙে
আবার লাগাও জোড়া, আমি একা কালো হই, আমিই একলা উঠি রেঙে।



# কিছু না

রত্নেশ্বর হাজরা

কিছু না কিছু একটা হওয়ার কথা ছিল আমার
একটা বিরাট কিছু  একটা দারুণ কিছু
এমন একটা কিছু যা হতে পারে উদাহরণ —
এমন কোনো কিছু যার জন্য জমে উঠবে ভিড়
দুলে উঠবে নির্জনতা
যার কথা বলাবলি করবে ট্রামবাসের লোকজন
কফি হাউসের আড্ডাবাজ যুবকযুবতী—
বয়স্ক মানুষ কিশোরকে ডেকে বলবে
হবে তো হও — ওর মতো হও।
কিন্তু আমি!
আমি যে শুধু আমার মতোই হয়ে রইলাম এখনো!

কিছু না কিছু একটা পাওয়ার কথা ছিল আমার
একটা বিরাট কিছু  একটা দারুণ কিছু.....
মনে করো একটা সমৃদ্ধ দ্বীপ কিংবা উপত্যকা
মরুভূমির দক্ষিণে একটা বিরাট নদীর অর্ধেক
কিংবা বিষুবরেখার পাশে একটা চিরসবুজ বাগান
অথবা এমন একটা কিছু যার জন্য
অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে সংসার
কাঙালের মতো হাত পাতবে সন্ন্যাসী।

কিন্তু আমি!
আমি তো সেটুকুও পেলাম না — যা পেলে
আমার অহংকারটুকু আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে—

# সে একটি চন্দ্রমল্লিকা

নাসের হোসেন

হতে পারে সে একটি চন্দ্রমল্লিকা হতে পারে গোলাপযুথিকা
কিন্তু এ কোন্ আকাশ থেকে নেমে আসছে কালো বৃষ্টি
কালো বর্ষাস্নাত মেয়ে, সে এখন কোথায় হাত পুড়িয়ে রাঁধছে
ও পাগল ভাই, তোমার ছোটবোন এখন কোথায় কিভাবে
রয়েছে সে তুমি জানো না, মানো কি মানো না দুর্লভ সুযোগ পেলে
সেও একদিন ছুটে যাবে সুদূর আমেরিকা, লস অ্যাঞ্জেলেসের
কবি সম্মেলনে পড়বে কবিতা, তার আঁকা ছবিগুলি টাঙানো হবে
ক্যালিফোর্নিয়ার দর্শক সম্মুখে, কি বিশাল শো রুম, অলৌকিক
সীমানা
তুমি তোমার বউ আর চন্দ্রমল্লিকা নামের ছোটবোনটি তিনজনে মিলে
সে কি তুমুল হল্লা করেছিলে সেবার, মনে আছে, দীঘার ডাকবাংলোয়
বিপুল ঝড়ে ভেসে গিয়েছিল রবীন্দ্রসংগীত
গভীর মৃদু স্বপ্নে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে আজ যে মেয়ে, সে এখন
কোথায় কার বাড়িতে ঠেলছে হেঁসেল, পান থেকে চুন খসিয়ে
খেপে উঠছে আর গালি পাড়ছে সুদূর অখ্যাত দাদাটিকে
সে কেন আসে না, সে কেন নিয়ে যায় না তাকে
বাপের বাড়িতে
মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে
দুষ্টু মিষ্টি কৈশোরের উচ্চ তৎপরতা
খালি পাকস্থলীর খিদের মতো ব্যাপ্ত পারাবারে
স্তব্ধ হয়ে আছে দুটি চোখ, অশ্রুরুদ্ধ, একটি নীল গাড়ি
থেকে নেমে এসে ভ্যানিটি ব্যাগে রাখে হাত



# এক টুকরো কবিতার জন্য

রমা পাহাড়ী

জানো, গভীর যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করি
বহু দিন নামেনি ঘুম।
শুধু কি জেগে থাকি আমি....
আমি জানি.....
আমরা কেউ কোনাদিন ঘুমোই নি
কোনোদিনও ঘুমোবো না।
অথবা ঘুমের ভান করে
আমরা স্বপ্ন দেখব...
এরোপ্লেন ভেঙে পড়া, জলে ভেসে এবং ডুবে
আবার সাঁতার কাটা, মাংসের হাড় চোষা
রেস্টুরেন্টে কফি খাওয়া, যখন ইচ্ছে কবিতা-লেখা,
অনেক উঁচুতে উঠে আবার মাটিতে মিশে যাওয়া
স্বপ্নে আমাদের সেই বৃত্ত তৈরি হবে—
আমরা ঘুম ছেড়ে স্বপ্ন ছেড়ে
হয়তো জেগে অথবা ঘুমিয়ে
কাটিয়ে দেব জীবনের সবটা সময়.....
হয়তো অপচয় নয়তো সবটাই হবে
জীবনের সমস্ত সঞ্চয়।........

# শেলি চিরকালের

সনাতন মিত্র

বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সে লেখা একটি কবিতাতে ইয়েটস্ লিখেছিলেন :

When I was young,
I had not given a penny for a song.
Did not the poet sing it with such airs
That one believed he had a sword upstairs;

কলম হাতে নিয়ে কবিতা লিখছি বটে, কিন্তু দরকার হলে তলোয়ার হাতে নিয়ে লড়াইয়ে নামতেও পিছপা হব না, এইরকম একটা ভাব যে কবি দেখাতে পারেন না, তাঁর কবিতার দাম কানাকড়িও দিতে রাজি নয়, এমন পাঠকের সংখ্যা কখনও কখনও খুব বেড়ে যায়। ইয়েটস যে সময়ের কথা বলছেন, তখন সময়টা সে-রকম ছিল। দেশ ও কালের একটা দাবি ছিল, যদিও এখন আর কবি তা মানতে রাজি নন, তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এখন তিনি কটুকণ্ঠে তাকে বলেছেন :— *The seeming needs of my fool-driven land.*

শেলি ত্রিশ, বছরের বেশি বাঁচেন নি ; যদি ইয়েটস-এর মতো, কিংবা ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর মতো দীর্ঘজীবী হতেন, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াত তাঁর চিন্তা-ভাবনা, কী দৃষ্টিতে দেখতেন নিজেকে, নিজের দেশকে, সমাজকে, ভূ-মণ্ডলকে, মানবসমাজকে, তাঁর অতীত এবং ভবিষ্যৎকে, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা অর্থহীন। তার চেয়ে বরং তিনি যা ছিলেন, যা হয়ে উঠেছিলেন, সে দিকেই দৃষ্টি ফেরান ভালো।

পার্সি বিশ্ শেলির জন্ম ১৭১২ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা অগাস্ট, সাসেক্সে। তাঁর পরিবারে সবাই তাঁকে ডাকত, 'বিশ্' বলে (তাঁর পিতামহের নাম অনুসারে), তাঁর প্রথম স্ত্রী তাঁকে বলতেন 'পার্সি', এবং আর সকলে বলত 'শেলি'। বাড়ির বড়ো ছেলে, তিনি জন্ম থেকে আদর আর প্রশ্রয়ই পেয়ে এসেছেন, ঘোড়ায় চড়া শিখেছেন বেশ ভালো করে, বন্দুক ছুঁড়তে শিখেছেন চমৎকার। কৈশোরের প্রারম্ভেই প্রেমেও পড়েছিলেন এক আত্মীয়া বালিকার, যদিও সেই রোমান্টিক প্রেম বেশি দূর অগ্রসর হবার পথ পায় নি। মেয়েটির মা-বাবা চাইলেন না তার ধ্যান-ধারণার ওপর শেলির প্রভাব পড়ুক। ভেঙে গেল সেই কৈশোর প্রেমের স্বপ্ন। মেয়েটির নাম ছিল হ্যারিয়েট গ্রোভ। এদিকে যে ইস্কুলে শেলি ১৮০৪ সালে প্রবেশ করেছিলেন, সেই ইটন কলেজেও তাঁর জীবন ততদিনে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। 'র‍্যাগিং' নামক যে প্রথাটি এখনও আমাদের দেশের নামজাদা নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নবাগতদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে চলেছে, ইংলন্ডের পাবলিক স্কুলে তার প্রচলন ছিল অপ্রতিহত। শেলির মতো স্পর্শকাতর কিশোরের পক্ষে তা কীরকম অসহনীয় ছিল, আমরা অনুমান করতে পারি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমাদের রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়-জীবনের অভিজ্ঞতার কথা, যদিও অবশ্য তাঁকে ইস্কুলের বোর্ডিং-এ থাকতে হয় নি। তার ওপরে আবার শেলি সেই কিশোর বয়সেই ছিলেন কথা-বার্তায় চাল-চলনে অন্যদের থেকে আলাদা ''নন-কনফরমিস্ট''। এ-রকম ছেলের বিদ্যালয়ে কী দুর্গতি হয়, কী নিগ্রহ তাকে ভোগ করতে হয় সহপাঠীদের হাতে, আমরা সবাই জানি। কিন্তু, যদিও আঘাত করা সহজ ছিল তাঁকে, কাবু করা সহজ ছিল না। সহজে হার মানবার পাত্র ছিলেন না তিনি। জনৈক সমালোচক অনুমান করেছেন, সেই তখন থেকেই তাঁর মনে সেইরকম একটা সঙ্কল্প গড়ে উঠেছিল, যার কথা তিনি পরে ব্যক্ত করেন এই ভাবে :

'I will be wise,
And just, and free, and mild if in me lies
Such power, for I grow weary to behold.
The selfish and the strong, still tyranise
without reproach or check.

(Laon and Cythna. Dedication)



তিনি তখনই প্রতিজ্ঞা করলেন, 'অত্যাচারীরা' তাঁকে যা শেখাতে চাইছে তা তিনি শিখবেন না, নিষিদ্ধ ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করবেন। 'নিষিদ্ধ বিদ্যা' বলতে, পরাবিদ্যা, প্রেতচর্চা, যাদুবিদ্যা, অ্যালকেমি, ইত্যাদি প্রায় শৈশব থেকেই তাঁর আগ্রহের বিষয় ছিল। হয়তো তাঁর পিতামহ স্যার বিশ্-এর পারিবারিক গ্রন্থাগারে ওই সব বিষয়ের বইয়ের সংগ্রহ ছিল। শেলি নিজেও লিখেছেন :

While yet a boy I sought for ghosts, and sped
Through many a listening chamber, cave and ruin,
And starlight wood, with fearful steps pursuing
Hopes of high talk with the departed dead.

(Hymn to Intellectual Beauty)

আর ছিল বিজ্ঞান। আজকের দিন শুনলে অবাক লাগে, কিন্তু শেলি যখন ইটন-এর ছাত্র, তখন ইংলন্ডের সেই অগ্রগণ্য অভিজাত বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-চর্চাও ছিল নিষিদ্ধ। প্রায় অনিবার্যভাবে শেলি অ্যালকেমি থেকে কেমিস্ট্রির দিকে ঝুঁকলেন। আবার বিদ্যুতের নানা যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে উঠলেন। তাঁর সেই বিজ্ঞানের শিক্ষা পরবর্তী কালে তাঁর কবিতাতে কীভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল, অনেক সমালোচক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তা বিশ্লেষণ করেছেন।

১৮১০ সালের অক্টোবর মাসে শেলি অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউ কলেজে প্রবেশ করেন। সেখানেও চলল তাঁর নিজস্ব বিজ্ঞান চর্চা। তার বন্ধু (Hogg) হগ সেই কলেজে তাঁর ঘরের একটি বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর লেখা শেলির জীবনী গ্রন্থে :

An electrical machine, an air-pump, the galvanic trough, a solar microscope, and large glass jars and receivers, were conspicuous amidst the mass of matter.... There were bottles of soda water, sugar, pieces of lemon, and the traces of an effervescent beverage. (T. J. Hogg. Life of Shelley)

বছর না ঘুরতেই, ১৯১১-র মার্চ মাসে তাঁর অকস্‌ফোর্ড বাসের অবসান, 'নিরীশ্বরবাদের প্রয়োজনীয়তা'-নামক একটি অতি ক্ষুদ্র স্বাক্ষরবিহীন পুস্তিকা প্রচার করার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বহিষ্কার করল, এবং বন্ধু হগকেও চলে যেতে হল একই সঙ্গে।

শেলি ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না। কর্তাব্যক্তিদের 'জুলুমবাজি'-র ফল হল তাঁরা যা চেয়েছিলেন তার উলটো। শেলি সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে। তাঁর বোন এলিজাবেথ-এর এক বান্ধবী, হ্যারিয়েট ওয়েস্টব্রুক নাম্নী এক ষোড়শী সুন্দরীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাকে নিয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন এডিনবরাতে। সেখানে গান্ধর্ব বিবাহ জাতীয় কিছু একটার অনুষ্ঠান হল ১৯১১-র অগস্ট মাসে। বরের বয়স উনিশ, কনের তখন সতেরোও হয় নি। এই বিবাহ যেমনই হোক, এই প্রেম থেকে জন্ম নিল এমন একটি কবিতা কৈশোরসুলভ অকালপক্বতা যার কাব্যগুণকে একেবারে গ্রাস করতে পারে নি, স্তিমিত করতে পারে নি যার উদ্ধত আত্মপ্রকাশকে :

Whose is the love that gleaming
Through the world,
Wards off its poisonous arrow
Of its scorn?
Whose is the warm and partial praise
Virtues most sweet reward?
Beneath whose books did my reviving soul
Riper in truth and virtuous daring grow?
Whose eyes have I gazed fondly on,
And loved mankind the more?

Harriet! on Thine:—Thou wert my
purer mind;
Thou wert the inspiration of my song:
.....(To Harriet)

আত্মপ্রকাশ, অর্থাৎ ক্ষমতাবানের অত্যাচারের সম্পর্কে অসহিষ্ণুতার প্রকাশ, সমাজের কর্তৃত্ব জাহিরের বিরুদ্ধে। ব্যক্তির স্বাধিকারের দাবির উচ্চারণ। প্রচলিত রীতিনীতি সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা, নতুন কিছু নয়। নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গিতে, নানা রূপক অলঙ্কার ইত্যাদির সাহায্যে কবি সাহিত্যিক, শিল্পীরা সমাজের শাসনের বিরুদ্ধে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আসছেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে 'Piers Plowman' নামে পরিচিত কাব্য কিংবা বলা উচিত কবিতামালাটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তারপরেও দেড়শো-দুশো বছর তার প্রভাব-প্রতিপত্তি, বলা চলে, অক্ষুণ্ণ ছিল জনমানসে। তার রচয়িতা উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড-এর (William Langland) বিষয়ে খুব বেশি কিছু জানা যায় না, কিন্তু একটা

জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়, তাঁর সমকালীন সমাজ এমন হয়ে উঠেছিল যে একজন সাধু চরিত্রের ধর্মপ্রাণ প্রকৃত খ্রিস্টানের পক্ষে তা আর কোনক্রমেই বরদাস্ত করা সম্ভব ছিল না। সে সমাজ শুধু নামেই খ্রিস্টান, তার রক্তে রক্তে দুর্নীতি, অনাচার, পাপ; তার অভিজাত শ্রেণী, তার ধর্মযাজক সম্প্রদায় পাপে পরিপূর্ণ। তীব্র বিদ্রূপের কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন কবি তাঁর সমাজদেহকে।

শেলির আক্রমণটা অবশ্য ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে আসে নি। নিরীশ্বরবাদের প্রয়োজনীয়তা তিনি জীবনের প্রারম্ভেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন, এবং তারপর সারাজীবন তাঁর হৃদয়াবেগ ধাবিত হয় এমন একটা সত্য উপলব্ধির দিকে যা বিচারবুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রচলিত মত ও বিশ্বাসের আক্রমণ প্রথম থেকেই তার ওপর এসে পড়েছিল বলেই হয়তো তিনি একেবারে বিপরীত মেরু থেকে প্রতি-আক্রমণে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তির সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। অবশ্য এটা একটা নিছক রণকৌশলের ব্যাপারই ছিল, তা বললেও কবির প্রতি অবিচার করা হয়। যদিও যুদ্ধের তাগিদ একটা ছিল, তাও ঠিক। সমাজের রক্ষণশীলতা মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখে, সেই শৃঙ্খল একমাত্র ভাঙতে পারে নির্ভীক বিচারবত্তা, মননশক্তি, ''বিচারের স্রোতঃপথ'' -কে বাধা মুক্ত করতে ''শুষ্ক আচারের মরু বালুরাশি'' সরানোই চাই।

হ্যারিয়েট-এর সঙ্গে তাঁর রীতি-বিরুদ্ধ সম্পর্ক যখন গড়ে উঠছে সেই সময়ে, সম্ভবত নিজের স্বাধীন চিন্তাধারাকে একটা দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির ওপর, কিংবা বলা উচিত একটা বৃহত্তর সমাজ-দর্শনের ভিত্তির ওপর স্থাপন করবার জন্যেই, বলা যেতে পারে, স্মরণ নিলেন এমন এক গুরুর যিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং নৈতিক ক্ষেত্রে যাকে বলা হয়, ethical determinism-তার প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। উইলিয়াম গডউইন-এর (William Godwin) *An Enqriry concerning Political Justice, and its Influences on General Virtue and Happiness* প্রকাশিত হয় শেলির জন্মের পরের বছরই, ১৭৯৩ সালে, কিন্তু ওই বইখানির জোরে তখনও তিনি সমাজের অগ্রগামী দলের নেতৃস্থানীয় প্রতিভূ। তাঁর মতে অন্ধ সংস্কার এবং ভাবাবেগ-মুক্ত একক মানুষের মন যুক্তির প্রয়োগের দ্বারা নিজের মধ্যেই ভালো-মন্দের মানদণ্ডের সন্ধান পাবে যার সাহায্যে সে নিজের পথ খুঁজে নিতে পারে। মানুষের সামনে নৈতিক অগ্রগতির সীমাহীন পথ খোলা আছে। ভাবের আবেগের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে সে যদি বিশুদ্ধ ''ইনটালেকট''-কে অবলম্বন করে, তবেই সে সন্ধান পাবে কিসে তার নিজের শুধু নয় তার সমাজেরও সর্বোচ্চ মঙ্গল। যে সমাজ যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সামাজিক সাম্য এবং বন্ধনমুক্তি তারই করায়ত্ত। সমাজের বর্তমান ধনবণ্টন, রাষ্ট্র-শাসনের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা, প্রচলিত জীবনযাপন প্রণালী সবকিছু নিয়েই নতুন করে বিচার-বিবেচনা প্রয়োজন। যদি দরকার হয়, সবই ঢেলে সাজাতে হবে। এমনকি বিবাহ ব্যবস্থাও। ব্যক্তির ওপর সমাজের শাসন যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত নৈরাজ্য।

ফরাসি বিপ্লবের ঝোড়ো হাওয়া তখনও প্রবল, বিশেষ করে যুবসমাজের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে। টমাস পেইন, তার *Rights of man*- এ রাজতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্রকে বর্তমান যুগে অচল এবং অনুপযোগী বলে ঘোষণা করেছেন। ইংলন্ড এবং স্কটল্যান্ড-এর প্রায় প্রত্যেক সহরে সমিতি স্থাপিত হয়েছে তাঁর বক্তব্য প্রচারের জন্যে, এবং বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সের প্রতি সে দেশে জনসমর্থন কত জোরালো তা প্রমাণ করবার জন্যে। সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের মহলে এমনকি অভিজাতদের মধ্যেও যাঁরা একটু বেপরোয়া ভাবাপন্ন তাদের অনেকের কাছেও ফরাসি বিপ্লবের বার্তা বড়োই চিত্তাকর্ষক বোধ হয়েছিল। মনে হয়েছিল, এইবার মানুষের চিন্তা-ভাবনায়, সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অন্ধ-প্রাচীনপন্থার অবসান হল, চার্চে এবং রাষ্ট্রে শেষ হল প্রতিকারহীন অত্যাচারের দিন। মানুষের ব্যক্তিসত্তা এবার বাধামুক্ত বিকাশের পথ পাবে। মানুষের ওপর নানা বাধা-নিষেধ এতদিন তার আত্মপ্রকাশকে ব্যাহত করেছে, তার পরিপূর্ণ আত্মবিকাশ এবার সম্ভব হবে। উচ্ছৃঙ্খলতা, ''নৈতিক ব্যাভিচার'' যাকে বলা হয়, তা সাহিত্যিক ও শিল্পী সমাজে, এবং অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে আগেও ছিল। কিন্তু আগে তা এমন সোচ্চারে নিজেকে, নির্দোষ শুধু নয়, শ্রেয় বলে কখনও ঘোষণা করে নি, দাবি করে নি, যথেচ্ছাচার, নরনারীর অবাধ মিলন এক উচ্চতর নৈতিকতার অন্তর্গত। এর প্রতিক্রিয়া বৃহত্তর সমাজে কী হয়েছিল, সে কথায় পরে আসছি। এখনকার মতো আবার শেলির কথায় ফিরে যাওয়া যাক।

হ্যারিয়েটের সঙ্গে শেলির রোম্যান্টিক প্রেম এবং বিবাহের পরিণাম সুখের হল না। আমাদের কাছেও সে ইতিহাস সুখকর নয়। কৈশোরের হৃদয়াবেগ অচিরে জুড়িয়ে



যেতে শুরু করল। এর মধ্যে আবার আরেকজন নারী আবির্ভূত হয়েছেন শেলির জীবনে। এলিজাবেথ হিচেনার (Eligabeth Hitchener) সাসেক্স-এর শিক্ষিকা, শেলির চেয়ে বয়সে দশ বছরের বড়ো। কিন্তু তিনি পাগল হলেন শেলির প্রেমে। ১৮১১-১২ সালে তাঁদের দুজনের মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান যা হয়েছিল, পড়লে দেখা যায় — প্রথমে দার্শনিক স্তরে শুরু হলেও পরে তাতে হৃদয়-বিনিময়ের আঁচ লেগে যায়। হ্যারিয়েট প্রথম প্রথম তাতে আপত্তি করেন নি। পরে তিনি অবশ্য বেঁকে বসেন, তাঁর বোনের প্ররোচনায়। মুশকিল হল যখন মিস হিচেনার শেলির আমন্ত্রণে তাঁদের গৃহে অতিথি হয়ে এলেন। তাঁর ব্যবহার এমনকি শেলির কাছেও এমন অসহ্য হয়ে উঠল, যে কোনরকমে একটা মাসোহারার ব্যবস্থা করে অবশেষে কবিকে সেই প্রণয়িনীর হাত থেকে উদ্ধার পেতে হল।

ইতিমধ্যে শেলি আয়ারল্যান্ড থেকে ঘুরে এসেছেন। সেখানে গিয়েছিলেন বন্ধনমোচনের বাণী প্রচার করতে। সে প্রয়াস ব্যর্থ হবার পর দেশে ফিরে এসে তিনি ''*A Declaration of Rights*'' নামে নিবন্ধ রচনা করে মানবমুক্তির আবেদন দিকে দিকে প্রচার করতে ব্রতী হলেন। বেলুন থেকে তাঁর রচনা ছড়িয়ে দিলেন বাতাসে, বোতলে পুরে ভাসিয়ে দিলেন সমুদ্রে। এর আগে *The necessity of Atheism* তিনি বেছে বেছে বিশপদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর গৃহপরিচারকের সেই রচনা-সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন ডাকবাক্সে ফেলতে গিয়ে ধরা পড়ে ছ-মাসের কারাবাস।

তখন তিনি তাঁর প্রথম দীর্ঘ কবিতা *"Queen Mab"* রচনা করছেন, ১৮১৩ সালে সে কবিতা ছাপা হল, গুপ্তভাবে। সেই বছরই তাঁর কন্যা আইআ্যানার্থ-র জন্ম, পরের বছর পুত্র চার্লস-এর। আগেকার স্কটল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিবাহটা আইনত সিদ্ধ নয় জেনে তিনি হ্যারিয়েটকে ইংলন্ডে আবার একবার বিয়ে করলেন। কিন্তু ততদিনে মনের দিক থেকে সে বিয়ে প্রায় ভেঙেই গেছে। কয়েকমাসের মধ্যেই তাঁরা পাকাপাকি ভাবে আলাদা হয়ে গেলেন। ১৮১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে হ্যারিয়েট আত্মহত্যা করেন। অনেকে বলেন তাতে শেলির কোনও দোষ ছিল না।

এবারে আবার উইলিয়াম গডউইন-এর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তাঁর স্ত্রীও বড়ো সামান্য নারী ছিলেন না; বরং বলা যায় স্বামীর চেয়ে এক কদম এগিয়েই ছিলেন। ১৭৯২ সালে প্রকাশিত তাঁর *A Vindication of the Rights of Woman* মেরি ওলস্টোনক্রাফ্‌ট্‌-কে যে খ্যাতি এনে দিয়েছিল, তার ফলে বলা যায় গডউইন-এরই প্রধান পরিচয় হয়ে দাঁড়াল তিনি মেরির স্বামী, এবং শেলির শ্বশুর। তাঁদের কন্যা মেরি ওলস্টোনক্রাফ্‌ট গডউইন-এর প্রেমে যখন শেলি আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলেন, হ্যারিয়েট তখনও বেঁচে। বিবাহ সম্ভব নয়। তাঁরা দুজনে সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে গেলেন; সঙ্গে গেলেন গডউইনের দ্বিতীয় স্ত্রীর কন্যা ক্লারা ক্লেয়ারমণ্ট (Clara Clairmont)। কিছুদিন পরেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। ১৮১৬-র প্রথম দিকে মেরি এবং শেলির একটি পুত্রের জন্ম। আবার সুইজারল্যান্ড। সেখানে স্বদেশ থেকে নিবাসিত কবি বায়রন-এর সঙ্গে তাঁদের সম্মিলন। এবারও সঙ্গে ছিলেন সেই ক্লারা। তাঁরা জানতেন ক্লারা ইতিমধ্যে বায়রন-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। এবারকার বিদেশবাসের একটি উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি, মেরি শেলির বিখ্যাত কাহিনী *ফ্রাঙ্কেনস্টাইন*। বায়রন-এর তখন ভূতের গল্পে খুব আগ্রহ। প্রধানত তাঁরই তাগিদে মেরির কলম থেকে বেরোল এমন একখানি উপন্যাস জনচিত্তে যার স্থান প্রশ্নের অতীত। সে উপন্যাস থেকে জন্ম নিল এমন একটি শব্দ যা চিরস্থায়ী হয়ে গেল ইংরেজি ভাষায়।

শেলির *কুইন ম্যাব-ও*, যদিও খুবই অল্প বয়সের অপরিণত লেখা, জনপ্রিয়তার বিচারে সফলই বলতে হবে। নিজে তিনি কবিতাটি কখনও প্রকাশ করেন নি, নিজের রচনাসংগ্রহ যদি কখনও প্রকাশ করতেন, তাতেও কবিতাটিকে স্থান দিতেন কিনা সন্দেহ। তাঁর স্ত্রী অবশ্য কবিতাটি সম্পর্কে অতি উচ্চধারণাই ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন: *But the poem is too beautful in itself, and far too remarkable as the production of a boy of eighteen to allow of its being passed over.* মানবজাতির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের পটভূমিকায় স্থাপিত কবিতাটিতে শেলি নিজেই বলেছেন, রূপকথার আড়ালে আছে *"Long notes against Jesus Christ, God the father, the King and the Bishops and marriage and the Devil knows what"*. আসলে, অত সব আক্রমণাত্মক বক্তব্যকে এত ব্যস্ত হয়ে হাজির করতে গিয়ে তরুণ কবি মনে হয় কবিতাটির ক্ষতিই করেছেন, যে অচঞ্চল ভূমির ওপর স্থির হয়ে সৌন্দর্য বোধকে পরিতৃপ্ত করতে হয় সেখানে কবিতাটিকে দাঁড়াতে দেন নি।

তবু, শেলির এই একটি কবিতাই, বলা যায়, তাঁর জীবিতাবস্থায় জনপ্রিয় হয়েছিল, ১৮২১-এর পর বারে বারে

পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল, এবং তখনকার শ্রমজীবী আন্দোলনে যাঁরা 'র‍্যাডিক্যাল' বলে পরিচিত ছিলেন তাঁদের কাছে প্রায় বাইবেলের মর্যাদা পেয়েছিল।

১৮১৫ সালে প্রকাশিত হল *Alastor*, নিঃসন্দেহে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য। এবার আর ভুল করবার যো নেই, সত্যিকারের শেলি পরিপূর্ণ ভাবে এবার আত্মপ্রকাশ করলেন। নানা জনে কবিতাটিকে নানা রকম ভাবে বুঝেছেন, নিজের নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন, *Alastor: Or the Spirit of Solitude*-এর ভূমিকায় কবি নিজে বলেছেন, যারা "Self-centred Seclusion" -এর মধ্যে পরিতৃপ্তির সন্ধান করে, মানবিক সহানুভূতি ছাড়াই জীবনযাপন করতে চায় তাদের বেদনাদায়ক নিয়তিই তিনি দেখাতে চান। কবির লাগাম ছাড়া কল্পনার বেগ যদি সেই উপলব্ধিকে প্রায় অদৃশ্য করে ফেলে যাকে, যদি শেষ পর্যন্ত মনে হয় একটা মোহমুগ্ধ আত্মসর্বস্বতাই প্রবলতর হবে উঠল, তবু অস্বীকার করা যায় না, প্রকাশভঙ্গির গাম্ভীর্য, এর ওয়ার্ডসোয়ার্থীয় *blank verse*এর অনুচ্ছল সঙ্গীত, এবং এর মধ্যে গভীরতর চিন্তার যে প্রতিফলন, একজন কবির মনের অগ্রগমনের যে শান্ত সুন্দর চিত্র আমরা দেখতে পাই, তা নিঃসন্দেহে কবিতাটিকে একটা মর্যাদা এবং মূল্য দিয়েছে।

একই বছর প্রকাশিত হয় *The Hymn to Intellectual Beauty*. এ হল সেই সৌন্দর্য, কিংবা সৌন্দর্যের বিমূর্ত আত্মার ধারণা, যা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ঊর্ধ্বে, কবির কল্পলোকে অবস্থিত। মানুষের চেতনায় এর আনাগোনা। এর ছায়া আমরা দেখি, কিংবা হয়তো দেখি না, অন্য কোনভাবে উপলব্ধি করি, যদিও এ নিজে আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। একমাত্র উপমার সাহায্যেই সে উপলব্ধির বর্ণনা সম্ভব।

Visiting
This various world with an inconstant wing
As summer winds that creep from flower to flower,—
Like moonbeams that behind some piny mountain shown,

এই যে Spirit of Beauty, এ যখন আমাদের ত্যাগ করে যায় তখন বাকি থাকে শুধু শূন্যতা, আর যন্ত্রণা

Why dost thou pass away and leave our state,
That dim vast vale of tears, vacant and desolate?

এই কবিতার ছত্রে ছত্রে সেই হারানোর বেদনা। এ বেদনা শুধু কবির একার নয়, বিশ্বমানবের। এ বেদনা রোম্যান্টিক চেতনার অন্তরেই নিহিত।

*The Hymn to Intellectual Beauty*-তে শেলির ভাববাদ (idealism) এমন দৃঢ় উপলব্ধির ওপর স্থাপিত দেখতে পাই, এমন নিঃসংশয় তাবু উচ্চারণ, যে আমাদের এই অশ্রুপ্লাবিত উপত্যকায় দাঁড়িয়েও যেন মনে হয়, এই শেষ কথা নয়, আমাদের সৃষ্টির অন্তরালে, আমাদের বিশ্বরঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে কী এক চরিতার্থতা অবতীর্ণ হবার জন্যে অপেক্ষা করছে।

...never joy illumed my brow
Unlinked with hope that thou wouldst free
This world from its dark slavery,
That thou —O awful LOVELINESS
Wouldst give whate'er these words cannot express.

*(Hymn to Intellectual Beauty)*

ইতিমধ্যে *Examiner* পত্রিকার সম্পাদক এবং কবি লী হান্ট-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে উঠেছে। হান্ট তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন জন কীট্স্-এর সঙ্গে। দুই কবি তখন ঠিক করলেন, প্রত্যেকে ৪০০০ লাইনের একটি করে কাব্য রচনা করবেন। শেলি লিখলেন *Laon and Cythna*। ষোড়শ শতাব্দীর কবি এডমন্ড স্পেনসার-এর (Edmund Spenser) উদ্ভাবিত স্পেনস্রীয় অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত এই "romance epic" টি রচনার পেছনে শেলির উদ্দেশ্য ছিল ফরাসি বিপ্লবের যে সব সমর্থক ১৭৮৯-এর পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরায় হতাশ্বাস হয়েছিলেন তাঁদের ভ্রান্তির নিরসন করা; তাদের শেখানো যে অনেক হতাশা, অনেক ব্যর্থতা, অনেক রক্তপাত, এবং আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়েই সাম্য মুক্তি, ভ্রাতৃত্বের লক্ষ্যের দিকে এগোতে হবে। এই কাব্যের প্রেমিক-প্রেমিকা, এখনকার যুগেও যা প্রায় অকল্পনীয় পরস্পরের ভাই-বোন, কেননা, প্রচলিত বাধা-নিষেধের সমস্ত শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে হবে। শুধু তাই নয়, খ্রিস্ট ধর্ম এই কাব্যে যে মূর্তিতে উপস্থিত তা নৃশংস-রক্তলোলুপ। মতের স্বাধীনতার এতটা বাড়াবাড়ি সে যুগের পাঠক সমাজ এবং রাষ্ট্রশক্তি বরদাস্ত করবে কিনা সে বিষয়ে প্রকাশকের মনে যথেষ্ট সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে,



কবিকে তিনি রাজি করলেন কাব্যে কিছু কিছু পরিবর্তন এবং পরিবর্জন করতে, এবং নিজেদের সমাজ থেকে এর কাহিনীকে একটু দূরে ঠেলে দিতে, কাব্যটির নতুন নামকরণ হল *"The Revolt of Islam.*

তবু সেই বিপ্লবাত্মক রচনা গ্রহণযোগ্য হল না পাঠক সমাজে। এই অবসরে শেলির রচনার সমকালীন জনপ্রিয়তার প্রশ্নের দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে, *The Necessity of Atheism* খুব কম লোকই পড়েছিল এবং তার অধিকাংশ কপিই পুড়িয়ে ফেলা হয়। *Queen Mab* ছাপা হয়েছিল ২৫০ কপি, কিন্তু কবির জীবনকালে সত্তর কপির বেশি পাঠকদের হাতে পৌঁছেছিল কিনা সন্দেহ। *The Revolt of Islam এর প্রথম সংস্করণ Laon and Cythna* নামে, ছাপা হয় ৭৫০ কপি। পরে যখন প্রকাশক অলিয়ার-এর পীড়াপীড়িতে কবি তার নাম বদলে দেন এবং ২৬ পৃষ্ঠা বাদ দিতে রাজি হন তখন সেই নতুন সংস্করণেরও যে খুব কাটতি হয়েছিল তা নয়। তাঁর নাটক *Cenci* অবশ্য ভালোই চলেছিল। তাঁর জীবনকালে সে নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণও হয়েছিল। (তাঁর অন্য কোনও রচনারই রীতিমতো প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ দেখে যাবার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। *Prometheus Unbound*-এর কপালে আবার সেই অনাদর। শেলির মহত্তম সৃষ্টি, তাঁর কাব্যাকৃতির একেবারে কেন্দ্রে যার আসন, (অনেক পাঠক এবং সমালোচকের তাই মত) সেই অবিস্মরণীয় কাব্য নাট্যটি, কবি নিজেই ধরে নিয়েছিলেন, ২০ কপির বেশি বিক্রি হবে না। শোনা যায়; জন ছ-সাতেকের জন্যেই নাকি নাটকটি লেখা হয়েছিল। *Epepsychedion*-এর দুশো কপি ছাপা হয়, দু শিলিং করে দাম, কবির নাম গোপন রাখা হয়। বিশেষ কোনও কথাবার্তা শোনা যায় না কাব্যটি সম্পর্কে। *Adonais* ছাপা হয়েছিল ইতালির পিজাতে, শেলির নিজের তত্ত্বাবধানে, ১৮২১ এর জুলাই মাসে, মূল্য সাড়ে তিন শিলিং। ১৮২৪ সালেও ওই দামেই কবিতাটি বাজারে পাওয়া যাচ্ছিল। অথাৎ দেখা যাচ্ছে, শেলির কাব্যের চাহিদা তাঁর জীবিতাবস্থায় এতই কম ছিল যে, যে কোনও কবিযশঃপ্রার্থীকে তা নিরুৎসাহ করতে পারত। এ সব তথ্য আমি পেয়েছি যে বইটি থেকে তার নাম *Shelley: The Critical Heritage* সম্পাদক James E. Barcus, Routledge and Kegan Paul Ltd ১৯৭৫ সালে বইটি প্রকাশ করেন। শেলির বিষয়ে তাঁর নিজের সময়ের পাঠক ও সমালোচকদের মনোভাব ও মতামত সম্পর্কে নানা কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যের একটি অমূল্য আকর এই বইটি।

যাই হোক্ *The Revolt of Islam*-এর অনাদরে শেলি একটু দমে গেলেন। ১৮১৮-র বসন্তকালে শেলি আবার স্বদেশ ত্যাগ করলেন, এবার শেষবারের মতো। সূর্যকরোজ্জ্বল ইতালিতে যাওয়া তাঁর স্বাস্থ্যের কারণেও প্রয়োজন হয়েছিল, আবার অবিবাহিত ক্লারা ক্লেয়ারমণ্ট-এর কন্যা অ্যালেগ্রাকে তার বাবা কবি বায়রনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দরকার ছিল। মেরি শেলি তাঁর দুই সন্তান উইলিয়াম এবং ক্লারাকে নিয়ে স্বামীর কাছে এলেন কিছুদিনের মধ্যেই। এক বছরের ক্লারা বোধ হয় বিদেশ যাত্রার ধকল সহ্য করতে না পেরে, মারা গেল ইতালিতে পৌঁছেই। সেই সন্তান-বিয়োগের বেদনা থেকে জন্ম নিল ইংরেজি সাহিত্যের এক স্থায়ী সম্পদ শেলির *Lines Among the Euganeau Hills.*

তার মধ্যে *Prometheus Unbound*-এর প্রথম সর্গ লেখা শেষ হয়ে গেছে। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮২০ সালে। তার আগে ১৮১৯-এ তিনি রচনা করেছেন *Peter Bell the Third.* (ওয়ার্ডসোয়ার্থ-এর ওপর এক তীব্র ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ), এবং তাঁর সর্বাধিক পঠিত এবং সমাদৃত কবিতা *Ode to The West Wind*। কোনও একটি কবিতা দিয়ে যদি শেলিকে চিনতে হয় তা হলে সে কবিতা ওই "ওড"। Emile Leguis এবং Lauis Cazamian-এর রচিত ইংরেজি সাহিত্যের সর্বজন-পরিচিত ইতিহাসে শেলির প্রতিভার যে বর্ণনাটি আছে, ওই কবিতাটি সম্ভবত তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন : Shelley's lyricism is incomparable. In no other do we find the perfect sureness, the triumphant rapidity of this upward flight, this souring height, its superterrestrial quality as well as the poignant intensity of the sounds which fall from these aerial regions.

শেলির কবিতায় প্রকৃতি মানুষকে উদ্বোধিত করে, উদ্দীপ্ত করে, তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা, অসহায়তা থেকে তাকে তুলে নিয়ে মহত্তর কোনও শক্তির সঙ্গে, কোনও প্রক্রিয়ার সঙ্গে, কোনও ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে যুক্ত করে। যখন প্রকৃতিতে সাড়া নেই, তখন কবিও নিস্তেজ :

.....Like a wave under the calm I fail
(Fragment : I faint. I perish with my love)

খুব খুঁটিয়ে বিচার করলে *West Wind* -এ

কিছু কিছু অসঙ্গতি, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরখ করলে কিছু ভুলভ্রান্তির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা সেটা তর্কের বিষয়। অতি বিশিষ্ট এবং অতিশয় প্রভাবশালী সমালোচক ড. এফ আর লিভিস শেলির ওপর তাঁর বহুকথিত প্রবন্ধে বলেছেন নৈসর্গিক ঘটনাটির চিত্র শেলির কবিতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। বাস্তব ব্যাপারটিকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরতে পারেন নি তিনি। অন্যেরা বলেন, শেলির পর্যবেক্ষণ এবং বর্ণনা যথাযথ **বৈজ্ঞানিক সত্যের** ওপর প্রতিষ্ঠিত। পাঠকের মনে এ সব **প্রশ্ন জাগে কিনা** সন্দেহ। সে শুধু দেখে ঝড়ের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে কবির আবেগ এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায়—এই ভাঙছে এই গড়ছে ছবির পর ছবি। তার মধ্যে আসছে নতজানু কবির আর্ত প্রার্থনা। আশ্বাসের বাণী একটা আছে বটে কবিতার মধ্যে, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে কখনও উল্লাস, কখনও আর্তিই প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রকৃতি যখন শান্ত, বায়ুমণ্ডল অবিক্ষুব্ধ সমুদ্র অনুত্তাল কবি তখনই ভারাক্রান্ত এক অর্থহীন, আশাহীন, উদ্দেশ্যহীন অস্তিত্বের বোধে, তখন তাঁর নিজের দুঃখ-বেদনা নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতাই মনে হয় সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠল। যখন :

The sun is warm, the sky is clear.
The waves are dancing fast and bright,
Blue isles and snowy mountains wear
The purple noon's transparent might.

কবি তখন মুহ্যমান, কাতর :

Alas! I have nor hope nor health,
Nor peace within nor calm around,
.....
Nor fame, nor power, nor love, nor leisure.
Others I see whom these surround—
Smiling they live, and call life pleasure;—
To me that cup has been dealt in another measure.

তখন আর কবির অবসন্ন চিত্তের সামনে মৃত্যু ছাড়া ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই।

Yet now despair itself is mild,
Even as the wind and waters are;
I could lie down like a tired child,
And weep away the life of care
Which I have borne and yet must bear,
Till death like sleep might steal on me,
And I might feel in the warm air
My cheek grow cold, and hear the sea
Breaths o'er my dying brain its last monotony

(Stanzas written in dejection near Naples)

এই অত্যন্ত পরিচিত কবিতাটি থেকেও এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম এই কারণে যে *West Wind*-এর পাশাপাশি এটিকে রাখলে অনেকটা বোঝা যায় প্রকৃতি সম্পর্কে শেলির অনুভব, কী রূপে প্রকৃতি তাঁর দৃষ্টিতে, তাঁর কল্পনায়, তাঁর আত্মিক প্রয়োজনের আলোতে প্রতিভাত। ওয়ার্ডসোয়ার্থ-এর কাব্যে প্রকৃতি নিজস্ব সত্তায় মহীয়ান, বিশ্ব চরাচরে ব্যাপ্ত এক অপরিমেয় অস্তিত্ব। ঝড়-ঝঞ্ঝা, সমুদ্রতরঙ্গের বিক্ষোভের প্রয়োজন করে না, তার নিঃশব্দ উপস্থিতিই মানুষের চিত্তকে, তার কল্পনাকে, উচ্চতর লোকে উত্তীর্ণ করবার পক্ষে যথেষ্ট। তার কারণ মানুষ যখন ছিল না তখনও সে ছিল, মানুষ যখন থাকবে না তখনও সে থাকবে, মানুষ যেখানে নেই সেখানেও সে আছে। শেলির কবিতায় প্রকৃতি ততখানিই সত্য যতখানি তার মধ্যে নিজের আবেগ ও অনুভূতির, নিজের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন তিনি দেখতে পান। ওয়ার্ডসোয়ার্থের *The Prelude* কবিতায় সেই বিখ্যাত ঘটনাটির কথা মনে পড়ে, বালক কবির চুরি করা নৌকাটি নিয়ে যাত্রা করার কথা, যখন তাঁর চোখের সামনে হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়াল এক বিশাল, কৃষ্ণবর্ণ শিলাখণ্ড, তারকাখচিত সন্ধ্যার আকাশ আড়াল করে।

I struck and struck again,
And growing still in stature its grim shape
Towered up between me and the stars, and still,
For so it seemed, with purpose of its own
And measured motion like a living thing
strode after me.

তারপর ?

After I had seen
That spectacle; for many days, my brains
Worked with a dim and undetermined sense
Of unknown modes of being; o'er my thoughts
There hung a darkness, call it solitude
Or blank desertion.

ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতায় প্রকৃতি অনুভবের এবং ধ্যানের বস্তু, শেলির প্রকৃতি বস্তু ততটা নয়, যতটা ভাব।



মহাজাগতিক পটভূমিকায় স্থাপিত শেলির লিরিক নাটক "Prometheus Unbound" ইসকিলাস-এর নাটকের মতো সেই একই প্রাচীন গ্রীক, কিংবা বলা উচিত ইউরোপীয় উপকথা অবলম্বনে রচিত, কিন্তু এর ভাববস্তু এবং উপসংহার শেলির নিজস্ব। এখানে প্রমিথিউস অপরাজেয়। দুঃখ বেদনা, পাপ, এমনকি মৃত্যুদণ্ড মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের পথ চিরতরে রুদ্ধ করতে পারে না, কিন্তু তাকে ধর্মবিশ্বাস, দেবদেবীর অলীক কল্পনা ত্যাগ করতে হবে। অতিশয় অন্তর্ভেদী, অতি শক্তিশালী এই অবিস্মরণীয় কাব্য-নাট্য মানুষের দুর্দশার চিত্র। সে তুলনায় মানুষের উত্তরণের, তার রচিত স্বর্গলোকের যে চিত্র নাটকের পরিসমাপ্তিতে কবি এঁকেছেন, তা কতকটা কাব্যালোকের বস্তু হয়েই থেকে গেছে। আসলে শেলির একটা ক্ষমতা ছিল উচ্চভাবের, উচ্চ আদর্শের শব্দলোক রচনা করে নিজেকে সম্মোহিত করার। পাঠক যদি তাতে সম্মোহিত না হয় তাকে দোষ দেওয়া বৃথা। "Great", "Good", "Joyous", Beautiful", "Free" ইত্যাদি শব্দ জীবন্ত হয়ে ওঠে তখনই যখন কবির আবেগতপ্ত কল্পনা তাদেরকে অভিজ্ঞতার বস্তুতে পরিণত করে।

১৮২১-এর এপ্রিল মাসে শেলি খবর পেলেন যে কীট্স-এর মৃত্যু হয়েছে। রোগাক্রান্ত কীটস্-এর মৃত্যু যে তাঁর কাব্যের নিষ্ঠুর সমালোচকেরাই ত্বরান্বিত করেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। শেলি তাঁকে তেমন চিনতেন না। কিন্তু তাঁর "Hyperion" কাব্য পড়ে শেলি বুঝতে পেরেছিলেন তিনি একজন সত্যিকারের বড়ো কবি। শেলি তাঁকে মর্যাদা দিতে চাইলেন। রাজকীয় স্পেনসরীয় অনুচ্ছেদ মালায় এবং প্রাচীন ঐতিহ্যশালী রীতিতে তাঁর স্মৃতিতে কবিতা রচনা করে, "Adonais" নামক এলেজি-তে শেলি যে উচ্চ প্রশংসায় কীট্সকে ভূষিত করেছেন এ জাতীয় আর কোন ইংরেজি কবিতায় আর কোনও কবির ভাগ্যে তা জুটেছে কিনা সন্দেহ।

১৮২২ সালে ভূমধ্যসাগরের জলে ডুবে শেলির মৃত্যুর পর হ্যাজলিট তার কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন, শেলির মৃতদেহ যখন আবিষ্কৃত হল, দেখা গেল একহাতে তিনি একখণ্ড কীট্স-এর কাব্য বুকের ওপর চেপে ধরে আছেন।

শেলির সর্বপ্রধান গদ্যরচনা *A Defence of Poetry*. এই প্রবন্ধে প্রবল আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর নিজের মতের সমর্থনে প্রায় অকাট্য যুক্তি বিন্যাস। এত জোরালো ভাবে তিনি নিজের মত ব্যক্ত করেছেন, এমন গভীর তাঁর আত্মপ্রত্যয় যে প্রতিবাদের শব্দ স্তব্ধ হয়ে যায়। "The great instrument of moral good is the imagination; and poetry administers to the effect by acting upon the cause." এরকম আরও অনেক স্মরণীয় উক্তিতে ঠাসা এই প্রবন্ধটি। একজন লিরিক কবি যুক্তিজাল রচনায় কতটা সিদ্ধহস্ত হতে পারেন, এই প্রবন্ধে তার পরিচয় পেয়ে অবাক হতে হয়।

শেলির আরেকটি বিস্ময়কর সৃষ্টি *The Cenci*. এই নাটকটির বিষয়বস্তুর মধ্যে সস্তা রোমাঞ্চকর চমক সৃষ্টির অনেক অবকাশ ছিল, কিন্তু সত্যিকারের 'ট্রাজেডি'-র গাম্ভীর্য, উচ্চতর সুর একে গৌরবান্বিত করেছে যদিও অতি কঠোর, অতি তিক্ত সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছে একে।

শেলির প্রতি তার সময়কার সাধারণ পাঠকের নেকনজর তো পড়েই নি, পণ্ডিত সমালোচকেরাও প্রায় দলবদ্ধ ভাবে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তার কারণ বোঝা খুব সহজ। যিনি ছাত্র অবস্থাতেই নিরীশ্বরবাদের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করবেন, তারপর একের পর এক রচনা সমস্ত সামাজিক আচারবিধিকেই এমনকি বিবাহবিধি পর্যন্ত অগ্রাহ্য করা শুধু নয়, একেবারে নির্মূল করতে চাইবেন, শেষ পর্যন্ত ধর্ম এবং ঈশ্বরকেও উৎখাত করবার ব্রত গ্রহণ করবেন; তাঁকে যে সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সমাজ আদর করে বুকে টেনে নেবে না, তা সহজেই বোঝা যায়। সমাজে যার শাসন, প্রতিষ্ঠানে যার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাকে মানব না, কেননা, কর্তৃত্ব স্বীকার করা মানেই নিজের মনুষ্যত্বের অবমাননা, নিজের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে অস্বীকার করা। অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেহেতু অ্যারিসটটল অবশ্যপাঠ্য, অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেললেন, "পড়ব না"। যদিচ ওই বিষয়টিতে তার নিজের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল।

জেমস্ বারকাস সম্পাদিত *Shelley : The Critical Heritage* বইটি শেলির বিরূপ সমালোচনায় তাঁর ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণে পরিপূর্ণ। পরবর্তী কালে সে আক্রমণ তত তীব্র না হলেও, তাঁর বিরূপ সমালোচনা এই সেদিন পর্যন্ত চলেছে। এখনও যে তা সম্পূর্ণ থেমেছে, শেলি যে একজন শ্রেষ্ঠ কবির আসন পাকাপাকিভাবে আদায় করতে পেরেছেন, তা নয়, তবে কোনও কোনও মহল থেকে শেলির সপক্ষে বলবার মতো সমালোচকও উঠে আসছেন।

মনে রাখতে হবে, শেলি নিজেও যাকে অপছন্দ করেছেন তাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন, তবে সেটা ব্যক্তিগত

কারণে কখনই নয়, দেশের, জাতির, মানবতার প্রয়োজনে। অন্তত তাঁর নিজের বিবেচনায় যখন সেরকম প্রয়োজন বুঝেছেন।

আমরা "Golden Treasury" পড়ে যে শেলিকে চিনেছিলাম, কোমল, কান্ত, পদাবলীর রচয়িতা, তা ছাড়া আরেকজন শেলির পূর্ণ পরিচয় পেতে গেলে তাঁর কিছু কিছু অপ্রধান রচনাও পড়তে হবে। যেমন *England 1919, The Mosque of Anarchy, Song to the Men of England, A new National Anthem* ইত্যাদি

Men of England, wherefore plough
For this lords who lay ye low?
Wherefore weave with toil and care
The rich robes your tyrants wear?
(Song to the men of England)

তাঁরও একটা তলোয়ার ছিল। তবে এখনও যে শেলি আমাদের সবচেয়ে বেশি টানেন চিরকালই মানুষকে টানবেন, তিনি সমসাময়িক ইংলন্ডের ঘটনার ঘূর্ণাবর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে শেলি একজন কিনা এ প্রশ্নের উত্তর যার যেমন রুচি অনুযায়ী দেবেন, কেননা আধুনিক সমালোচকেরা কেউ কেউ যতই বলুন, এমন কোনও সমালোচনা-বিজ্ঞানের আবিষ্কার সম্ভব নয় যার দ্বারা পাঠক-নিরপেক্ষ কোনও কাব্য বিচারে আমরা পৌঁছতে পারব। বরং এই পর্যন্তই বলতে পারি কারও না কারও শেলির প্রয়োজন, কারও না কারও কাছে শেলির আবেদন চিরকালই থাকবে।

*পার্সি বিশ্ শেলির জন্ম ১৭৯২ সালের ৪ঠা অগস্ট। আমরা তাই শেলির জন্মের দ্বিশতবর্ষ-পূর্তি স্মরণ করে এই বিশেষ নিবন্ধটি প্রকাশ করলাম পত্রিকার অগস্ট সংখ্যায়।*

সনাতন মিত্র নামের আড়ালে এই প্রবন্ধের লেখক ইংরেজি সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক। বর্তমানে ইনি অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

# মুখের খোঁজে

অসীম রেজ

মুখ খোঁজা আমার একটা নেশা। যেদিন থেকে মুখ খুঁজতে বার হয়েছি সেদিন থেকে যেন নিজেকে একটু চিনতে শিখেছি। অন্য সবার মতো আমিও কোনও মুখ দেখে মুগ্ধ হয়েছি, কোনও মুখ দেখে বিমর্ষ বোধ করি, অথবা কোনও মুখ দেখে ভয়ে শিউরে উঠেছি; কখনও হাজার মুখে একই মুখের ছায়া কখনও বা একই মুখে হাজার মুখের আদল ঘুরে ফিরে আসে। কোনও মুখ খুব সহজেই ভুলে যাই; কোনও মুখ চিরকালের মতো মনের মধ্যে গেঁথে যায়। মুখোশ নয়, মুখই খুঁজেছি আমি বারবার।

একদা শৈশবে হারিয়ে যাওয়া কয়েকটি মুখ এখনও মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারে। রোজ ভোরে আমার ঠাকুরদা ছাদের উপর হাঁটু গেড়ে বসে কাগজ পড়তেন, তাঁর সেই মুহূর্তের মুখটা ফিকে হলুদের মতো রোদে মিশে একটা ধাতব ভাস্কর্যের মতো মনে হত; খাঁড়া নাকের ডগায় বসানো চশমা আটা লম্বাটে মুখটা ছাদ ছাড়িয়ে উঠে যেত বহুদূর। শুনেছি নর্ডিক মুখের সঙ্গে আমাদের মুখের নাকি ভয়ানক মিল। আমার বাবার দাঁড়িয়ে থাকা, শোয়া, বসা, নানান অভিব্যক্তির মুখ এখন ফটোফ্রেমে বাঁধা। তাঁর গম্ভীর, শান্ত, ধীর-স্থির ঐ মুখচিত্র আমায় একদা মুগ্ধ করত। তাঁর চরিত্রের সঙ্গে তাঁর মুখের এক আশ্চর্য মিল খুঁজে পেতাম। মায়ের মুখ স্পষ্টত মনে পড়ে না। তাঁর মুখের উপর পর্দার মতো কী যেন একটা সবসময় আড়াল করত। বড়দা ছিল একগুঁয়ে ও জেদী। অন্ধকারে জানলার ধারে স্বল্প আলোয় গলা বাড়ানো তাঁর বিধ্বস্ত মুখের বিকৃতিটা মনে পড়ে। একমাত্র বোনটা ছিল বড়ো একা ও নিঃসঙ্গ। সাদাপাতার মতো তার রক্তশূন্য মুখটা কাকে যেন সবসময় খুঁজে বেড়াত। আর যেদিন থেকে নিজের মুখ চিনতে শিখেছি সেদিন থেকে ক্রমশ একটু একটু করে অন্য সবার মুখ ভুলতে শিখেছি। কখনও দেখেছি অল্প সময়ের ব্যবধানে কী ভীষণ পালটে গেছে অনেকের মুখ। বহু পরিচিত কাউকে দেখে চিনেও চিনতে পারি না। মনে হয় কোথায় যেন একবার দেখেছিলাম বহুদিন আগে। স্মৃতির ভিতর আমি মুখ হাতড়ে বেড়াই। কখনও বা মুখের বদলে উঠে আসে মুখের কংকাল।

আমার কয়েকজন নিকট বন্ধু ছিল যাদের মুখ এখন আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। শুধু তাদের আবছা মুখগুলো কারবন কপির মতো ভেসে ওঠে। কখনও তাদের কিছু কথা, টুকরো টুকরো ঘটনা বা অভিব্যক্তি মনের ভিতর খেলে বেড়ায়। নানান আকৃতির, নানা রঙের এইসব মুখগুলো একে একে সাজাই—চৌকো, গোল ত্রিভুজ অথবা ডিম্বাকৃতি। কখনও নীল, কখনও লাল, হলুদ অথবা সবুজ — পাখির মতো ডানা মেলে অথবা একটা সুতোর মাথায় বাঁধা বেলুনের মতো আকাশে উড়তে থাকে। আমি অবাক বিস্ময়ে এসব মুখ দেখি আর ভাবি কখন, কোথায়, কেমন করে দেখা। কিছুতেই স্পষ্ট মনে করতে পারি না। না পারায় কষ্ট বোধ হয়। স্মৃতির ভিতর অজস্র মুখ সারবদ্ধ সাজানো থাকে — সদর দরজার গ্রীল চেপে দাঁড়িয়ে থাকা একটা নিঃসঙ্গ মুখ, আয়নার সামনে আত্মমগ্ন মুখের প্রতিবিম্ব। শেষ বিকেলের আলোয় নীলাভ মুখে প্রশান্তির ছায়া। এর মধ্যে কোন মুখ ভালোবেসেছি আমি? হঠাৎই দেখা আবার হঠাৎই মিলিয়ে যাওয়া।

কাগজের মুখ কেটে কেটে ছবি তৈরি করা ছিল আমার ছেলেবেলার একটা নেশা। নানান দেশের নানান মানুষ-মুখ একত্রে জোড়া দিয়ে একটা মুখ তৈরি করতে চাইতাম। ঐসব মুখের প্রতিটি রেখা ও রঙ মিলিয়ে মিলিয়ে একটা শিল্পিত রূপ খুঁজে বেড়াতাম। যেন জন্মান্তর ধরে ঐ সব মুখের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। এরই ভিতর যেন ক্রমশ নিজেকে উন্মোচিত করতাম ও আশ্চর্য আলো ফুটে উঠতে দেখতাম একটু একটু। একটা মুখের ভিতর কী রহস্য আছে? চোখ নাক, ঠোঁট, মুখ আমি তন্নতন্ন করে দেখি। ছোটো বড়ো, সরু মোটা, তীক্ষ্ণ, সর্পিল মুখের রেখাগুলো গতিময় হয়ে এঁকে বেঁকে যেন একটা জ্যামিতিক ফ্রেমে আটকা পড়ে গেছে। মুখ

ছাড়িয়ে চোখ, চোখ ছাড়িয়ে ঠোঁট, ঠোঁট ছাড়িয়ে চিবুক, চিবুকের নীচে বিন্দু বিন্দু ঘাম যেন আমার সমস্ত আবেগ এখানে এসে জমা থাকত। কখনও উষ্ণ, কখনও শীতল, কখনও পেলব, কখনও কর্কশ, ঐ মুখ আমায় অন্ধকার থেকে আলোয়, আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যেত। আশৈশব আমি অনেকগুলো মুখের সঙ্গে বড়ো হয়েছি। আমার বাবা মা ভাই বোন, স্ত্রী পুত্রকন্যা, বন্ধুবান্ধবের মুখগুলোর ভিতর কোনও বিশেষ পার্থক্য দেখি না। যেন সবই একই ছাঁচে গড়া অথবা একই মুখের রূপান্তর।

তবে যৌবনে নদীর ধারে পদ্ম পাতায় কোনও মুখের প্রতিচ্ছবি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আয়নার মতো জলে ভেসে উঠেছে কোন স্বচ্ছ মুখের প্রতিবিম্ব? আজকাল মুখের কথা এলেই তোমার কথা বিশেষ করে মনে পড়ে, তোমার সেই বয়ঃসন্ধির কথা। বাড়ির ছাদ আলো করে তোমার মুখ উঁকি-ঝুঁকি মারে: জানলার ধারে, উঠোনে, বাগানে, গলির মুখে তোমার মুখ অস্থির ও চঞ্চল। আমি তোমায় খুঁজতে বার হই। পরিচিত রাস্তা, বিশাল অট্টালিকা, যানবাহন, দোকান বাজার, রেস্তোরাঁ, হোর্ডিং ও সিনেমার পোস্টারে। পোস্টারে পোস্টারে দেওয়াল জুড়ে ছেয়ে গেছে তোমার মুখ। মনে মনে তোমার মুখের তুলনা করি পাখির সঙ্গে, ফুলের সঙ্গে, ঝরনা, আকাশ ও নক্ষত্রের সঙ্গে। হায় কবি। সেই সব স্বপ্নের বয়স গেছে চলে। তোমার ম্লান মুখচ্ছবি এখন সাদাকালোয় ফটোয় বাঁধা। আমার ডাইরির শেষ পাতায় তারই কথা। বড়ো রাস্তা ছাড়িয়ে শহরের নোংরা গলির ভিতর থেকে তুমি বার হও — ধ্বস্ত, ক্লান্ত অবসন্ন। আমি চিনেও চিনতে পারি না। তোমার মুখ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সমস্ত মুখ থেকে।

আমি প্রত্যেকের মুখকে এখন আলাদা আলাদা ভাবে চিনতে চেষ্টা করি। প্রত্যেকের মুখের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। কোনও মুখ মিশকালো, মসৃণ, চকচকে পাথরের মতো; কোনও মুখ শুকনো, নীরস, কর্কশ কাঠের মতো; কোনও মুখ নরম, তুলতুলে, কাদার মতো; কোনও মুখ স্ফটিকের মতো উজ্জ্বল, আলো পড়লে নানান রঙ বিচ্ছুরিত হয়। কখনও মুখ দেখে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি, কখনও বা বিষণ্ণতায় ডুবে যাই। কোনও মুখ অন্তর্ভেদী, ভিতরে ভিতরে রক্তক্ষরণ ঘটায়। কোনও মুখে মৃত্যুর ছায়া দেখে আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করি। আজন্ম আমি অনেক মুখের কথা শুনেছি। ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে অজস্র মুখের কাহিনী। যাদুঘরে সাজানো অসংখ্য মুখের ভিতর অসমাপ্ত অতীত। শিল্পীর তুলিতে আঁকা মুখ। কাব্যে মুখরিত মুখের স্তুতি। কিংবদন্তি, রূপকথায়, লোকগাথায় রঙবেরঙের মুখের ইতিবৃত্ত আর এরই ভিতর আমি মুখ খুঁজি — মনের মতো একটা মুখ।

মাটির মুখ, বালির মুখ, নুড়ি ও পাথরের মুখ, নানান ধাতুর মুখ — জলে ধুয়ে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া, শ্যাওলাধরা, জংলা, ভাঙা, টুকরো টুকরো অসংখ্য মুখের স্তূপ জমতে থাকে। আমি এক-একটা মুখ যেন খুঁড়ে খুঁড়ে বার করি — এরা কারা? এদের বয়স কত? এদের যৌবন কী অতিক্রান্ত? কোন ভুবনে এদের ঘোরাফেরা? কোন বইয়ের পাতায় এদের কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে? মূক, নীরব এইসব মুখগুলো অর্থহীনভাবে আমার দিকে চেয়ে থাকে। মুখগুলো যেন এক একটা ছাঁচের মতো, একটার পর একটা উঠে আসে হাতের উপর। তারপর যত্ন করে মাটি লাগানো, রঙ লাগানো, নিখুঁত ভাবে মুখের প্রতিটি অংশ গড়ে তোলা। দুর্গা প্রতিমা তৈরির সময় যেমন হয়। কৈশোরে আমি একবার এমন একটা মুখ চুরি করে আনতে গিয়ে রাস্তার মাঝপথে ভেঙে ফেলেছিলাম। ভেঙে ফেলার দুঃখটা আজও ভুলতে পারি নি। এখন আমার ঘরে অজস্র মুখ, মুখের মেলা। দেওয়াল জুড়ে মুখের ছবি, নানান অভিব্যক্তি, জীবন্ত মুখেরা সর্বদা ঘোরাফেরা করে। এখন আর মুখ খুঁজতে বার হই না। অথচ একটা বয়স ছিল যখন হন্যে হয়ে মুখ খুঁজে বেড়িয়েছি জন-অরণ্যের মধ্যে।

আমি মুখের ভিতর যৌবন দেখি। মুখেরা দোল খায় ফুলের মতো, মৌমাছির মতো গুনগুন করে, কমলা রঙের আলোর মতো আকাশ জুড়ে আমায় স্বপ্ন দেখায়। তখনই আমার তোমার কথা মনে পড়ে। ঝুল বারান্দায়, জানলার ফাঁকে, বাস স্ট্যাণ্ডের নীচে, পার্কের কোণে, ট্র্যাফিকের সবুজ আলোয় দেখা এক ঝলক তোমার মুখ বারবার ভাববার চেষ্টা করি। স্পষ্ট মনে পড়ে না কিছুই। হাজার মুখের ভিড়ে তা হারিয়ে যায়। বাড়ি ফিরে ভাবি কি যেন হারিয়ে এলাম প্রকাশ্য রাস্তায়।

আমি খুব শৈশবে আমার এক খেলার সঙ্গীকে হারিয়েছি। তার স্মৃতি এখন আর মনে পড়ে না। আমার জীবনে এমন কোন নারী নেই যে আমার সবকিছু জেনেছে। আমি যে মেয়েটিকে নিজের বলে নিয়ে এলাম, তার মুখে আমার মুখেরই প্রতিবিম্ব। সে বড় দুঃখী, একা ও নিঃসঙ্গ। তার কাহিনী লিখতে লিখতে একটা গ্রন্থের আকারে আমার আত্মজীবনীর কিয়দংশ বিধৃত হল। বারবার যা লিখলাম,



পড়লাম, কাটলাম তা গুটিকয়েক শব্দের নিরর্থক অহংকার ছাড়া আর কিছুই নয়। জানলার ধারে বসে যখন লিখি, দেখি ত্রিকোণ পার্কের পাশ দিয়ে রাস্তা দুভাগ হয়ে চলে গেছে তোমার বাড়ির দিকে। রোজই ভাবি যাব যাব, আজও হয় নি যাওয়া।

মুখের মিছিল চলেছে রাস্তার দু-ধারে — নানা বয়সের, নানা পোশাকের অজস্র পুরুষ ও নারী চলছে একে একে দৃশ্যের মতো। ভিড়ের ভেতর মুখগুলো ভেঙেচুরে, দুমড়ে মুচড়ে বিচিত্র জ্যামিতিক আকার নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে। কখনও এদের হাসি-হল্লোড় কখনও ভয়ানক চিৎকার, আর্তনাদ শুনেছি ও কখনও এদের চোখেমুখে ভয় ও বিষাদ, যন্ত্রণা ও বিভ্রান্তির ছাপ দেখেছি। আমি বিশাল স্কাইস্ক্র্যাপার থেকে ভেঙে পড়া, হিম চাতালের নীচে কাঁটাতারের ভিতর ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত মুখ দেখেছি, কখনও বা চোখের সামনে আমি মুখ জ্বলতে দেখেছি। এমন দুঃস্বপ্নের মুখ আমাকে ঘিরেছে বহুবার।

আমি এক বিশাল গোলাকৃতি মুখ দেখেছি যার চোখ দুটো নেই, দাঁতগুলো উঁচু হয়ে চোয়ালের উপর চেপে বসে রয়েছে। আবার একটা মুখে গর্তের মতো বিস্ফারিত বড়ো বড়ো চোখে হিংসীতল নিষ্ঠুরতা দেখেছি। কোন চৌকো মুখের উপর ক্ষুদে খোলাটে চোখ, ভুরুহীন চ্যাপটা মুখে লম্বা লম্বা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গাল ঝুলে গেছে, কিংবা লম্বাটে, তোবড়ানো শুকনো, পাংশুটে মুখে লম্বা লম্বা খড়ির দাগ দেখেছি। অসংখ্য লোকের মুখে এমন বিকৃতি দেখে ভয় পাই। এই ভয় কাটাবার জন্য প্রায়শই চোখ বন্ধ রাখি।

চোখ খুলি যখন নিজেকে আয়নার সামনে দেখার ইচ্ছা হয়। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি, কত পালটে যাচ্ছি ক্রমশ। শৈশবের মুখ মনে পড়ে না। কৈশোরের মুখ আবছা, অস্পষ্ট। যৌবনের মুখ রোদে পোড়া, জলে ভেজা, ভিজে স্যাঁতসেঁতে, সংগ্রাম ও হতাশার ছাপ। এখন স্থবির মুখ বয়সের ভারে নুব্জমান। হক বাঁধা, নিরুপদ্রব, যান্ত্রিক, একঘেঁয়ে জীবনে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া দেখি। মুখের উপর তারই গুটি গুটি ছাপ।

এখন আমার সংগ্রহে রয়েছে অসংখ্য মুখের ছবি — কাউকে চিনি, কাউকে চিনি না। ফটোর অ্যালবাম খুলে দেখি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এরা কারা। কেউ বেঁচে, কেউ মরে গেছে, আশ্চর্য রকম পালটে গেছে অনেকের মুখ, চেনাই যায় না। এক একটা খোলসের ভিতর থেকে যেন মুখগুলো বার হয়ে আসে, তাদের বিচিত্র চরিত্র, খণ্ড খণ্ড কাহিনীর সূত্র খুলে যায়। আবার কখনও কোন কোন মুখ আপনিই গুটিয়ে গিয়ে খোলসের ভিতর ঢুকে যায়।

বীজের ভিতর থেকে অঙ্কুরোদগমের মতো আমি বহু মুখ জন্মাতে দেখেছি। বৃক্ষশাখার মতো প্রসারিত হতে দেখেছি; তাতে ফল হতে, ফুল হতে দেখেছি; দেখেছি পরিপূর্ণতার ছবি; কখনও বা তা ডানা মেলে উড়তে চেয়েছে। তোর বেলা নদীর ধারে জলের উপর মুখ ভাসতে দেখেছি। মনে হয় যেন কত চেনা, এ তো তোমারই মুখ। তোমার মুখ আমি সূর্যোদয়ের মতো উঠতে দেখেছি। মধ্যাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো দীপামান হতে দেখেছি। আবার দিনাবসানে সূর্যাস্তের মতো তোমার মুখ অন্ধকারে বিলীন হতে দেখেছি। আমি তোমার মুখে সৃষ্টি ও ধ্বংসের লীলা দেখেছি। লক্ষ লক্ষ মাইল দূর থেকে আমি যেন ঐ মুখের সংকেত শুনতে পাই। মাতৃমুখমণ্ডলের ভিতর আমি তোমার মুখের পুনর্জন্ম দেখেছি। জন্মজন্মান্তর যেন তোমার সঙ্গে আমার বন্ধন। তুমি যখন ঘুমাও, তখন খোলা জানলা দিয়ে কদমফা আলো এসে পড়ে তোমার গালে। তোমার সাবলীল মুখের রেখা যেন লতানো গাছে নীল হলুদের ছায়া; মেঝেতে রঙবেরঙের ফরাশ পাতা, দেওয়াল জুড়ে নকশা-কাটা কাগজের ফুল, প্রজাপতি, ঘাস ফড়িং আর মৌমাছির গুনগুন শব্দ সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য ছন্দ তৈরি হয়। আমি তোমার মুখ দেখে মুগ্ধ হই। মনে হয় তোমার ওষ্ঠ জুড়ে চুম্বন করি বারবার। সমস্ত আবেগ দিয়ে আমি তোমার ঐ মুখমণ্ডল ছুঁয়ে দেখি যেন জল স্পর্শ করি, বাতাস স্পর্শ করি, মাটি স্পর্শ করি। সেই আশ্চর্য অনুভূতি অজস্র রঙিন ডানা মেলে চোখের সামনে উড়তে থাকে। আমি তোমার ছবি খুলি আর দেখি, ডাইরির অসংখ্য পাতা জুড়ে লিখি তারই ইতিবৃত্ত যেন আমার ভালোবাসার অলিখিত কাহিনী। তোমার সঙ্গে কীসের সম্পর্ক আমার? কন্যা, জায়া, জননী অথবা অন্য কোনও নারী। আমি স্ত্রীর মুখে কন্যার, কন্যার মুখে জননীর; নারীর মুখে পুরুষের, পুরুষের মুখে নারীর মুখ দেখি। আমি অন্ধকারের ভিতর আলোর, আলোর ভিতর অন্ধকার দেখি। এই মুহূর্তে এত অন্ধকার কোত্থেকে এল? মাতৃজঠরে কোন অন্ধকার এত জমাট ছিল। এক বৃত্তাকার ঘরে কুলঙ্গিতে রাখা প্রদীপের কাছাকাছি একটা মুখের ছায়া দেখি। বোরখা-আটা এ রমণীর মুখ কোথায় যেন একবার দেখা। সে প্রদীপটা হাতে নিয়ে আমায় পথ দেখাতে লাগল। আমি তার পিছু পিছু হাঁটতে থাকি —

বারান্দা ছাড়িয়ে ঘর, ঘরের পর ঘর, ঘর ছাড়িয়ে সিঁড়ি। সিঁড়ির পর সিঁড়ি, অসংখ্য সাপের মতো এঁকে বেঁকে নেমে গেছে এক অনন্ত গহ্বরে।

এ আমি কোথায় এলাম, মুখটা একবার দপ্ করে জ্বলে আবার নিভে গেল। মুখে তার অল্প হাসির ঝিলিক দেখা গেল। তাকে শেষ আশ্রয় ভেবে ধরতে গিয়ে দেখি সব ফাঁকা। এক জলাভূমি অসংখ্য মাথার খুলিতে ঢাকা। কেউ কোথাও নেই, হু হু করে শুধু হাওয়া বইছে জোরে।

যেখানে যাত্রা শুরু সেখানেই শেষ। আমার আদি ও অন্তে বিশাল ভূলোক জুড়ে মুখেদের জন্ম ও মৃত্যু। কোন মুখের কাহিনী শোনাব তোমাদের। কোনও কিছুই আর ঘটে না আমার জীবনে যা বিস্ময়ের অপরের কাছে। যে মুখকে একদিন ঝক্‌ঝকে আয়নার মতো মনে হয়েছিল এখন তা ক্রমশ ঝাপ্‌সা ও অস্পষ্ট হয়ে আসে। মুখগুলো চিনেও চিনি না, অপরিচিত লাগে। পৃথিবীটা সংকীর্ণ হয়ে এসেছে ক্রমশ, এক অদৃশ্য দেওয়াল উঠেছে আমার চারপাশে।

হে ঈশ্বর। কোন মিথ্যে মুখের প্রলোভন দেখিয়ে তুমি আনলে আমায় এখানে। এখনও কোনও মুখ বৃক্ষশাখার মতো জন্মাতে দেখি নি, জাগতে দেখি নি শীতল হাওয়ায়, জলের উপর প্রস্ফুটিত হয় নি ফুলের মতো। যেন আমি অন্ধ, কোনকিছুই দেখি না কখনও। তুমি আমার চোখ উন্মোচিত কর, সমস্ত রেখবন্ধনী থেকে মুক্ত করে আনো তার মুখের প্রতিবিম্ব, রঙের প্রলেপ দাও তাতে, সংগীতের মতো তা বেজে উঠুক বারবার।

দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখি, মৌন মুখের মিছিল চলে। দিনের শেষে যখন একটা মনের মতো মুখ নিয়ে ঘরে ফিরি দেখি সারা ঘর অন্ধকার। শুধু একটা প্রদীপ জ্বলছে জানলার ধারে। চারা গাছের মতো টবে লাগাব ভেবে মুখটা রাখি টেবিলের উপর। টেবিলে পছন্দ না হলে কখনও তা রাখি জানলার ধারে, কখনও তাকের উপর, কখনও ঘরের কোণে, দরজার ফাঁকে, এ ঘর থেকে ও ঘরে, ঘর ছেড়ে বারান্দায়, উঠোনে অথবা বাগানে। কখনও আলোয় কখনও অন্ধকারে, কখনও হাওয়ায়, কখনও জলের কাছাকাছি নিয়ে যাই। কখনও তা উজ্জ্বল কখনও নিষ্প্রভ, কখনও নীরব, কখনও কোলাহলমুখর, কখনও বা স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল দেখায়। দিনে দিনে মুখটার সঙ্গে একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে একেই কি বলে ভালোবাসা? আমি এই মুখটাকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ও নিজের চারপাশের সবকিছুকে ভালোবাসতে শিখি।

আর এরই ভিতর একদিন অঘটন ঘটে। অতি যত্নে মুখটাকে উঁচু তাকের উপর রাখতে গিয়ে আচমকা তা হাত থেকে খসে পড়ে। মুহূর্তে তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়। এতদিন যে স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল, যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হল। ঐ ভাঙার দুঃখটা যেন আজও ভুলতে পারি না। প্রতিদিন ঘরে ফিরি আর ভাবি কী যেন হারিয়েছি আমি বহুযুগ আগে। সেই মুখ খুঁজি ফিরি। একটার পর একটা দরজা খুলে একা হেঁটে যাই। সে নয়, যেন নিজেরই মুখের ছায়া নিজেকে পথ দেখায়।

### লেখকদের প্রতি

১. নকল রেখে পাণ্ডুলিপি দপ্তরে পাঠান। জেরক্স কপি গৃহীত হবে না। পত্রিকা-দপ্তরের পক্ষে অমনোনীত-রচনা ফেরত-দেওয়া সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখবেন। রচনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত জানতে হলে ঠিকানা দিয়ে পোস্টকার্ড পাঠাতে হবে।

২. সম্পাদনার জন্যে বাঁ-দিকে যথেষ্ট মারজিন রাখুন।

৩. হাতের-লেখার স্পষ্টতা কাম্য। 'ম'-'স', 'ভ'-'ভ', 'ব'-'ষ', 'শ', 'ক্ষ', 'ন'-'ণ' ইত্যাদি বর্ণগুলি স্পষ্ট করে লিখুন — যাতে এক বর্ণকে অন্য বর্ণ মনে করার মতো ভুল এড়ানো যায়।

৪. বিদেশী শব্দ থাকলে মারজিনে ইংরেজি বর্ণে শব্দটি লিখে দেবেন।

৫. বানানবিধির ক্ষেত্রে 'সংসদ' বা 'চলন্তিকা'-র অধুনা প্রচলিত রীতি অনুসরণ করাই শ্রেয়।

# বিদ্যাসাগরের বাড়ি

**অমিয়কুমার সামন্ত**

আজ আর এ-সম্পর্কে কোনও দ্বিমত নেই যে ৩৬নং বিদ্যাসাগর স্ট্রিটের[১] দোতলা বাড়িটি বিদ্যাসাগরের কলকাতার বাড়ি। ১৮৭৫-৭৬ সালে তিনি এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং ১৮৭৭ সাল থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই বাড়িতেই বসবাস করেছিলেন। বাড়িটি হস্তান্তরিত হয়ে বর্তমানে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। গত বিশ বৎসর ধরে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা এই বাড়িটি অধিগ্রহণের জন্য সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন করে আসছেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত আইনগত জটিলতার জন্য এটি অধিগৃহীত হয় নি। এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরে প্রকাশ করা হয়েছে।

কিন্তু বর্তমানে বিদ্যাসাগরের জন্মগ্রাম বীরসিংহে তাঁর ''বসতবাটি'' বলে উল্লিখিত কোনও বাড়ি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের চেষ্টা করা হচ্ছে এইরূপ সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটি সম্পর্কে সরকারের তরফে মন্ত্রীমহোদয়ের বিদ্যাসাগরের গ্রামের বাড়ি অধিগ্রহণে কোনও আপত্তি নেই বলেও জানানো হয়েছে। বীরসিংহ বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি— তাঁর পিতা ও পিতামহ এই গ্রামেই বসবাস করেছিলেন। সুতরাং এই গ্রামে বিদ্যাসাগরের বাড়ির অস্তিত্ব থাকা স্বাভাবিক এবং মহাপুরুষের স্মরণচিহ্ন হিসাবে সেই বাড়ি অধিগৃহীত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বীরসিংহ গ্রামে সত্যিই কি কোনও বাড়ি আছে যাতে বিদ্যাসাগর বাস করেছিলেন বা যা তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন? এই বিষয়ে বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য কিছু তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে হয়।

বীরসিংহে বসবাস শুরু করেন বিদ্যাসাগরের ঠাকুরদাদা রামজয় তর্কভূষণ। হুগলি জেলার বনমালীপুর ছিল রামজয়ের পূর্বপুরুষের গ্রাম। সংসারে উদাসীন রামজয় প্রায়ই তীর্থভ্রমণে যেতেন। একবার এইরূপ দীর্ঘস্থায়ী তীর্থভ্রমণকালে স্ত্রী দুর্গাদেবী পারিবারিক কলহে অতিষ্ট হয়ে দুইপুত্র এবং চার কন্যা-সহ বীরসিংহে পিতা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের বাড়িতে আশ্রয় নেন। কিন্তু তর্কসিদ্ধান্তের পুত্রদের নিকট দুর্গাদেবী ছিলেন আপদ বিশেষ। তাই উমাপতি কন্যা-জামাতার জন্য বীরসিংহ গ্রামেই বার্ষিক ৯ টাকা ৫ আনা খাজনায় কিছু জমি বন্দোবস্ত নিয়ে একটি ছোটো মাটির দেওয়াল যুক্ত একতলা বাড়ি তৈরি করিয়ে দেন।[২] বাড়িতে ঘরের সংখ্যা তিন চারটির বেশি ছিল না। প্রায় ২০ বৎসর পরে এই বাড়িতেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন। এই ভিটে ছাড়া বীরসিংহে রামজয়ের কোনও ভূ-সম্পত্তি ছিল না। পুত্র ঠাকুরদাস কলকাতায় চাকুরি করে সংসারের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটিয়েছেন; পৈতৃক বাড়ির বিশেষ পরিবর্তন করতে পারেন নি। ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকুরি পাওয়ার পর বিদ্যাসাগর ঠাকুরদাসকে চাকুরি ছাড়িয়ে কলকাতা থেকে বীরসিংহে পাঠিয়ে দিলে এবং তাঁর ৫০ টাকা মাস মাহিনার ৩০ টাকাতে কলকাতার খরচ চালিয়ে ২০ টাকা ঠাকুরদাসকে পাঠাতেন। পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি এবং অধ্যক্ষ হিসাবে বিদ্যাসাগরের আয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সেই অনুপাতে ঠাকুরদাসকেও বেশি টাকা পাঠাতেন। ঠাকুরদাস ঐ টাকায় বসতবাড়ির সংস্কার করেন এবং কিছু কিছু ভূ-সম্পত্তিও খরিদ করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকুরি করার সময় থেকেই বিদ্যাসাগর নিয়মিত কলকাতা থেকে বীরসিংহে যেতেন এবং স্বভাবতই বসতবাটির সংস্কার ও পুনর্গঠন বিদ্যাসাগরের পরামর্শ ও পছন্দমতোই হয়েছিল।

বাড়িটি পরিবর্ধিত হয়ে মাটির দেওয়াল ও খড়ের চাল যুক্ত দোতলা বাড়িতে রূপান্তরিত হয়। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাড়িটির সম্পর্কে লিখেছেন,[৩] ''বীরসিংহ অঞ্চলে একপ্রকার মেটে দোতালা ঘর নির্মিত হইয়া থাকে। অনেকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই মৃত্তিকা নির্মিত গৃহ সকলের শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু পরিবারের স্থান সঙ্কুলান হওয়ার

উপযোগী বৃহৎ বাটীর মধ্যস্থলে একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গৃহ ছিল।'' ১৮৬৮ সালে বর্ধমানের কালেক্টর এইচ এল হ্যারিসন ইনকাম ট্যাক্স সংক্রান্ত[৪] কিছু অভিযোগের তদন্ত করার জন্য ঘাটাল-আরামবাগ অঞ্চলে দীর্ঘ সফর করেন। ভগবতী দেবীর আমন্ত্রণে বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করতে এসে তিনি বাড়িটি দেখে মুগ্ধ হন এবং বলেন, ''পাকা বাড়ি এর কাছে হার মানিয়াছে।''কিন্তু এই বাড়িটি বেশিদিন টেকে নি। ১৮৬৯ সালের মার্চ মাসের এক রাত্রিতে আগুন লেগে বাড়িটির সমস্ত আসবাবপত্র এমনকি শালগ্রাম শিলাটি সমেত ভস্মীভূত হয়। বাড়িতে তখন থাকতেন কেবল ভগবতী দেবী এবং বীরসিংহ স্কুলের দূরবর্তী গ্রাম থেকে আসা কিছু ছাত্র। এই ঘটনার আগে ১৮৬৫ সালে ঠাকুরদাস বীরসিংহ ত্যাগ করে কাশীবাসী হন। ফলে বৃহৎ সংসারটি দায়িত্ব নিয়ে পরিচালনা করার মতো কেউই ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের তিন ভাই— দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্র ও ঈশাণচন্দ্র, মাতা ভগবতী দেবী, পুত্র নারায়ণচন্দ্র এবং অন্তত দুই বোন বীরসিংহেই থাকতেন। পরিবারে তাই বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই থাকত। ১৮৬৭ সালে বিদ্যাসাগর ভগবতীদেবী এবং অন্যান্য আত্মীয়দের পরামর্শ উপেক্ষা করে পৃথগন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর আগেই দুই বোনের জন্য পৃথক বাড়ি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে ঠাকুরদাসের তত্ত্বাবধানে বীরসিংহ গ্রামে বেশ কিছু ভূসম্পত্তি খরিদ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। বীরসিংহ স্কুলের জন্যও জমি কিনেছিলেন ১৮৫৩ সালে। সুতরাং ঐ গ্রামেই ভাই, বোন ও ছেলের জন্য বাড়ি তৈরি করিয়ে দেওয়া সহজ হয়েছিল। এ সম্পর্কে শম্ভুচন্দ্র লিখছেন, ''ইতিপূর্বে ভগিনীদ্বয়ের পৃথক বাটী নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সন ১২৭৫ সালে আমার পৃথক বাটী নিৰ্ম্মাণ করা হয়। ইহার কিছুদিন পরে নারায়ণের পৃথক বাটী প্রস্তুত হয় এবং নিজের নিকট জননীদেবীর অবস্থানের ব্যবস্থা হয়।''[৫] 'পৃথক বাটী'গুলি বিদ্যাসাগরের জন্ম ভিটেতে তৈরি হয় নি— কারণ সেখানে তখন ছিল ''পাকা বাড়িকে হার মানানো দোতলা বাড়ী''। নারায়ণ ও শম্ভুচন্দ্রের বাড়ি হয়েছিল বর্তমানে বালিকা বিদ্যালয় যেখানে অবস্থিত সেই জমিতে। এই ভাবে ১৮৬৯ সালের মার্চ মাসের আগেই ভগবতী দেবী ছাড়া সকলের জন্যই পৃথক বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অগ্নিকাণ্ডে জন্মভিটাতে অবস্থিত বাড়ি ভস্মীভূত হলে কেবলমাত্র ভগবতী দেবীই গৃহহীন হলেন। বিদ্যাসাগর দ্রুত কলকাতা থেকে বীরসিংহে এসে ভগবতী দেবীকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইলে তিনি সম্মত হলেন না। ভগবতী দেবী সাময়িকভাবে শম্ভুচন্দ্রের বাড়িতে রইলেন। পরে ভগবতী দেবীর জন্যও একটি বাড়ি তৈরি হয়েছিল— প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল নারায়ণের বাড়ি।

বিদ্যাসাগরের বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনাটি ১৮৬৯ সালের ১৯ এপ্রিল সংবাদ প্রভাকরে এই ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ''সম্প্রতি খানাকুল-কৃষ্ণনগরের নিকট বীরসিংহ গ্রামে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তদীয় ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের বাড়িতে অগ্নি লাগিয়া সম্পূর্ণ ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। গৃহস্থিত দ্রব্যসমেত ন্যূন পক্ষে দশসহস্রাধিক টাকা ক্ষতি হইয়াছে। যাঁহারা বহুব্যয়ে তৃণনির্মিত গৃহ প্রস্তুত করেন তাঁহারা এই ঘটনা দেখিয়া যথা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন।'' ঘটনার পর বীরসিংহের প্রতিবেশীরা ইঁটের বাড়ি তৈরি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর পরিহাস করে বলতেন, ''গরীব বামুনের ছেলের পাকাবাড়ী দেখলে লোকে হাসবে।''[৬] এরপর জন্মভিটেতে ভগবতী দেবীর জন্য যে একতলা মাটির বাড়ি তৈরি হয়েছিল তাতে বিদ্যাসাগর কোনও দিন বাস করেন নি; কারণ এই বাড়ি তৈরি শেষ হওয়ার আগেই অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের জুন মাসে বিদ্যাসাগর চিরকালের জন্য বীরসিংহ ত্যাগ করেন। শেষবারের বীরসিংহ যাত্রায় তিনি শম্ভুচন্দ্রের বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। জন্মভিটের সুবৃহৎ মাটির বাড়ি ভস্মস্তূপে পরিণত হয়ে অনেকদিন ঐ অবস্থাতেই পড়েছিল। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর (১৮৯১, ২৭শে জুলাই) পর তাঁর জীবনী রচনার জন্য উপাদান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যখন বীরসিংহে যান তখনও সেই 'পোড়ো বাড়ী' দেখেছিলেন। সন ১২৭৭ সালের ২রা ফাল্গুন (১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই ফেবরুয়ারি ভগবতী দেবী বীরসিংহ থেকে কাশীযাত্রা করেন; সেখানেই ঐ বছরের চৈত্রসংক্রান্তির দিন তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর থেকে বিদ্যাসাগরের পৈতৃক ভিটেতে আর কেউই বসবাস করেন নি। কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের জন্মভিটে আগাছা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর প্রায় দু-বছর আগে বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণ 'বীরসিংহা জননী' এই বেনামীতে এক মিনতিভরা পত্র লিখে তাঁকে গ্রামে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।[৮] সেই চিঠিতে বিদ্যাসাগরের ভিটের এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ''যে বারান্দা বাড়ীতে তুমি আমার দরবার করে বসতে, যেখানে প্রতিদিন শত শত লোককে অন্নদান করেছ, যে বাড়ীতে তোমার পিতৃদেব জগদ্ধাত্রীপূজো উপলক্ষে মহোৎসব করে গেছেন, সেই ভিটা আজ বাবলা গাছে পরিপূর্ণ।'' (সন ১২৯৬, ১৫ই অগ্রহায়ণ)



ঐ 'বাবলা গাছে পরিপূর্ণ ভিটে'র মধ্যেই বিদ্যাসাগরের সঠিক জন্মস্থান নির্ধারণ করে দেন বিদ্যাসাগরের কনিষ্ঠা ভগিনী মন্দাকিনী দেবী ১৯৩০ সালে। সেই সময় বীরসিংহে বিদ্যাসাগরের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলেন ভগবতী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বর্গত পার্বতীচরণ চক্রবর্তী ও স্থানীয় জনসাধারণ। ফলে মন্দাকিনী দেবীর সাহায্যে আঁতুড় ঘরের স্থান নির্ধারণ করা হয় এবং ১৯৩৩ সালে মেদিনীপুরের তৎকালীন জেলাশাসক বার্জ সস্ত্রীক বীরসিংহে এসে নির্ধারিত জায়গায় একটি ফলক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৭ সালে ড. কালিদাস নাগ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস এবং জেলাশাসক বিনয়রঞ্জন সেন ও পার্বতীচরণ চক্রবর্তীকে নিয়ে Vidyasagar Memorial Committee গঠিত হয়, এবং এই কমিটির উদ্যোগেই বিদ্যাসাগরের ভিটেতে একটি স্মৃতিমন্দিরের নির্মাণ কার্য শুরু হয়। ১৯৪০ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। ১৯৫৬ সালে আবক্ষমূর্তি স্থাপিত হয়।[৯] বর্তমানে স্মৃতিমন্দিরে সরকার পরিচালিত একটি পাঠাগারও আছে। বিদ্যাসাগরের পৈতৃক ভিটে ত্রিশের দশকেই অধিগৃহীত এবং এটি বর্তমানে সর্বসাধারণের সম্পত্তি।

বীরসিংহে পৈতৃক ভদ্রাসনের বাইরে আরও কয়েকটি বাড়ি নির্মাণ করিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর কিন্তু একমাত্র শম্ভুচন্দ্রের বাড়ি ছাড়া আর কোনও বাড়িতে তিনি বাস করেন নি। ১৮৬৯ সালের মার্চ মাসে নিজের বাড়ি ভস্মীভূত হওয়ার পর তিনি বীরসিংহে গিয়ে শম্ভুচন্দ্রের বাড়িতে ছিলেন। তারপর ঐ বছরেরই জুন মাসের প্রথমদিকে একটি বিধবাবিবাহের ব্যাপারে গ্রামে গিয়ে শম্ভুচন্দ্রের বাড়িতেই ছিলেন এবং ২/১ দিন পরে বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে মতবিরোধের ফলে[১০] চিরকালের জন্য গ্রাম ত্যাগ করেন। অবশ্য জীবনের একেবারে শেষ ভাগে রোগযন্ত্রণায় জর্জরিত বিদ্যাসাগর বীরসিংহে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। মৃত্যুর প্রায় তিনমাস পূর্বে একটি চিঠিতে শম্ভুচন্দ্রকে লিখছেন, ''আমি ৭/৮ দিন পরে বীরসিংহে যাইয়া টাকা পরিশোধ করিব। আমি দেশে যাইবার পূর্বে তুমি ইঁট সংগ্রহ করিবে, বাটী যাইয়া বিদ্যালয়ের বাটী নিৰ্ম্মাণের ব্যবস্থা হইবে।''[১১] কিন্তু বিদ্যালয়ের (এটি ১৮৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত ভগবতী বিদ্যালয়) ইঁটের ''বাটী নিৰ্ম্মাণ' বা দেশে যাওয়া কোনওটিই সম্ভব হয় নি।

১৮৫৩ সালে বিদ্যাসাগর বীরসিংহে যে 'মডেল স্কুল' স্থাপন করেন তার জন্য জমি কেনেন গ্রামের রামধন চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তির কাছ থেকে। মজুরের অভাবে নিজের হাতে কোদাল ধরে জমি কেটে স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই মডেল স্কুলের সঙ্গে ছিল একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং একটি রাখাল স্কুল বা নাইট স্কুল।[১২] ১৮৬৪-৬৫ সালের বিদ্যালয় পরিদর্শকের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে বীরসিংহে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল মোট ১৮৯ জন, নৈশ-বিদ্যালয়ের ৪৭ জন এবং বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ২৫ জন। কিন্তু ১৮৬৮-৬৯ সাল থেকে বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বীরসিংহের বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমতে শুরু করে। ১৮৭৫ সালের জুলাই মাসে বীরসিংহ স্কুল, বালিকা বিদ্যালয় ও নৈশ বিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। শুধু দাতব্য চিকিৎসালয়টি চালু ছিল। ঐ বৎসরের সেপটেমবর মাসের প্রবল ঝড়ে বীরসিংহ স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয়ের বাড়ি ভূমিসাৎ হয়। দাতব্য চিকিৎসালয়টি রামধন চক্রবর্তীর নিকট খরিদ করা জমিতেই অবস্থিত ছিল। চিকিৎসালয়টি ১৮৮৫ সালে পর্যন্ত চালু ছিল। কিন্তু পরিবারের কোনও ব্যক্তি ডাক্তারের নিকট কোনও অন্যায় অনুরোধের ফলস্বরূপ সেটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন বিদ্যাসাগর। সেই ছোট ঘরটিও অল্পদিন পরে ভূমিসাৎ হয়।

বর্তমানে ভগবতী বিদ্যালয় যেখানে অবস্থিত সেই বিস্তীর্ণ জায়গাটির একটি অংশ ছিল রামধন চক্রবর্তীর নিকট কেনা জমি, এখানেই বিদ্যালয়গুলি অবস্থিত ছিল। বাড়িগুলি ভেঙে যাওয়ার পর স্থানীয় মানুষের কাছে জায়গাটি জঙ্গলে পূর্ণ ''স্কুলডাঙ্গা'' নামে পরিচিত হয়েছিল। এই জায়গাতেই ভগবতী বিদ্যালয়ের জন্য ''ইঁটের বাটী'' নির্মাণের বাসনা অপূর্ণ রয়ে গিয়েছিল। পরে অবশ্য ঐ জায়গাতেই ভগবতী বিদ্যালয়ের একতলা টিনের চালযুক্ত বাড়ি তৈরি হয় ১৯৩৭ সালে। তারও আগে ১৯২৮ সালে তৈরি হয় একটি মাটির দোতলা বাড়ি যেটি এখন ছাত্রাবাস রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৪৫ সালে আর একটি দোতলা ছাত্রাবাস এবং ১৯৫৮ সালে তিনতলা মূল বিদ্যালয় ভবন তৈরি হয় সরকারী অনুদানে। ১৯০৫-৬ সালে স্থানীয় মহকুমা-শাসকের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল বিদ্যাসাগর 'স্মৃতিস্তম্ভ'। এগুলি এখনও বর্তমান—এবং এদের কোনওটিই বিদ্যাসাগরের সময়ে বা তাঁর অর্থ সাহায্যে তৈরি হয় নি। তাছাড়া বিদ্যালটি ১৯৫৬ সাল থেকেই সরকারের 'স্পনসর্ড বিদ্যালয়'।[১৩]

বীরসিংহে বিদ্যাসাগরের অর্থসাহায্যে নির্মিত হয়েছিল ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র, দুই ভগিনী ও পুত্র নারায়ণের বাড়ি। এদের

মধ্যে শম্ভুচন্দ্রের বাড়িতে বিদ্যাসাগর অন্তত দু-বার রাত্রি যাপন করেছিলেন—তার বিবরণ আগেই দিয়েছি। শম্ভুচন্দ্রের তিরোধান সময় নিশ্চিত রূপে জানা যায় না। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর ১০/১২ বৎসর পর পর্যন্ত তিনি যে জীবিত ছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিদ্যাসাগর গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের (আষাঢ়, সন ১৩১৬ সাল) ভূমিকায় লিখছেন, ''অধুনা তিনি লোকান্তরিত।''[১৪] শম্ভুচন্দ্র কলকাতায় দেহত্যাগ করেন। শেষ বয়সে বীরসিংহে বসবাস করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে তাঁর একতলা বাড়িটিও দীর্ঘজীবী হয় নি। এখন তার কোনও চিহ্নই নেই। শম্ভুচন্দ্রের বাড়ি তৈরির পরে নারায়ণের বাড়ি তৈরি হয়। বিদ্যাসাগর যখন গ্রাম ত্যাগ করেন তখন পুত্রের সঙ্গে কোনও মনোমালিন্য ছিল না কিন্তু যেহেতু তিনি পুত্রের বাড়িতে অবস্থান করেন নি তাই মনে হয় ১৮৬৯ সালের জুন মাসের মধ্যে নারায়ণের বাড়ি সম্পূর্ণ হতে পারে নি। এ বাড়িটিও ছিল মাটির দোতলা বাড়ি। এখন যেখানে বালিকা বিদ্যালয় সেই চত্বরেরই উত্তর দিকে ছিল এই বাড়ি। নারায়ণ এখানে সপরিবারে দীর্ঘদিন বাস করেছেন। বিদ্যাসাগরের জীবিতকালে নারায়ণের পত্নী ভবসুন্দরী কিংবা পুত্র প্যারিমোহনের কোনও কোনও চিঠিতে এই বাড়িটিকে ''বিদ্যাসাগর হাউস'' বলে ঠিকানায় বা পত্রশীর্ষে লেখা হয়েছে।[১৫] প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগরও ''বিদ্যাসাগর হাউস'' কথাটি ঠিকানায় ব্যবহার করেছেন; কখনও কখনও ''বিদ্যাসাগর বাটী'' বলেও উল্লিখিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে এই সব চিঠিগুলি সাধারণত ১২৯২-৯৩ সালেই লিখিত —যখন নারায়ণের সঙ্গে বিদ্যাসাগর প্রায় কোনও সম্পর্কই রাখতেন না। ''বীরসিংহ জননী''র পত্রের মতো 'বিদ্যাসাগরের বাটী' বলে উল্লেখ করে বিদ্যাসাগরের কোমল মনে কিছু সহানুভূতির সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছিল ভাবলে ভুল হবে না বলেই মনে হয়। কারণ এই বাড়িতে বিদ্যাসাগর বাস করেন নি। এবং পরবর্তী কালে বাটিটি সারাবার জন্য অর্থসাহায্য করতেও রাজী ছিলেন না। বিদ্যাসাগর র শেষ চিঠিতে তিনি শম্ভুচন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছেন,'' নারায়ণের বাটি মেরামতের টাকা আমি দিব না।''[১৬] যাই হোক্ এই বাড়ি মেরামত নিশ্চয়ই হয়েছিল কারণ বিদ্যাসাগরের অর্থে নির্মিত এই বাড়িটি ১৯৭৮-৭৯ সাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল তারপর জরাজীর্ণ হয়ে ভূমিসাৎ হয়। এই বাড়িতে বাস করেছিলেন ভগবতী দেবী। বস্তুতপক্ষে এই বাড়ি থেকেই তিনি কাশীযাত্রা করেছিলেন।

বিদ্যাগাসরের পত্নী দীনময়ী দেবীও এই বাড়িতে বাস করেছেন। নারায়ণ ১৯২৩ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই বাড়িতেই ছিলেন। পরে ভগবতী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বর্গত পার্বতীচরণ চক্রবর্তী এই বাড়িতে বসবাস করতেন। ১৯৫৬ পার্বতীবাবু অবসর গ্রহণ করলে নারায়ণের দৌহিত্র ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের এক কর্মচারীর বাসস্থান হয়। আজ আর সেই বাড়ির কোনও চিহ্নই নেই। এই বাড়ীর স্থানটি এখন বালিকা বিদ্যালয়ের দখলে।

বিদ্যাসাগরের উইলে নারায়ণকে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন নি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর এক দীর্ঘ ও জটিল মামলার শেষে বিদ্যাসাগরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলেন নারায়ণ। বীরসিংহের সম্পত্তির মধ্যে ভগবতী বিদ্যালয়ের জমি বিদ্যালয়ের সম্পত্তি। পৈতৃক ভদ্রাসনও অধিগৃহীত। নারায়ণের বাড়ির সংলগ্ন জায়গাতে আছে সরকার অনুমোদিত বালিকা বিদ্যালয়। নারায়ণের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তাঁর দৌহিত্র ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় (মৃত্যু ১৯৬৩), কারণ নারায়ণের পুত্র প্যারিমোহন অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান। বর্তমানে ক্ষিতীশবাবুর পুত্রেরা নারায়ণের সম্পত্তির মালিক। বীরসিংহে নারায়ণের সম্পত্তির মধ্যে অবশিষ্ট আছে বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রায় চার বিঘা খালি জমি, ভগবতী বিদ্যালয়ের উত্তর দিকে একবিঘার মতো জমি, দুটি পুকুর ও কিছু ধান চাষের জমি। সন্দেহ নেই এ সম্পত্তির সবটাই বিদ্যাসাগরের টাকায় ক্রয় করা হয়েছিল। কিন্তু এর সাথে বিদ্যাসাগরের স্মৃতি কোনও ভাবেই জড়িত নয়।

বিদ্যাসাগর শেষ জীবনে বীরসিংহে দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্য যে কতখানি উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় শম্ভুচন্দ্রকে লেখা তাঁর শেষ চিঠিতে। বিদ্যাসাগর নির্দেশ দিয়েছিলেন যে নারায়ণের বাড়ি থেকে ভগবতী বিদ্যালয়ের অংশটি তুলে নিতে (তখনও বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ি হয় নি) শম্ভুচন্দ্র চিঠিটি স্কুলের প্রধানশিক্ষককে দিয়েছিলেন। সেই থেকে চিঠিটা বিদ্যালয়েই আছে।

### বিদ্যাসাগরের কলকাতার বাড়ি

জীবনের প্রথম আট বছর ব্যতীত বিদ্যাসাগর তাঁর একাত্তর বৎসরের জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন কলকাতায়। ১৮২৮ সালে কলকাতায় এসে বড়োবাজারের



দয়েরহাটে জগদুর্লভ সিংহের বাড়িতে ওঠেন ঈশ্বরচন্দ্র। বাড়ির অবস্থান আজ আর নিধারিত করা সম্ভব নয়।[১৭] ১৮৪০ সালের শেষ অবধি এই বাড়িতেই ছিলেন। ১৮৩৮ সালে কয়েক মাসের জন্য দয়েরহাটের বাড়ি ছেড়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে যেতে হয়েছিল। প্রথমে কলকাতায় এসে থাকতেন তিনতলার একটি ঘরে। একতলায় ছিল রান্নাঘর ইত্যাদি, এবং একচিলতে বারান্দা। ১৮৩৮ সালের শেষ দিকে জগদুর্লভবাবু ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে পুলিশ-কেসে জড়িয়ে পড়েন। ফলে জগদুর্লভবাবু অর্থসমস্যায় পড়েন। ঠাকুরদাস পুত্রদের নিয়ে বিনা ভাড়ায় থাকতেন। ঠাকুরদাস বাসা ছেড়ে দেওয়ার পর তিনতলার ঘরটি ওনসুকদাস নামক মারোয়াড়ি-নিবাসী এক ব্যবসায়ীকে ভাড়া দেওয়া হয়। জগদুর্লভবাবুর অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটলে তিনি ঠাকুরদাসকে আবার তাঁর বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন। এবারের অবশ্য তাঁদের দেওয়া হয় একতলার স্যাঁতসেঁতে একটি ঘর, যেখানে তিন ছেলেকে নিয়ে ঠাকুরদাসকে থাকতে হত। আর কোনও উপায়ও ছিল না, কারণ আর্থিক অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হওয়ার ফলে জগদুর্লভবাবুকে বাড়ির বেশির ভাগ অংশই ওনসুকদাসকে ভাড়া দিতে হয়। পরে জগদুর্লভবাবুকে কলকাতার বাস উঠিয়ে দিতে হয়েছিল। খুব সম্ভবত জগদুর্লভবাবুর দয়েরহাটের বাড়িটি ওনসুকদাসই শেষ পর্যন্ত অধিকার করেছিলেন।

একটি মাত্র স্যাঁতসেঁতে ঘরে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে পাঠশেষ হওয়া পর্যন্ত বাস করেছিলেন। ঘরটি এতই অস্বাস্থ্যকর ছিল যে বিদ্যাসাগর কঠিন অসুখে আক্রান্ত হলেন। শম্ভুচন্দ্র ঘরটির সম্পর্কে বলেছেন, ''রাত্রিতে সমস্ত শয্যা যেন জলসিক্ত বোধ হইয়া থাকে''।[১৮] ডাক্তাররা ঐ স্যাঁতসেঁতে ঘরকেই অসুখের কারণ বলে অনুমান করে বাসা বদলাবার পরামর্শ দেন। ইতিমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কৃত কলেজের পড়াও শেষ হয়।

১৮৪১ সালের প্রথমেই দয়েরহাট থেকে বৌবাজার আনন্দচন্দ্র সেনের বাড়িতে[১৯] উঠে এলেন বিদ্যাসাগর। ঐ বাড়িতেই অন্য একটি ঘরে বীরসিংহ অঞ্চলের দু-জন ব্যক্তি বাস করতেন। ফলে গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সুবিধা হবে এই বিবেচনায় বৌবাজার অঞ্চলে বাসা নেওয়াই মনস্থ করেন। বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকুরি করেন। বাসাতে লোক সংখ্যা ছিল ৯ জন—তিন ভাই, দুই খুড়তুতো ভাই, আরও তিনজন আত্মীয় এবং শ্রীরাম নামে এক পরিচারক। ৫০ টাকা মাইনের ২০ টাকা পাঠাতেন ঠাকুরদাসকে, ৩০ টাকায় বাসার খরচ চালাতেন। সেন-বাড়িতে বিদ্যাসাগর ছিলেন প্রায় তিন বৎসর।

নিকটেই ছিল বিখ্যাত 'বানিয়ান' হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। হৃদয়রামের পৌত্র রাজকৃষ্ণ ছিলেন বিদ্যাসাগরের বিশেষ অনুগত এবং রাজকৃষ্ণকে স্বল্প আয়াসে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণকে সরলীকৃত করে উপক্রমণিকা রচনা করেছিলেন। সেনবাড়িতে জায়গার অভাব হওয়াতে হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা বাড়ির দু-খানি ঘর নিয়ে বাসা করলেন। কিছুদিন পরে সমস্ত বৈঠকখানাই আট টাকায় ভাড়া নিলেন। ১৮৭৬ সালে বাদুরবাগানে নিজের বাড়ি তৈরি হওয়া পর্যন্ত এই বাড়িটি বিদ্যাসাগরের কলকাতার বাসাবাড়ি ছিল।

তবে বিদ্যাসাগর এই বাড়িতে খুব বেশি থাকতেন না। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য লিখেছেন,[২০] ''তাঁহার নিজের বাসায় (বৌবাজারের বাসায়) কিন্তু তাঁহারই আত্মীয় দশবার জন লোক সর্ব্বদা থাকিত; তিনি তাহাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যয়ভার বহন করিতেন। পরে বিদ্যাসাগর যখন মেছোবাজারে বাসা করিলেন, তখনও বৌবাজারে তাঁহার এই বাসা ছিল; তাঁহার গ্রামের লোক আসা যাওয়া করিত, এবং সেখানেই থাকিত। যখন তিনি সুকিয়া স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখনও বৌবাজারের বাসা ছিল।''

বিদ্যাসাগর বৌবাজারের বাসায় বাস করেছিলেন ১৮৪৩ থেকে ১৮৫১ পর্যন্ত। ১৮৫১ তে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি সংস্কৃত কলেজ ভবনের দোতলায় 'বাসা করে বসবাস করেছিলেন।''[২১] কিন্তু মাঝে মাঝে বৌবাজারের বাসায় আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গেও বসবাস করতেন। সংস্কৃত কলেজের চাকুরি পরিত্যাগের পর, ''এখন যেখানে কিং কোম্পানির ওষুধের দোকান ঐখানে একতলা বাড়িতে বিদ্যাসাগর লোকজন লইয়া থাকিতেন। ...বিদ্যাসাগর ক্ষুদ্র কক্ষটিতে কেদারায় হেলান দিয়া একখানি বই হাতে করিয়া বিদ্যাসাগর নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতেছেন।''[২২] কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এই অবস্থায় বিদ্যাসাগরকে অনেকবার দেখেছেন। মেছুয়াবাজারের বাসাটিও বাদুড়বাগানের বাড়ি তৈরি পর্যন্ত ছিল।

কিন্তু বিদ্যাসাগর এই বাসা ছাড়াও থাকতে ভালোবাসতেন বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে। রাজকৃষ্ণ তাঁর বৌবাজারের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে ১২

নং সুকিয়া স্ট্রিটে একটি বাড়ি তৈরি করে বসবাস করতেন। বিদ্যাসাগর প্রায়ই রাজকৃষ্ণের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে থাকতেন। রাজকৃষ্ণের মা বিদ্যাসাগরকে ছেলের মতো স্নেহ করতেন। অপরদিকে বিদ্যাসাগরও তাঁকে মায়ের তুল্য জ্ঞান করতেন। রাজকৃষ্ণেরর কন্যা প্রভাবতীর বালিকা বয়সে মৃত্যু ঘটলে বিদ্যাসাগর তাঁর কন্যাসমা প্রভাবতীর স্মৃতিতে ''প্রভাবতী সম্বোধন'' নামক মর্মস্পর্শী পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৬৫ সালে উত্তর পাড়ায় এক দারুণ ঘোড়ার গাড়ির দুর্ঘটনার পর বিদ্যাসাগর প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। সেই সময় তিনি সুকিয়া স্ট্রিটে রাজকৃষ্ণের বাড়িতে থাকতেন। ১৮৭৫ সালে একবর গুরুতর অসুস্থ হয়ে প্রায় দুইমাস চিকিৎসা ও শুশ্রূষার পর সুস্থ হয়ে ওঠেন। বস্তুতপক্ষে এই বাড়িতে বিদ্যাসাগর পেতেন মাতার স্নেহ ও প্রিয়জনদের প্রীতি ও ভালোবাসা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই বাড়িতেই প্রথম বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠানটি সংঘটিত হয়। ১৮৫৬ সালের বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত আইন পাশের পর বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে তাঁরই বিশেষ পরিচিত, গোবরডাঙ্গার রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নর সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশম বর্ষীয়া বিধবা কন্যা কালীমতির বিবাহ স্থির হয়। বিয়ের দিন ছিল ৭ই ডিসেমবর ১৮৫৬। কলকাতার বিধবা বিবাহ সমর্থনকারী সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই সেদিন ১২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে এসেছিলেন। ১৮৭৬ সালে বিদ্যাসাগরের নিজের বাড়ি তৈরি হওয়ার পর ১২ নং সুকিয়া স্ট্রিটে তিনি কদাচিৎ রাত্রিযাপন করতেন বটে কিন্তু এই বাড়িতে তাঁর যাতায়াত ছিল নিয়মিত।

বৌবাজার, মেছুয়াবাজার ও সুকিয়া স্ট্রিট — এই তিনস্থানের তিনটি বাড়ির মধ্যে প্রথম দুটি স্থানের বাড়ি দুটির আজ আর অস্তিত্ব নেই। কেবল ১২নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িটি আজও বর্তমান। বর্তমানে রাস্তাটির নাম পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে কৈলাস বোস স্ট্রিট এবং বাড়ির নম্বর ৪৮, যদিও বাড়িটির জীর্ণদশা, উপযুক্ত রক্ষণবেক্ষণের দ্বারা এটিকে রক্ষা করা এখনও সম্ভব।

কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পরিকল্পনা বিদ্যাসাগরের ছিল না বলেই মনে হয়। বীরসিংহে মাটির দোতলা বাড়ি সুন্দর করে নির্মাণ করিয়ে সেইখানে পরিবারবর্গকে রেখে ছিলেন। স্ত্রী দীনময়ী মাঝে মাঝে কলকাতায় এসেছেন বটে কিন্তু ১৮৭৬ সালের আগে স্থায়ীভাবে বীরসিংহেই বসবাস করেছেন। কলকাতায় বাড়ি তৈরি হওয়ার পরও একাদিক্রমে কলকাতায় বাস করেন নি। পুত্র নারায়ণও কলকাতায় পড়াশুনার জন্য এসেছেন ১৮৬৫ সালে। কিছুদিন পরে অবশ্য আবার বীরসিংহে ফিরে যান। ১৮৬৮ সালে বীরসিংহের বাড়ি ভস্মীভূত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই মুচিরাম-মনমোহিনীর বিবাহ সংক্রান্ত মনোমালিন্যের ফলে বিদ্যাসাগর চিরকালের জন্য গ্রাম ত্যাগ করেন। কলকাতায় স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা এর পরই অনুভূত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৮৪৮ সালের শেষদিকে বিদ্যাসাগর যখন কাশীতে গিয়েছিলেন সেই সময় কলকাতায় বাড়ি করার জন্য ঠাকুরদাসের অনুমতি চাইলেন। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, ''অগ্রজ মহাশয় একদিন কথা প্রসঙ্গে পিতৃদেব মহাশয়কে বলেন, 'এতাবৎ কাল ভাড়াটিয়া বাড়িতে কলকাতায় অবস্থান করিতেছি, কলিকাতা বাটি না করিবার তাৎপর্য্য এই যে, যদি বীরসিংহ জন্মভূমি বিস্মৃত হই। এক্ষণে কলকাতায় নিজের বাটী না করিলে সময়ে এই এক মহৎ কষ্ট হয় যে কতকগুলি পুস্তকের সেলফ্ আছে, মধ্যে মধ্যে এক বাটী হইতে অপর বাটীতে লইয়া যাইতে অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে; ইত্যাদি কারণে স্থান ক্রয় করিয়া বাটী প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করি; আপনার মত কী?' তাহাতে পিতৃদেব কহিলেন, 'তুমি পুস্তক রাখিবার উপলক্ষে বাটী প্রস্তুত করিবে এ সংবাদে পরম সন্তোষ লাভ করিলাম, ত্বরায় বাটী প্রস্তুতের উদ্যোগ কর'।''[২৩]

বিদ্যাসাগরের বইয়ের সংগ্রহ ছিল সুবৃহৎ। তিনি শুধু বই কিনতেন না, সেগুলি প্রায়ই বিদেশ থেকে মূল্যবান চামড়ায় বাঁধাই করিয়ে আনতেন। তাঁর সংগ্রহে ন্যূনপক্ষে ১৮/২০ হাজার বই ছিল। কলকাতায় নুতন বাড়ি তৈরি হলে দোতলার ঘরে বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরি স্থাপিত হয়। পিতার অনুমতি নিয়েই তিনি ১৫ নম্বর বৃন্দাবন মল্লিক লেনের বাড়ি খরিদ করেন এবং অবিলম্বে বাড়ি তৈরি শুরু করেন। এক বছরের বেশি সময় লাগে বাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ হতে। ১৮৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে বিদ্যাসাগরের এই 'ইংরাজ-পছন্দ' দোতলা বাড়িতে গৃহ প্রবেশ করেন। বাড়িটির একতলার ঘরগুলিতে আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্য আশ্রিতদের দ্বারা পূর্ণ থাকত; দোতলায় থাকতেন বিদ্যাসাগর এবং সঙ্গে বিরাট লাইব্রেরি।

এই বাড়িটির একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীম তাঁর রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে। ১৮৮২ সালের ৫ই আগস্ট



বিকালবেলা শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর বাদুড়বাগানের বাড়িতে গিয়েছিলেন। শ্রীম-এর (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) উদ্যোগেই এই সাক্ষাৎ সম্ভব হয়েছিল এবং স্বাভাবিক ভাবে তিনিও সঙ্গে ছিলেন। বাদুড়বাগানের বাড়ি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, ''গৃহটি দ্বিতল ইংরাজ-পছন্দ। জায়গার মাঝখানে বাটী ও জায়গার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর। বাড়ির পশ্চিমধারে সদর দরজা ও ফটক। ফটকটি দ্বারের দক্ষিণ দিকে। পশ্চিমের প্রাচীর ও দ্বিতল গৃহের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মাঝে মাঝে পুষ্পবৃক্ষ। পশ্চিমদিকের নীচের ঘর হইতে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। উপরে বিদ্যাসাগর থাকেন। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াই উত্তরে একটি কামরা, তাহার পূর্ব্বে হল ঘর। হলের দক্ষিণ-পূর্ব্ব ঘরে বিদ্যাসাগর শয়ন করেন। ঠিক দক্ষিণে আর একটি কামরা আছে—এই কয়টি কামরা বহুমূল্য পুস্তকে পরিপূর্ণ। দেওয়ালের কাছে সারি সারি অনেকগুলি পুস্তকাধারে অতি সুন্দররূপে বাঁধানো বইগুলি সাজানো আছে। হল ঘরের পূর্ব সীমান্তে টেবিল ও চেয়ার আছে। বিদ্যাসাগর যখন বসিয়া কাজ করেন, তখন সেইখানে তিনি পশ্চিমাস্য হইয়া বসেন। যাহারা দেখাশুনা করিতে আসেন তাহারাও টেবিলের চতুর্দ্দিকে চেয়ারে উপবিষ্ট হন। টেবিলের উপর লিখিবার সামগ্রী — কাগজ কলম দোয়াত ব্লটিং, অনেকগুলি চিঠিপত্র, বাঁধানো হিসাবের খাতা, দু'চারখানি বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তক রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কাষ্ঠাসনের ঠিক দক্ষিণের কামরাতে খাট বিছানা আছে—সেইখানেই ইনি শয়ন করেন।[২৪]

বাড়িটি এখনও বর্তমান, যদিও ফুল গাছ এবং বাড়িটির অন্যান্য সাজসজ্জা এখন অন্তর্হিত হয়েছে। সন্দেহ নেই বাড়িটির জীর্ণদশা এবং সংস্কারের প্রয়োজন; কিন্তু বাড়ির মূল কাঠামো ঠিকই আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়াও আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এই বাড়িতে পদার্পণ করেছেন। 'জীবনস্মৃতির' সাক্ষ্য অনুসারে রবীন্দ্রনাথ অন্তত দু-বার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণ করে আসার পর কিছুদিনের মধ্যেই যখন বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করলেন, তখন গৃহশিক্ষক তাঁকে 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ করতে বাধ্য করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ''তিনি একদিন আমার ম্যাকবেথের তর্জমা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শুনাইতে হইবে বলিয়া আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন। তখন তাঁহার কাছে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বসিয়া ছিলেন। পুস্তকে-ভরা তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিতে আমার বুক দুরু দুরু করিতেছিল। তাঁহার মুখচ্ছবি দেখিয়া যে আমার সাহস বৃদ্ধি হইল তাহা বলিতে পারি না।''

এই সাক্ষাৎ খুব সম্ভবত বৃন্দাবন মল্লিক লেনের নতুন বাড়িতে ঘটে নি। ১৮৭২ সালে বিদ্যাসাগর হিমালয় ভ্রমণে গিয়ে ঐ বৎসরই প্রত্যাগত হয়েছিলেন। এর কয়েক মাস পরেই তিনি স্কুল ছেড়ে দেন এবং গৃহশিক্ষকের নিকটই পাঠ নিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং নির্দিষ্ট সাল না উল্লেখ করলেও এই সাক্ষাৎ ঘটেছিল ১৮৭৩-৭৫-এর মধ্যে বলে মনে হয়। সেই সময় বিদ্যাসাগর প্রধানত মেছুয়াবাজারের বাড়িতে বসবাস করতেন। সুতরাং প্রথম সাক্ষাৎটি যে বাদুড়বাগানের বাটীতে ঘটে নি তা প্রায় নিশ্চিত। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য যাঁকে রাজকৃষ্ণ মখোপাধ্যায় বলেছেন তিনি ছিলেন আসলে বিদ্যাসাগরের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর রবীন্দ্রনাথ যখন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে যান তার পূর্বেই বাদুড়বাগানের বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। ১৮৮১ সালে সন্ধ্যাসংগীত প্রকাশিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথও কবিখ্যাতি লাভ করেছেন। এই সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার সাহিত্যিকগণকে এক করিয়া একটি পরিষদ গঠন করিবার' উদ্দেশ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভায় আমন্ত্রণ করার জন্য গেলাম, তখন সভার উদ্দেশ্য ও সভ্যদের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন, ''আমি পরামর্শ দিতেছি আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ করো — হোমরা-চোমরাদের লইয়া কোনও কাজ হইবে না, কাহারও সঙ্গে কাহারো মতে মিলিবে না।'' এই বলিয়া তিনি এ সভায় যোগ দিতে রাজী হইলেন না।' রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ''বিদ্যাগরের কথা ফলিল — সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইয়া গেল।''[২৫] এই বাড়ি বাদুড়বাগানের নতুন বাড়ি, ১৮৭৭ সাল থেকে বিদ্যাসাগর এখানেই বাস করতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গিয়েছিলেন এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও কেশবচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নবীনচন্দ্র সেন ইত্যাদি এই বাড়িতে এসেছেন।

এই বাড়িতেই বিদ্যাসাগর প্রকৃত অর্থে পারিবারিক জীবনের স্বাদ পেয়েছিলেন। অবশ্য ততদিনে পুত্রের সঙ্গে তাঁর দুস্তর ব্যবধান আজীবন বিচ্ছেদের রূপ নিয়েছে। শম্ভুচন্দ্র

ছাড়া তার ভাইদের সঙ্গেও যে আন্তরিক সদ্ভাব ছিল তা নয়। ১৮৭১ সালের এপ্রিল মাসে মাতা ভগবতী এবং ১৮৭৬ সালের এপ্রিল মাসে পিতা ঠাকুরদাস কাশীতে পরলোক গমন করেন। শম্ভুচন্দ্র লিখছেন, ''ঐ বাটীতে স্বকীয় লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া একাকী নিভৃত ভাবে থাকিবেন, এই অভিপ্রায়েই বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল পরিবারবর্গকে অন্যবাটীতে রাখিব। কিন্তু অন্য বাটী নির্ম্মাণ না হওয়াতে সকল পরিবারবর্গকে ঐ বাটীতে আনয়ন করিলেন। আমরাও শ্রীচরণ দর্শনে আগমন করিয়া যতদিন ইচ্ছা ঐ বাটীতেই থাকিতাম।''[২৬] বিদ্যাসাগরের জেষ্ঠা কন্যা হেমলতা, এবং কনিষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী সংসার পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন।

এই বাড়িতেই ১৮৮৮ সালে দীনময়ী দেবীর ও ১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। যদিও নারায়ণ বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষ কয়দিন বাদুড়বাগানের বাড়িতেই ছিলেন এবং মৃত্যুর পর মুখাগ্নি করেন, তিনি কিন্তু এই বাড়িতে বসবাস করতেন না। ১৮৭৫ সালে বিদ্যাসাগর যে উইল করেছিলেন তাতে নারায়ণ ''কুপথগামী এবং যথেচ্ছচারী'' ছিলেন এই অভিযোগে তাঁর জন্য কোনও বৃত্তি বা সম্পত্তি নির্ধারিত করে যান নি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই নারায়ণের পুত্র প্যারিমোহন উইলের বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং হাইকোর্টের রায়ে নারায়ণ উত্তরাধিকারী হিসাবে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হন। ১৮৯২ সালের আগস্ট মাসে মামলার রায় দেওয়া হয়। উইলে বিদ্যাসাগরের সম্পত্তির যে হিসাব দেওয়া ছিল তাঁর রচিত বইগুলির স্বত্ব ছাড়া ছিল 'সংস্কৃত যন্ত্রের তৃতীয় অংশ', ''নিজ ব্যবহারার্থ সংগৃহীত সংস্কৃত বাংলা হিন্দী পার্শী ইংরেজী প্রভৃতি পুস্তকের লাইব্রেরী,'' বাদুড়বাগানের বাড়ি বা বীরসিংহের কোনও সম্পত্তির উল্লেখ ছিল না। ১৮৭৫ সালে অবশ্য বাড়ি নির্মাণ কার্য চলছিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই তা উইলে উল্লিখিত হয় নি।

কিন্তু সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে ২৫নং বৃন্দাবন মল্লিক লেনের বাড়িটির দখল নিলেন নারায়ণ এবং সপরিবারে সেখানেই বসবাস করতে শুরু করেন। বৃন্দাবন মল্লিক লেনের বাড়ি ছাড়াও ২২নং শঙ্কর ঘোষ লেনে মেট্রোপলিটান কলেজের বাড়িটি পৈতৃক সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে দাবি করেন। বিদ্যাসাগরের উইলে এই বাড়ির কোনও উল্লেখ তো ছিলই না; বিদ্যাসাগরও কোনও দিন এই প্রতিষ্ঠান তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি এইরূপ আভাসও দেন নি। যাই হোক নারায়ণ সম্পত্তির মালিক হওয়ার পরই তিনি প্রথমত উইলে উল্লিখিত অনুদান-প্রাপকদের নির্ধারিত অনুদান সময়মতো দিতে অস্বীকৃত হলেন। অনেক ক্ষেত্রে, যেমন বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে, তিনি বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে আইনগত অসুবিধার সৃষ্টি করে অনুদান বন্ধ করে দিতে চাইলেন।[২৭] দ্বিতীয়ত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন। ১৯০১ সালের ৬ই সেপটেম্বর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভারত সরকারের সেক্রেটারিকে একটি চিঠিতে লিখছেন, ''Babu Narayan is disposing of almost all the immovable properties in his hands. Within a month more, it is believed, there will be no immovable property of which he will be able to call himself the owner.'' (Education Department Proceedings no7, Oct, 1901) বস্তুতপক্ষে এইভাবে সম্পত্তির হস্তান্তর সরকারী নথিপত্রে 'Collusive transfer' বা আইনকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য উভয়পক্ষের সম্মতিসূচক মিথ্যা হস্তান্তর বলে অভিহিত করেছেন।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত অনুদান-প্রাপকরা অনুদান আদায়ের জন্য নারায়ণের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেন (suit no 199 of 1904)। এই মামলাতেই হাইকোর্টের আদেশে ১৯০৬ সালের ১৬ই জুন নারায়ণ যে সম্পত্তির তালিকা দাখিল করেছিলেন তাতে ২৫ নং বৃন্দাবন মল্লিক লেনের বাড়িটির মূল্য ধরা হয়েছিল ৪০ হাজার টাকা, এবং পৃথকভাবে লাইব্রেরিটির মূল্যও দেখানো হয়েছিল ৪০ হাজার টাকা। অবশ্য হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে নারায়ণ লাইব্রেরিটি তাঁর স্ত্রী ভবসুন্দরী দেবীকে বিক্রি করে দিয়েছেন। তিনি আবার জনৈক কেদারনাথ মিত্রের নিকট লাইব্রেরিটি ২৫০০ টাকায় বন্ধক রেখেছিলেন। হিসাব দাখিল করার সময় লাইব্রেরিটি কেদারনাথ মিত্রের দখলে ছিল বলে উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু লাইব্রেরিটি বস্তুতপক্ষে ২৫ বৃন্দাবন মল্লিক লেনে, নারায়ণের বসতবাটীতেই বর্তমান ছিল। ১৯১৪ সালে ১৪ই জানুয়ারি লালগোলার মহারাজা কেদারনাথ মিত্রের নিকট বন্ধকী স্বত্ব কিনে নিয়ে লাইব্রেরিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন। ইতিমধ্যে লাইব্রেরির কিছুকিছু বই নিরুদ্দেশ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু লাইব্রেরি নারায়ণের বাড়িতেই ছিল।

২৫ নং বৃন্দাবন মল্লিক লেনের বাড়ি সম্পর্কে হাইকোর্টে



দাখিল করা সম্পত্তির হিসাবে নারায়ণ বলেছেন যে বাড়িটি ২২,১৫০ টাকার বিনিময়ে ২০ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের সর্বেশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর তিনভায়ের নিকট ১৯০৩ সালে বন্ধক রেখেছেন। অবশ্য সর্ত ছিল যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা দিয়ে দিলে বাড়িটি নারায়ণের পুত্র প্যারিমোহনেরই থাকবে। যাই হোক হাইকোর্টশেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের সমস্ত সম্পত্তি যথাযথ তত্ত্বাবধানের জন্য হাইকোর্টেরই একজন এ্যাসিটান্ট রেজিস্ট্রার, জ্যোতিষচন্দ্র মিত্রকে রিসিভার নিয়োগ করেন এবং সমস্ত পুরাতন ঋণ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য এবং বৃত্তিভোগীদের উইল-নির্দেশিত সমস্ত পাওনা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করারও অধিকার দেন। ২৫নং বৃন্দাবন মল্লিক লেনের বাড়িতে নারায়ণ সপরিবারে বেশ কিছুদিন বাস করেছিলেন। ১৯০৯-১০ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের খাতায় বাড়িটির দখলিকার হিসাবে জনৈক পি কে চৌধুরীর নাম দেখা যায়। ১৯২৬ সালে বৃন্দাবন মল্লিক লেনের নাম পরিবর্তিত হয়ে বিদ্যাসাগর স্ট্রিট রাখা হয় এবং ২৫ নং বাড়িটির নম্বর হয় ৩৬। ১৯২৬ সালেও পি কে রায় চৌধুরীই ৩৬ নং বিদ্যাসাগর স্ট্রিটের দখলিকার হিসাবে দেখানো আছে।

১৯৩৩-৩৪ সাল থেকে বাড়ির দখলিকারের নাম সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯২৬ সালেই ৩৬নং বিদ্যাসাগর স্ট্রিটের এক কোণের এক টুকরো জমিকে ৩৬/১ বিদ্যাসাগর স্ট্রিট-বলে মূল জমি থেকে পৃথক করে নেওয়া হয়। এই ৩৬/১ জায়গাটিতে ছিল একটি ছোট্ট একতলা Outhome জাতীয় বাড়ি। এর দখলিকার হিসাবে কর্পোরেশনের নথিতে K P Chattopadhaya and others -এর উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যক্তি হলেন ক্ষিতিশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণের জামাতা। এই অংশটি মূল জমি ও বাড়ির থেকে আলাদা হয়ে গেলেও মূল বাড়ির বিশেষ হানি হয় নি। সুরেশ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারীরাই এখন ঐ বাড়ির মালিক। বাড়িটির সংস্কার আশু প্রয়োজন, কিন্তু বাড়িটির মালিক, সম্ভবত সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় সংস্কার করা থেকে বিরত রয়েছেন।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬৯ সালের ২৪ শে মার্চ বিদ্যাসাগরের বাড়ি বলে ৩৬/১ বিদ্যাসাগর স্ট্রিটের একটুকরো জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা এবং ঐস্থানে একটি একতলা ছোট্ট বাড়ির ধ্বংসাবশেষ অধিগ্রহণ করেন। অধিগ্রহণ করা হয় ক্ষিতিশপ্রসাদের উত্তরাধিকারীর নিকট থেকে। কিন্তু স্পষ্টতই এটি বিদ্যাসাগরের বাড়ি নয়। সম্ভবত সরকার কোনও কারণে সরেজমিন তদন্ত করার চেষ্টা না করেই এই এক ফালি জায়গাকে বিদ্যাসাগরের বাড়ি বলে বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন। সরকারের এত বড়ো একটি ভুল এখনও পর্যন্ত চলে আসছে—প্রকাশ্যে ত্রুটি স্বীকার করা হয় নি।

বিদ্যাসাগরের উইলে উল্লেখ ছিল না বটে কিন্তু উইল 'প্রোবেট' নেওয়ার সময় ১৮ নং গড়পার রোডের একটি বাড়িকেও বিদ্যাসাগরের সম্পত্তির তালিকার মধ্যে দেখা যায়। এই বাড়িটি ঠিক কোন সময়ে বিদ্যাসাগর ক্রয় করেছিলেন তা জানা যায় না। হাইকোর্টের নির্দেশে নারায়ণ ১৯০৬ সালে সম্পত্তির যে হিসাব দাখিল করেছিলেন তার থেকে জানা যায় যে তিনি ১৮নং গড়পার রোডের বাড়িটি থেকে ভাড়া পেতেন মাসিক ১৫ টাকা। বাড়িটি ৪/৫ বছর আগে তাঁর বোন বিনোদিনী দেবীকে পাঁচহাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিলেন। বিনোদিনী দেবী ছিলেন বিদ্যাসাগরের তৃতীয়া কন্যা এবং সূর্যকুমার অধিকারীর (১৮৫৪-১৯২৬) স্ত্রী। বিদ্যাসাগর কখনও এই বাড়িতে বাস করেছিলেন এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কলকাতার আর একটি বাড়ির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের স্মৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সেটি ২২নং শঙ্কর ঘোষ লেনের বিদ্যাসাগর কলেজের বাড়ি। মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজ চলত তিনটে বাড়িতে—২৪নং সুকিয়া স্ট্রিট ৬৩ নং আমহার্স্ট স্ট্রিট এবং ২৭ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। তিনটিই ভাড়াটে বাড়ি। সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ির মালিক বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালে বিদ্যাসাগর অন্যস্থানে বাড়ির অনুসন্ধান করতে শুরু করেন। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের[২৮] বক্তব্য থেকে জানা যায় যে তিনি বাদুড়বাগানের বাড়ি ও তৎসংলগ্ন জমিতে কলেজের জন্য বাড়ি তৈরি করতে মনস্থ করেন। সেই অনুযায়ী প্ল্যানও তৈরি করিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ২২নং শঙ্কর ঘোষ লেনের ১ বিঘা এগার কাঠা জমি নিজের নামে সাতাশ হাজার নয়শত টাকায় ক্রয় করেন। অনতিবিলম্বে বাড়ি তৈরি শুরু হয়। বিদ্যাসাগর নিজেই সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধান করতেন। তিনতলা বাড়িটি তৈরি করতে দেড় লাখ টাকার মতো খরচ হয়েছিল। জমি কেনার সমস্ত টাকা বিদ্যাসাগার নিজ তহবিল থেকে দেন নি, যদিও জমিটি তাঁর নামেই কেনা হয়। মেট্রোপলিটন কলেজের তহবিল থেকেই টাকা দেওয়া হয়েছিল।[২৯] বিদ্যাসাগর বাড়ি তৈরির জন্য এই জমি এবং নিজের স্থাবর

ও অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছিলেন। শোভাবাজারের শ্রীনাথ রায়ের কাছে টাকা ধার করার জন্য যে দলিলটি করেছিলেন সেই দলিলে কলেজের সম্পত্তিতে তাঁর ''নির্বৃঢ় স্বত্ত্ব ও অধিকার'' আছে বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীনাথ রায়ের কাছে তিনি শতকরা সাড়ে সাত টাকা সুদে ত্রিশহাজার টাকা ধার করেছিলেন।[৩০] ২২নং শঙ্কর ঘোষ লেনের জমি নিজের নামে কেনা এবং শ্রীনাথ রায়ের দলিলে কলেজের সম্পত্তিতে নিজের নিরঙ্কুশ অধিকার আছে বলে প্রকাশ করা, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট মঞ্জুরির দরখাস্তে আপনাকে কলেজের স্বত্বাধিকারী রূপে পরিচিত করা—ইত্যাদি কারণে বিদ্যাসাগর কলেজের মালিক ছিলেন এই ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বস্তুতপক্ষে কেবলমাত্র নারায়ণ বা বিদ্যাসাগরের উইলের executor ক্ষীরোদ সিংহই নয়, বর্তমান শতকে অধস্তন কোনও কোনও উত্তর পুরুষও মনে করেন যে বিদ্যাসাগরের অর্থেই ২২নং শঙ্কর ঘোষ লেনের বাড়ি তৈরি হয়েছিল, এবং সেই কারণে ঐ বাড়ির মালিক তিনিই ছিলেন।[৩১] বিদ্যাসাগর নিজের তহবিল থেকে মাঝে মাঝে খরচ করেছেন, নিজের সম্পত্তির বিনিময়ে টাকা কর্জ করেছেন; কিন্তু প্রায় সমস্ত টাকাই তিনি কলেজের তহবিল থেকে শোধ করে দিয়েছিলেন। কলেজকে তিনি কখনও নিজের সম্পত্তি রূপে গণ্য করেন নি। তিনি যে কর্জ করা টাকার বেশির ভাগ কলেজের তহবিল থেকে পরিশোধ করেছিলেন সেই তথ্যটি C E Buckland তাঁর Bengal under the Lieutenant Governors পুস্তকে উল্লেখ করেছেন "The Magnificient building of the Metropolitan Institution was erected by him at a cost of a lakh and half of rupees; the expenditure was primarily incurred at his own cost; though it was afterwards recouped in a large measure from the surplus income of the college and its branch schools."[৩৩]

এই প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে আসবে যে বিদ্যাসাগর স্বয়ং মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজকে কীভাবে দেখতেন। মেট্রোপলিটান কলেজকে ভারতীয় পরিচালিত একটি উৎকৃষ্ট ইংরাজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে উন্নত করতে বিদ্যাসাগর যে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন সে কাহিনী বহু পরিচিত এবং বহু আলোচিত। সে প্রয়াসে তিনি উল্লেখযোগ্যভাবে সফলও হয়েছিলেন, কলেজ পরিচালনায় তিনি প্রায় সব সিদ্ধান্ত নিজেই নিতেন এবং সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতেন। বস্তুতপক্ষে ১৮৬১ সালে কলকাতা ট্রেনিং স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাবর্গ যখন বিদ্যাসাগরের উপর স্কুল পরিচালনার ভার অর্পণ করেছিলেন তখনই তাঁকে পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ কর্তৃত্বই দিয়েছিলেন। পরে হিন্দু মেট্রোপলিটান স্কুল এবং স্কুল থেকে কলেজে রূপান্তর হয়েছিল কেবলমাত্র বিদ্যাসাগরের প্রায় একক প্রচেষ্টাতেই। সুতরাং জনমানসে মেট্রোপলিটান কলেজ বিদ্যাসাগরের কলেজ বলেই একটি ধারণা গড়ে উঠেছিল—এবং ধারণাটি খুব অতিরঞ্জিত ছিল না।

বিদ্যাসাগর কিন্তু কলেজকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করতেন না। ১৮৮৮ সালে শঙ্কর ঘোষ লেনের নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশের পর বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্যের অবনতি হল। বিদ্যাসাগর তাই কলেজ পরিচালনার বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ''স্থির করলেন পরিচালনা ভার ও দায়িত্ব কলেজের অধ্যাপকদের দ্বারা গঠিত একটি কমিটির হাতে তুলে দিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করবেন।''[৩৪] বিদ্যাসাগরের এই সিদ্ধান্ত যখন প্রচারিত হল তখন অনেকেই এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলেন। বিদ্যাসাগর, সম্ভবত জনমতের প্রভাবেই, তাঁর প্রস্তাব আর কার্যকর করলেন না।

কিন্তু ১৮৯১ সালের জুলাই মাসে যখন তিনি মৃত্যুপথযাত্রী তখন তিনি মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশনের জন্য একটি ট্রাস্ট এবং তার উইলেরও কিছু পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন বলে জানা যায়। সং বাদপত্রে এ সম্পর্কে খবরও বেরিয়েছিল — এমনকি বিদ্যাসাগর ৭জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে যে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে ছয়জনের নামও প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রকাশিত নামের মধ্যে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ছিল না। রমাকান্ত চক্রবর্তী রচিত "A Short History of Vidyasagar College"এ লেখা হয়েছে, "He had wished that the Educational society would consist of Maharaja Sir Jatindranath Tagore, Justice Goorodas Banerjee, Babu Golap Chandra Sarkar, Rasbehari Mukherjee, Baidyanath Basu, Kshudiram Basu and Narayan Chandra Vidyaratna, his son. The desire was embodied in the intended codicil of Vidyasagars will. But his grave illness prevented him from translating his intention into reality."[৩৬] নারায়ণের নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি। বিদ্যাসাগর তাঁর ইচ্ছাকে কোনও দলিলের মধ্যে প্রতিফলিত করেন নি— সম্ভবত রোগশয্যায় আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু এই আলোচনা থেকে মেট্রোপলিটানের পরিচালনা-ভার যে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন এতে কোনও দ্বিমত নেই। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে এই কলেজকে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে মনে করতেন না।



এই সঙ্গে উইল পরিবর্তনের কথাও বলেছেন রমাকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়। এই প্রসঙ্গ মেট্রোপলিটান কলেজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এবং বিদ্যাসাগরের জীবনের একেবারে অন্তিমলগ্নে আলোচিত হওয়ার কারণ বোধ হয় মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে নারায়ণের সেবা-শুশ্রূষা। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা মতো,[৩৭] ''আমরা যখনই যাইতাম পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের পিতৃসেবা, জামাতা সূর্য্যকুমার অধিকারীর শ্বশুরসেবা এবং ডাক্তার অমূল্যচরণের তত্ত্বাবধান দেখিয়া হৃদয়ে অতুল প্রীতি পাইতাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোনও কারণে পুত্রের প্রতি বিরূপ ছিলেন। এক্ষণে পুত্রের পিতৃসেবাতে আরও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্ব উইলে পুত্রের বিরুদ্ধে যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার অন্যথা করিতে বাসনা প্রকাশ করিলেন।'' কিন্তু বিদ্যাসাগর সে সুযোগ আর পান নি।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ১৮৭৫ সালের উইল প্রোবেট করার সময় ২২নং শঙ্কর ঘোষ লেনের বাড়িকে সহজেই বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে প্রতিপন্ন করা সম্ভব হল। জমিটির ক্রেতা ছিলেন বিদ্যাসাগর, এবং বাড়ি তৈরির জন্য কর্জও নিয়েছিলেন তিনি। নারায়ণ মেট্রোপলিটন কলেজ ও বিদ্যালয়ের স্বত্বাধিকারী হয়ে কিছুদিন এই প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার পর বুঝতে পারলেন যে এ ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা নেই বললেই চলে। সুতরাং তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাসিক একশত টাকার বিনিময়ে স্কুল ও কলেজ পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে মাসিক একশত টাকা নারায়ণকে দিতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে অবশ্য জনমনে ক্ষোভ দেখা দিয়েছিল কারণ নারায়ণ ''কোনও স্বত্ব বা অধিকার না থাকিলেও অন্যায় পূর্বক ঐ বিদ্যালয় সমূহের ম্যানেজমেণ্ট আপনার হস্তে লইয়া ঐ বিদ্যালয়গুলিকে তাহার পৈতৃক ব্যবসায়ের মত জ্ঞান করিয়া ঐ বিদ্যালয় হইতে লাভ করিবার ইচ্ছায় কার্য্য করিয়া ঐ বিদ্যালয় সকলের ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছেন বা করিতেছেন।''[৩৮] কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের উত্তরাধিকারীগণ একত্র মিলিত হয়ে তাদের মেট্রোপলিটান স্কুল-কলেজের অর্থাৎ ''উপরোক্ত শঙ্কর ঘোষ লেনস্থিত ২২নম্বরের সমস্ত জায়গায় ও তদুপরিস্থিত পাকা ত্রিতল বাটী প্রভৃতিতে ও ঐ সকল বিদ্যালয়ের পুস্তকালয় ও বেঞ্চ টেবিল চেয়ার প্রভৃতি যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তিতে আমাদের প্রোপ্রাইটরী স্বত্ত্ব বা মালিকত্ত্ব ও স্বামিত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক যাহা কিছু আছে তৎসমুদায়'' কলেজের শিক্ষা সভাকে দান করেন।

স্যার রমেশ মিত্রের সভাপতিত্বে এই শিক্ষাসভা গঠিত হয় এবং নাম হয় বিদ্যাসাগর ইন্সটিটিউট্। বিদ্যাসাগর ইন্সটিটিউট কেমলমাত্র সম্পত্তির অধিকারই নয়, কলেজের পরিচালনা-ভারও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে নিজেদের হাতে দিয়ে নেয়। উল্লেখ্য যে নারায়ণ দুই হাজার টাকার বিনিময়ে মেট্রোপলিটান স্কুলের পরিচালনা সুরেন্দ্রনাথকে দিয়ে দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন, কিন্তু পরে বিদ্যাসাগর ইন্সটিটিউট-এর হস্তক্ষেপে তা সম্ভব হয় নি। যাই হোক শেষ পর্যন্ত এই চুক্তি হয় যে নারায়ণ ''পুত্র-পৌত্রাদি ও ওয়ারিশন ক্রমে'' মাসিক একশত টাকা পাবেন। আরও স্থির হয় যে নারায়ণ বা ''তাঁহার ওয়ারিশনগণের মধ্যে অন্যান একজন উক্ত শিক্ষা-সভার মেম্বার ও বিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বরাবর থাকিবেন।''[৩৯] এর ফলে ২২নং শঙ্কর ঘোষ লেনের বাড়ির উপর নারায়ণের আর কোনও দাবি রইল না। তাই ১৯০৬ সালের ২৯শে আগস্ট যখন বিদ্যাসাগরের সমস্ত সম্পত্তি রিসিভারের হাতে যায় তখন ২২নং শঙ্কর ঘোষ লেন স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। আর কোনও দিন এই বাড়িটিকে বিদ্যাসাগরের নিজস্ব সম্পত্তি বলে দাবি করেন নি।

বিদ্যাসাগরের উইলে (জুন, ১৮৭৫) একটি মাত্র বাড়ির উল্লেখ ছিল, সেটি হল, ''কামাটাঁড়ে বাঙ্গালা ও বাগান।'' কামাটাঁড়ে একটি জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা কেনার আগে তিনি দেওঘরে একটি বাড়ি বিক্রির খবর পেয়ে সেই বাড়িটি কেনার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাড়িটি ছিল যথেষ্ট বড়ো আর দামও বেশি। তাছাড়া দেওঘর বাঙালি অধ্যুষিত অপেক্ষাকৃত বড়ো জায়গা বলে কতখানি নির্জনতা উপভোগ করতে পারবেন এ সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত স্বল্প পরিচিত ও প্রায় জনবসতিহীন কামাটাঁড়ে একখণ্ড প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ জমি কিনে সেখানে ছোটো একটি বাংলো বাড়ি

তৈরি করান। জায়গাটি কামটার রেল স্টেশন-সংলগ্ন। বাড়িটি ছোটো হলেও বাগানটি ছোটো ছিল না।

১৮৬৮-৬৯ সালের পর থেকেই বিদ্যাসাগরের মনে নিভৃত বাসের বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে। এই দুটি বৎসর তাঁর জীবনের দুর্বৎসর বলা যায়। পারিবারিক দিক থেকে মনোমালিন্য ইত্যাদিতে তিনি কাতর হয়ে পড়েছিলেন। পৃথগন্ন, গৃহদাহ, মেজভায়ের সঙ্গে মামলা, বীরসিংহ ত্যাগ ইত্যাদি তাঁকে গভীর আঘাত দিয়েছিল। ১৮৬৬ সালে দুর্ঘটনার পর তাঁর শরীর প্রায়ই ভেঙে পড়ছিল — তাই ডাক্তাররাও স্থান পরিবর্তনের উপদেশ দিতেন। এই অবস্থায় তিনি শেষ পর্যন্ত কামটাড়ের বাড়িটি তৈরি করান। বাড়িতে দুটি বড়ো ঘর ছিল। বাগানের মাঝখানে কিছুটা জায়গায় একটা চত্বরের মধ্যে ছিল বসবার জায়গা। ১৮৭২-৭৩ সালের মধ্যেই বাড়ি তৈরি শেষ হয়। বিদ্যাসাগর প্রত্যেক বৎসরই কামটাড়ে এসে কিছুদিন এই বাড়িতে কাটিয়ে যেতেন। ১৮৮৮ সালের জুলাই মাসে পত্নী দীনময়ী দেবী মারা যাওয়ার পর তিনি আর কামটাড়ে যান নি।

কামটাড়ের জলহাওয়ায় তাঁর শরীর ভালো থাকত সন্দেহ নেই; কিন্তু সমসাময়িক বিবরণ থেকে মনে হয় শরীরের সুস্থতার থেকে মানসিক শান্তি পেতেন সবচেয়ে বেশি— যা তাঁর শরীরের গ্লানি দূর করতেও অনেক সাহায্য করত। বিদ্যাসাগরের বাড়ির কাছাকাছি কয়েকজন বাঙালি সরকারী কর্মচারী (স্টেশনমাস্টার, পোস্টমাস্টার ইত্যাদি) ছাড়া আরও বাকি সবই ছিল সাঁওতাল। তাদের সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের এক গভীর আন্তরিক সখ্যতা গড়ে উঠেছিল।

এই দরিদ্র মানুষগুলির আদিম সারল্য ও সততা বিদ্যাসাগরকে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করেছিল। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সভ্য মানুষের লোভ ও স্বার্থপরতার শিকার হয়ে তারা ধীরে ধীরে তাদের জীবনধারণের অবলম্বন, চাষের জমি ও জঙ্গলের উপর অধিকার, হারিয়ে ফেলেছিল। তাই সভ্য-শিক্ষিত মানুষমাত্রই তাদের কাছে কপটাচারী এবং ঘৃণার বস্তু। বিদ্যাসাগরও সভ্য, শহরবাসী মানুষের অসততায় ও মিথ্যাচারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ছিলেন। ১৮৭০ সালের মধ্যে তিনি অজস্রবার শঠতার আর মিথ্যাচারের শিকার হয়েছেন; পারিবারিক ও সমাজ জীবনে স্বার্থপরতার নগ্নরূপ দেখেছেন। তাই তাঁর নিভৃত বাসের ইচ্ছা। কিন্তু এই নিভৃত বাসেই তিনি এমন একদল মানুষের সংস্পর্শে এলেন যাদের ঋজু সরলতা ও সততা তার হৃদয় স্পর্শ করল এবং অচিরেই তাদের সঙ্গে এক আত্মিক যোগ স্থাপিত হল। বিদ্যাসাগরের সম্পর্কে কোনও কোনও ব্যক্তি বলেছেন[৪০] যে তিনি শেষ জীবনে মানুষের প্রতি ঘৃণার মনোভাব পোষণ করতেন। এটি অতিরঞ্জিত কথা। বিদ্যাসাগরের মত শুদ্ধ মানবপ্রেমীর পক্ষে এই ধরনের মনোভাব কখনও স্থায়ী ও সার্বিক হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর কিছু মানুষের প্রতি সাময়িক বিতৃষ্ণার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে কামটাড়ে সাঁওতালদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার ফলেই তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন। তাঁর সমশ্রেণীর মানুষের নীতি ও বিবেকহীনতার আঘাতে বিচলিত ও আহত তাঁর চিত্ত কামটাড়ের পরিবেশে অনেকটা সুস্থির ও সুস্থ বোধ করেছিল।

সাঁওতালদের জন্য তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে তার সমস্ত খরচপত্র নিজেই চালাতেন। বিনা খরচায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যবস্থা তিনিই করতেন। মাঝে মাঝেই সাঁওতালদের বাংলো বাড়ির চত্বরে খাওয়াতেন। সব মিলিয়ে কামটাড়ের বাড়ি ছিল একটি মিলন-ক্ষেত্র।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ১৮৯৮ সালে নারায়ণ বাড়ি ও বাগান মাত্র দু-হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন। ১৯০৬ সালে হাইকোর্টে এইরূপ হিসাবই দিয়েছিলেন তিনি। বিদ্যাসাগরের জন্মের সার্ধশতবর্ষে কামটারের বাড়ি ও বাগান স্থানীয় অধিবাসী ও বিহার সরকারের চেষ্টায় অধিগ্রহণ করা হয়। বাড়িতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বাগানটি সংরক্ষণের অভাবে জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থাতে রয়েছে বটে কিন্তু বাঁধানো চত্বরটি দ্রষ্টব্যস্থল হিসাবে এখনও দর্শককে আকর্ষণ করে। বাড়িটির বালিকা বিদ্যালয় হিসাবে ব্যবহার, সন্দেহ নেই, বিদ্যাসাগরের স্মৃতির প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি; কিন্তু উপযুক্ত সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি দিলে বাড়িটি দীর্ঘায়ু হবে বলে মনে হয়।

কামটাড়ের নিজস্ব বাড়ি ছাড়া, আরও কয়েকটি ভাড়া বাড়িতে বিদ্যাসাগর বেশ কিছু দিন করে বাস করেছিলেন। বর্ধমান শহরে তাঁর বন্ধু প্যারিচাঁদ মিত্রের বাড়িতে প্রায়ই আতিথ্য গ্রহণ করতেন বিদ্যাসাগর। একটানা অনেকদিন বাসের ইচ্ছায় ১৮৬৮ সালে প্যারিচাঁদের বাড়ির অনতিদূরে একটি বাড়ি ভাড়া করেন। তখনও কামটাড়ের বাড়ি তৈরি হয় নি সুতরাং বর্ধমানের বাড়িটিই ছিল স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে স্থান-পরিবর্তনের জায়গা। ১৮৬৮-৬৯ সালে যখন বর্ধমানে জেলায় ম্যালেরিয়া মহামারীর আকার ধারণ করে তখন বিদ্যাসাগর প্রায়ই বর্ধমানে থাকতেন। অন্তত



তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয় এই সময় তিনি স্থাপন করেছিলেন যেখান থেকে রোগীদের বিনাপয়সায় চিকিৎসা করা হত। বিদ্যাসাগর নিজে শহরের মুসলমান পল্লীতে গিয়ে রোগীদের শুশ্রূষা করেছেন এবং তাদের ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করেছেন। বর্ধমানের এই বাসাবাড়ি বেশ কয়েকবছর ছিল। ভগবতী দেবীও কিছুদিন এই বাড়িতে বিদ্যাসাগরের নিকট বাস করেছিলেন। আজ আর এই বাড়িটি চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

মৃত্যুর বৎসরাধিক কাল পূর্বে যখন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। (বিদ্যাসাগর যকৃতের ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। ১৮৬৬ সালে উত্তরপাড়ায় ঘোড়ার গাড়ি দুর্ঘটনায় যকৃতে যে গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন, সেই থেকেই এই রোগের সূত্রপাত।) গঙ্গার হাওয়াতে রোগযন্ত্রণার উপশম হবে মনে করে ফরাসডাঙ্গায় ভাগীরথীর তীরে উমাচরণ খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তির একটি দোতলা বাড়ি ভাড়া নেন।[৪১] যেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে বাস করতেন। কিন্তু একাদিক্রমে খুব বেশিদিন এখানে থাকতে পারেন নি— মাঝে মাঝে তাঁকে কলকাতায় আসতে হত। এ ছাড়া চন্দননগরের হাটখোলায় ''মেজরের কুঠি'' নামক একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন সহ বাস করেছিলেন।[৪২] কিন্তু খুব বেশি দিন এখানে থাকেন নি। এছাড়া কান্দীর রাজবাড়িতেও বিদ্যাসাগর প্রায়ই যাতায়ত করতেন এবং সেখানে মাঝে মাঝে মাসাধিক কাল পর্যন্ত বাস করতেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় এবং রাজাদের অর্থসাহায্যে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি তার প্রায় সর্বময়-কর্তা ছিলেন। এই বিদ্যালয় পরিচালনার প্রয়োজনেও তাকে কান্দী যেতে হত।

বিদ্যাসাগরের স্মৃতিবিজড়িত কয়েকটি প্রধান বাড়ির বিবরণ এই প্রবন্ধে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এই বাড়িগুলিতেই তিনি তাঁর জীবনের বেশির ভাগ কাটিয়েছেন।

### উল্লেখপঞ্জী


১. ১৯২৬ সালে রাস্তার নাম হয় বিদ্যাসাগর স্ট্রিট। বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় নাম ছিল বৃন্দাবন মল্লিক লেন।

২. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন — বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমণিবাশ। বুকল্যাণ্ড সংস্করণ। ১৯২৬। জাড়াগ্রাম নিবাসী রায় পরিবার ছিল বীরসিংহের জমিদার। তাঁরা পরে রামজয়কে কিছু নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি দিতে চেয়েছিলেন। স্বাধীন-চেতা রামজয় তা গ্রহণ করেন নি।

৩. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বিদ্যাসাগর, ওরিয়েন্ট বুক হাউস। পৃ.৩৪০

৪. ইংল্যান্ডের বিখ্যাত *The Economist* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা- সম্পাদক (১৮৪৩) James Wilson ১৮৫৯ সালের শেষদিকে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সদস্য হয়ে এদেশে আসেন এবং ১৮৬০ প্রথম এদেশে আয়কর ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। প্রথমদিকে ব্যবস্থায় যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল তার সুযোগে নিচুতলার কর্মচারীরা ছোটো ব্যবসায়ীদের নিপীড়ন করত। জনসাধারণের অভিযোগ বিদ্যাসাগরের নিকট পৌঁছলে তিনি বাংলার গভর্নরের গোচরে এনে তদন্তের ব্যবস্থা করান।

৫. শম্ভুচন্দ্র, ঐ, পৃ: ১৮০

৬. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ, পৃ: ৩৩০। চণ্ডীচরণ বিশিষ্ট গ্রামবাসীদের নিকট এই উক্তিটি শুনেছিলেন।

৭. চণ্ডীচরণ: ঐ, পৃ: ৩৩০.

৮. শতবর্ষ স্মরণিকা: বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়, ১৯৯০. পৃ: ৮২

৯. শতবর্ষ স্মরণিকা: বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়, ১৯৯০, পৃ:১৫.

১০. মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এগার বর্ষীয়া বিধবা মনমোহিনীর বিবাহে বিদ্যাসাগর সম্মত হয়েও পরে মত প্রত্যাহার করে নেন। বিদ্যাসাগরের অমতে বিবাহ সম্পন্ন হওয়াতে বিদ্যাসাগর ক্ষুব্ধ চিত্তে গ্রাম ত্যাগ করেন।

১১. চিঠিটি ৩রা বৈশাখ ১২৯৮ তারিখে লেখা। শতবর্ষ স্মরণিকা, বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়। ১৯৯০।

১২. বয়স্ক শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনকে কোনও লেখক বাল্য-শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে অনুগ্রহ করার অজুহাত হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ ধারণা ভুল। কালীকান্ত নৈশবিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন না।

১৩. স্মরণিকা: বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়। ১৯৯০ পৃ: ১২-১৫।

১৪. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ঐ,পৃ : ৮
১৫. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐ পৃ : ৩৪৭-৩৪৮।
১৬. এই চিঠিটি মৃত্যুর মাত্র ২-৩ মাস আগে লেখা। মূল চিঠিটি বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। স্মরণিকা, ১৯৯০।
১৭. বিনয় ঘোষ মহাশয় চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। দয়েরহাট জায়গাটি মোটামুটি চিহ্নিত করা যায়।
১৮. শম্ভুচন্দ্র : ঐ পৃ: ৪৮
১৯. ,, ,,
২০. বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯৮৯ পৃ : ১২০
২১. বিপিনবিহারী গুপ্ত : ঐ, পৃ : ৭৪, চণ্ডীচরণ : ঐ, পৃ : ৯৫.
২২. বিপিনবিহারী গুপ্ত : ঐ, পৃ : ১১৭.
২৩. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ঐ, পৃ : ২১৫.
২৪. শ্রীম : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। তৃতীয় ভাগ, ১৩৮৪ পৃ : ২
২৫. উদ্ধৃতিগুলি 'জীবনস্মৃতি' থেকে সংগৃহীত।
২৬. শম্ভুচন্দ্র ; ঐ ; পৃ : ২২১।
২৭. অবশ্য ম্যানেজিং কমিটির ও সরকারের উদ্যোগের ফলে তিনি সম্পূর্ণ সফল হন নি। দ্রষ্টব্য : শতবর্ষ স্মরণিকা : বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়, ১৯৯০.
২৮. শম্ভুচন্দ্র ; ঐ, পৃ : ১৩৩-৩৪
২৯. History and Documents Relating to the Metropolitan Institution. Ed. Brajanath Dey & Gopal Shastri, 1909. Page-4. Subal Ch. Mitra : Iswar Chandra Vidyasagar. 1902, Chapter XXII.
৩০. শ্রীনাথ রায়ের নিকট টাকা কর্জের বিদ্যাসাগর স্বাক্ষরিত দলিলটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। সন্তোষকুমার অধিকারী রচিত ''বিদ্যাসাগরের শেষ ইচ্ছা'' নামক গ্রন্থে এর একটি ফটোকপি মুদ্রিত হয়েছে। শতবর্ষ স্মরণিকা—বিদ্যাসাগর কলেজ, ১৮৭২-১৯৭২. সুরেশচন্দ্র নিয়োগী এবং রমাকান্ত চক্রবর্তীর প্রবন্ধ দুটি উল্লেখযোগ্য।
৩১. সন্তোষকুমার অধিকারী : বিদ্যাসাগরের শেষ ইচ্ছা, পৃ : ৩৩
৩২. Subal Ch. Mitra. Ibid. P 453.
৩৩ C. E. Buckland : Bengal Under the Lieutenant Governors. Vol. I,
৩৪. শতবর্ষ স্মরণিকা : বিদ্যাসাগর কলেজ—১৮৭২-১৯৭২ ; সুরেশচন্দ্র নিয়োগী — মেট্রোপলিটান ইন্সিটিটিউশনের রহস্য ; পৃ : ৪০৮-৪০৯.
৩৫. তদেব, পৃ : ৪১৬.
৩৬. তদেব ; পৃ : ২৯
৩৭. কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : মেট্রোপলিটান কলেজ ও বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবন্ধটি ১৯২৬ সালে প্রথম প্রকাশিত এবং শতবর্ষ স্মরণিকায় পুনর্মুদ্রিত। পৃ : ২৬৬
৩৮. তদেব, পৃ : ১৫৫
৩৯. তদেব, পৃ : ১৬২. Deed of Compromise between the Trustees of the Metropolitan Institution and Pandit Narayan Chandra Vidyaratna, dated 28 Magh to 17 Chaitra 1300 B.S.
৪০ বিপিনবিহারী গুপ্ত, ঐ, পৃ : ১২৭
৪১. বিহারীলাল, ঐ, পৃ : ৩৬২.
৪২. শম্ভুচন্দ্র, ঐ, পৃ ১৯

Left Extremist Movement in West Bengal নামে বহু আলোচিত গ্রন্থটির লেখক ড. অমিয়কুমার সামন্ত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধের লেখক ড. সামন্ত সম্পাদনা করেছেন বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ের শতবর্ষ সংকলন, যেটি বিদ্যাসাগরের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় এবং মৌলিক তথ্যে সমৃদ্ধ।

# বাংলা পরিভাষার সূচনাকাল ও বিদ্যাসাগরের পরিভাষা চিন্তা

অশোক রায়

এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার পরিচয়ের সুবাদেই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। একের ধ্যান-ধারণা অপরকে পুষ্ট করে। কিন্তু দেখা যায়, এক ভাষার ধ্যান-ধারণা অপর ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। খাতক ভাষায় উপযুক্ত শব্দের অভাবে মহাজন ভাষার সুনির্দিষ্ট কিছু ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখনই দেখা দেয় পরিভাষা (Terminology) সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা। ভাষাবিজ্ঞানীর কথায় ''ভাষার নিজের ভাণ্ডারে যদি শব্দ না থাকে এবং বিদেশি বস্তু প্রতিষ্ঠান ধারণা ইত্যাদির নামটি যদি নানা কারণে খাতক ভাষায় গ্রহণ করবার অসুবিধা থাকে, তাহলে খাতক ভাষার মানুষকে যে কাজটি করতে হয় তাকে বলে পরিভাষা নির্মান।''[১] অর্থাৎ একটি ভিন্ন বা বিদেশী ভাষার নির্দিষ্ট ধারণাকে অপর ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে অনুরূপ অর্থবোধক যে-শব্দটি ঐ ভাষায় তৈরি করে নিতে হয়, তাকে পরিভাষা বলে। শব্দটিকে অবশ্যই বহুমাত্রিক না হয়ে দ্ব্যর্থহীন হতে হবে। ''সুনির্দিষ্ট ধারণাকে একটি মাত্র দ্ব্যর্থহীন শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা''-ই[২] পরিভাষা।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, প্রতিশব্দ ও পরিভাষার মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য না করা হলেও উভয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। বিদেশী পারিভাষিক শব্দের সমার্থক সহজবোধ্য বাংলা শব্দকে আমরা প্রতিশব্দ (Synonyms) বলতে পারি। কিন্তু ঐ একই অর্থ নির্দেশের জন্য সমগোত্রীয় আরও বিভিন্ন শব্দও তো প্রতিশব্দ। সেক্ষেত্রে ইংরেজি পরিভাষার সমার্থক শব্দসমূহের জন্য একটিমাত্র নির্দিষ্ট সহজবোধ্য শব্দই পরিভাষা (Terminology) হিসাবে গণ্য হতে পারে। অর্থাৎ অন্য একটি প্রতিশব্দ দিয়ে ঐ পরিভাষা (Term)-কে বোঝানো যাবে না। প্রতিশব্দ তৈরি হয় অভিধানিক কারণে আর পরিভাষা সুনির্দিষ্ট ধারণা সৃষ্টির প্রয়োজনে।

বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি-বিষয়ক যে-গ্রন্থগুলি প্রথম আমাদের হাতে আসে সে-দটি হল — *বিদ্যাহারাবলী* (১ম খণ্ড) ও *ব্রিটিশ দেশীয় বিবরণ সঙ্গ্রহ*। ফেলিক্স কেরীর (Felix Carey) লেখা। দুটি গ্রন্থই ছাপা হয়েছিল ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনারি প্রেস থেকে। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে 'স্কুল বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হলে বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ শুরু হয়। বিজ্ঞান-চর্চার সুযোগ প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফেলিক্স কেরী তাঁর ঐ বই দুটিতে সেই চেষ্টাই করেছিলেন। ফেলিক্স কেরীর গ্রন্থদুটি ছাড়া আর কোনও অকাট্য প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তাঁর পূর্বে আর কেউ এই চেষ্টা করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। তাই উনিশ শতকের প্রথমার্ধকে বাংলা পরিভাষার জন্মলগ্ন বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।[৩] গবেষক ড. নবেন্দু সেনের মতে — ''ফেলিক্স হারাবলিতে দীর্ঘ উনচল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী যে 'ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাভিধান' অর্থাৎ 'অ্যানাটমি'র বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন তা কেবল গ্রন্থটির একটি অংশ নয়, সমগ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও। বিজ্ঞান পুস্তক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার প্রথম প্রয়াস ফেলিক্স কেরীর এই গ্রন্থেই।''[৩] বাংলাদেশের গবেষক মনসুর মুসা বলেছেন — ''ফেলিক্স কেরী তাঁর *ব্রিটিশ দেশীয় বিবরণ সঙ্গ্রহ* গ্রন্থটিতে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই বাংলাভাষায় পরিভাষা সৃষ্টির প্রথম এবং উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। তিনি 'Glossary of

Words used in the History of England' শিরোনামায় গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত পরিভাষার বারো পৃষ্ঠাব্যাপী (৭-১৯) একটি দীর্ঘ তালিকা উপস্থিত করেছেন।"[৪]

কিন্তু ভিন্ন মতও আছে। ফেলিক্স কেরীর পূর্বে বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির কথা কেউ কেউ বলেছেন। ড. পবিত্র সরকার মনে করেন— "ভাষা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই পরিভাষা-সৃষ্টির প্রক্রিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে চলতে থাকে, ফলে চর্যা-গীতির সময় থেকেই বাংলা ভাষায় পরিভাষা সৃষ্টি ও গ্রহণ চলে এসেছে এবং মধ্যযুগে বৈষ্ণব ধর্ম-আন্দোলনের সূত্রে অজস্র পরিভাষা বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে।"[৫]

তবে বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির এই চাপান-উতরের মধ্যে একটা কথা স্পষ্ট যে, বাংলা পরিভাষার জন্মের চূড়ান্ত সীমা উনিশ শতক নয়। কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে একদা বাংলা পরিভাষার জন্ম হয়েছিল একথা মানা যায় না। বরং অনেক পূর্বেই সংস্কৃত- আরবি-ফারসি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার নিকট সম্বন্ধ ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে ফারসি যখন রাজভাষা (the state language), তখন বহু ফারসি শব্দ বাংলায় পরিভাষারূপে গৃহীত হয়েছিল। ফারসির মধ্য দিয়ে অনেক আরবি শব্দও বাংলায় সমরূপ মর্যাদা পেয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রেমপর্যায়ের নামকরণগুলির দিকে তাকালেও অবাক হতে হয়। পূর্বরাগ, অভিসার, প্রেমবৈচিত্র্য, কলহান্তরিতা, মান, মাথুর, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দগুলি তো দিব্যি বাংলা পরিভাষা।

সুতরাং ফেলিক্স কেরীর হাত দিয়ে বাংলা পরিভাষার জন্ম হয়েছিল একথা আর মানা যায় না। বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গ্রন্থ-প্রকাশের তাগিদে উনিশ শতকে বাংলা পরিভাষা তৈরি করার আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। সেই প্রয়োজনীয়তার ডাকে সাড়া দিয়েই ফেলিক্স কেরী বাংলা পরিভাষা তৈরির একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বুদ্ধিজীবীদের কাছে পরিভাষা রচনার একটা বাতাবরণ গড়ে তুলেছিলেন। তার পর থেকেই বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির সচেতন প্রয়াসটি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বাংলা গদ্যের যেমন জন্ম হয়েছিল চিঠিপত্র-দলিল দস্তাবেজের যুগে,[৬] উনিশ শতকে নয়, তেমনই বাংলা পরিভাষারও জন্ম চর্যাপদের যুগে বা আদি-মধ্য যুগে। উনিশ শতককে তার জন্মলগ্ন বলে ছাড়পত্র দেওয়া চলে না। বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগ যদি বাংলা পরিভাষার আঁতুড়ঘর হয় তবে উনিশ শতককে তার প্রকাশ্য বিচরণভূমি বলা যায়। উনিশ শতকে বহু পরিশ্রমে বাংলা পরিভাষা রচনার উদ্যোগটুকু গড়ে তোলার কৃতিত্ব অবশ্যই ফেলিক্স কেরীর।

ফেলিক্স কেরীর পর অনেকগুলো বছর বাংলা পরিভাষা নির্মাণের কোনও উদ্যম লক্ষ্য করা যায় নি। সমস্যা তো আগে থেকেই ছিল। এমন হতে পারে, বিজ্ঞান-বিষয়ক কোনও নতুন গ্রন্থ প্রকাশ না পাবার কারণেই বাংলা পরিভাষা গঠনের খুব একটা দরকার পড়ে নি। সে প্রয়োজনটাই আবার দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে যখন অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর *পদার্থবিদ্যা* (১৮৫৬) লিখছিলেন। অবশ্য অক্ষয়কুমারের বেশ কয়েক বছর পূর্বেই যাঁকে পরিভাষা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তিনি বিদ্যাসাগর। ফেলিক্স কেরীর ২৯ বছর পর বিদ্যাসাগর বাংলা পরিভাষা নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছিলেন।

*বাসুদেব চরিত* (১৮৪৬) বিদ্যাসাগরের লেখা প্রথম বাংলা বই। এই হিসাব ধরলে বিদ্যাসাগর প্রায় অর্ধ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছিলেন। তাঁর বহু-বিস্তৃত কর্মজীবনে খুব কম সময়ই তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্য-কর্মে আত্মনিয়োগ করতে। যে-স্বল্প সময়টুকু তিনি পেয়েছিলেন তার সবটাই প্রায় তাঁর ব্যয় হয়ে গিয়েছিল শিক্ষা-প্রসারের উদ্দেশ্যে গদ্যের প্রশস্ত রাজপথ তৈরির দিকে দৃষ্টি রাখতে গিয়ে। যাঁকে রাত জেগে তিনদিনে *সীতার বনবাস*(১৮৬০) লিখে শেষ করতে হয়, তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না ধীরে-সুস্থে সময় নিয়ে উজ্জ্বল সাহিত্যকর্ম উপহার দেওয়া। পরিভাষা সৃষ্টির কাজে বিদ্যাসাগরের এই সময়-স্বল্পতার দিকটা অবশ্যই বিবেচ্য।

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের সেপটেম্বর মাসে বিদ্যাসাগরের *জীবন চরিত* প্রকাশিত হয়। বইখানি ইংরেজির অনুবাদ। এই অনুবাদ করতে গিয়ে তাঁকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। এমন অনেক ইংরেজি শব্দ যেগুলির বাংলা তর্জমা করতে গেলেই গণ্ডগোল বাধে। মূলার্থের বৈকল্য ঘটে; সুনির্দিষ্ট ধারণাটি বদলে যায়। উপযুক্ত অর্থবোধক বাংলা শব্দের ছিল তখন এতই আকাল। এ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের নিজের কথায় — "বাঙ্গালায় ইংরেজীর অবিকল অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম্ম; ভাষাদ্বয়ের রীতি ও রচনাপ্রণালী পরস্পর নিতান্ত বিপরীত; এই নিমিত্ত, অনুবাদক অত্যন্ত সাবধান ও যত্নবান হইলেও অনুবাদিত গ্রন্থে রীতি বৈলক্ষণ্য, অর্থপ্রতীতির ব্যতিক্রম ও মূলার্থের বৈকল্য ঘটিয়া থাকে।"[৭]

সুতরাং পরিভাষা তৈরি করতে হবে। পরিভাষার অভাবে অনুবাদ অনেকাংশেই ব্যাহত হয়ে পড়বে; কোনও সুনির্দিষ্ট



ধারণারই একটা নিখুঁত ছবি পাঠকচিত্তে হুবহু ফুটে উঠবে না। কিন্তু কাজটা যে সহজ নয় বিদ্যাসাগর তা জানতেন। তথাপি ব্যস্তবাগীশ মানুষ হয়েও তিনি সরে থাকেন নি। তাঁর *জীবন চরিত* গ্রন্থের জন্য বেশ যত্ন নিয়েই পরিভাষাগুলি রচনা করেছিলেন তিনি। সংখ্যায় অল্প হলেও সেগুলির মূল্য কম নয়। বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির ইতিহাসে তাদের একটা গুরুত্ব আছে। ফেলিক্স কেরীর পর বাংলা পরিভাষা নির্মাণের অগ্রগতি বিদ্যাসাগরের হাতে বিস্ময়কর। তাঁর পরিভাষা নির্মাণ-কৌশল উত্তরসূরিদের কাছে আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের পরিভাষা-ভাবনার বিষয়গুলি বড়ো চমৎকার। বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, আইন, পুরাতত্ত্ব, ধর্ম সকল বিষয়েই তিনি কিছু কিছু পরিভাষা তৈরি করেছেন। তবে তাঁর বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংখ্যাই বেশি। তারপরেই তাঁর সাহিত্যিক পরিভাষা ও ভৌগোলিক পরিভাষার স্থান। বাকি বিষয়গুলি মিশ্র প্রকৃতির। যেমন—

| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রাপ্ত সংখ্যা | শতকরা হিসাব |
|---|---|---|---|
| ১ | বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরিভাষা | ১৮ | ২৪.৪% |
| ২ | সাহিত্য সংক্রান্ত পরিভাষা | ১৩ | ১৭.৫% |
| ৩ | ভূগোল সংক্রান্ত পরিভাষা | ১৩ | ১৭.৫% |
| ৪ | ইতিহাস সংক্রান্ত পরিভাষা | ৪ | ৫.৫% |
| ৫ | আইন সংক্রান্ত পরিভাষা | ৩ | ৪.১% |
| ৬ | ধর্ম সংক্রান্ত পরিভাষা | ২ | ৪.১% |
| ৭ | মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত পরিভাষা | ১ | ১.৩% |
| ৮ | পুরাতত্ত্ব সংক্রান্ত পরিভাষা | ১ | ১.৩% |
| ৯ | অর্থনীতি সংক্রান্ত পরিভাষা | ১ | ১.৩ |
| ১০ | অন্যান্য পরিভাষা | ১৮ | ২৪.৪% |
| | মোট | ৭৪ | ১০০% |

বিদ্যাসাগরের তৈরি পরিভাষাগুলিতে অনুবাদের একটা স্বতন্ত্র স্থান আছেই। ইংরেছি থেকে অনুবাদ করতে গিয়ে মূল শব্দের ধারণাটি বাংলাতেও যাতে যথাযথ অক্ষুণ্ণ থাকে সে- বিষয়ে তিনি অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। পড়ুয়া ছাত্রের নিষ্ঠা নিয়েই ইংরেজি শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ তৈরি করেছিলেন। নক্ষত্র বিদ্যা (astrology), মেরুরেখা (akis), উদ্ভিদবিদ্যা (botany), উপকূল (coast), বিষুবরেখা (equator), মনোবিজ্ঞান (metaphysics), ঔপনিবেশিক (colonial), কেন্দ্র (centre) প্রভৃতিতাঁর এমন অনুবাদমূলক পারিভাষিক শব্দ। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তিনি যেখানে আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে ভাবানুবাদকে পছন্দ করেছেন, সে-ক্ষেত্রে পরিভাষা নির্মাণের বেলায় ইংরেজি শব্দের মূল ধারণাটিকে (conception) যথাযথ বজায় রাখবার চেষ্টা করেছেন। যেমন, তিনি ইং 'astronomy' শব্দের পরিভাষা তৈরি করেছেন 'জ্যোতির্বিদ্যা'। 'Astronomy' শব্দের- 'nomy' কথাটা এসেছে গ্রিক শব্দ 'নোমস্' (nomos) থেকে। 'নোমস্' শব্দের অর্থ হল 'বিদ্যা' (law)। আবার গ্রিক 'এ্যাস্ট্রোন্' (astron) শব্দের অর্থ 'নক্ষত্র'। সুতরাং গ্রিক 'এ্যাস্ট্রোন' ও 'নোমস্' শব্দ দুটিই ইংরেজি 'এ্যাস্ট্রোনমি' শব্দের উৎস— যার অর্থ 'নক্ষত্রমণ্ডলীর বিজ্ঞান' (the science of the heavenly bodies)। বিদ্যাসাগরের নির্মিত 'জ্যোতির্বিদ্যা' শব্দটি ঐ মূলের নির্দিষ্ট অর্থকেই বহন করে।এই রূপ 'নক্ষত্রবিদ্যা' (astrology), 'উদ্ভিদবিদ্যা' (botany) প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দগুলি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। আপাতদৃষ্টিতে উক্ত পরিভাষা তিনটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে একটু খট্‌কা লাগে। কেননা, বিদ্যাসাগর astrology (logos) ও '-nomy' (nomos) কথা দুটিকে একটিমাত্র বাংলা প্রতিশব্দ 'বিদ্যা' দিয়ে বুঝিয়েছেন। বিচ্ছিন্ন করে দেখলে প্রথমটির অর্থ 'কথা' (word) এবং দ্বিতীয়টির অর্থ 'আইন' (law)। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখলে উক্ত পরিভাষা তিনটি ইংরেজি ভাষার সুনির্দিষ্ট ধারণাকে ক্ষুণ্ণ করেছে বলে মনে হয় না।

স্থিতিস্থাপক (elasticity), পান্থনিবাস (inn), উপগ্রহ satellite), কক্ষ (orbit), সুকুমার বিদ্যা (polite learning), গবেষণা (research) প্রভৃতি বিদ্যাসাগরের অনুবাদমূলক পরিভাষারই উদাহরণ। 'কক্ষ' পারিভাষিক শব্দটির নির্মাণ খুবই চমৎকার। বেশ সুপ্রয়োগ। তাছাড়া টঙ্কবিদ্যা (numismatics), দৃষ্টিবিজ্ঞান (optics) -এর মতো আরও কিছু এ-জাতীয় পারিভাষিক শব্দ বিদ্যাসাগর আমাদের উপহার দিয়েছেন। তবে 'দৃষ্টিবিজ্ঞান' পরিভাষাটির অর্থগৌরব কিছুটা ম্লান। 'দৃষ্টিবিজ্ঞানে'র পরিবর্তে 'আলোকবিজ্ঞান' হলে বেশি মানাত।

বেশ কিছু ব্যাখ্যানমূলক পরিভাষাও বিদ্যাসাগর তৈরি করেছেন। কীর্তিস্তম্ভ (monument), ধাতুবিদ্যা

(mineralogy), জ্যোতিষ্ক (heavenly bodies), রঙ্গভূমি (theatre), রাজবিপ্লব (revolution), দূরবীক্ষণ (telescope), স্বাত্মরক্ষা (fencing), কুসংস্কার (prejudice) প্রভৃতি এমন পরিভাষা। তবে 'কুসংস্কার' ব্যাখ্যামূলক হলেও তাকে ভাবানুবাদমূলকও বলা যায়।[৯] তাঁর তৈরি 'নীহারিকা' পরিভাষাটি একটি সুন্দর ব্যাখ্যামূলক পরিভাষা।[১০] শ্রুতি-সৌকর্যমূলক সুন্দর প্রয়োগ। এমনই আরও আছে— প্রবেশিকা (ticket), প্রস্তর ফলক (slate), ছায়াপথ (milky ways), অযথাভূত (perverted) প্রভৃতি। তাঁর আর একটি ব্যাখ্যামূলক পারিভাষিক শব্দ 'দেবালয়' ইং 'Church'-এর ছাঁচে নির্মিত হলেও তা চার্চের সুনির্দিষ্ট ধারণার দ্যোতক হয়ে ওঠে নি। 'চার্চ' যেমন মন্দির হতে পারে না তেমনি মন্দিরও চার্চ বা মসজিদ হতে পারে না। সেস্থলে 'উপাসনাগৃহ' বা 'গির্জা' বললেই ভালো হত।

'জেনোসাইড'-এর জায়গায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জনসাদন' বা 'জিয়োগ্রাফি'-র স্থলে 'স্কুল বুক সোসাইটি'-র 'জ্যাগ্রাফি'[১১] জাতীয় পরিভাষা তৈরির নজির বিদ্যাসাগরে অনুপস্থিত। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানমূলক পরিভাষা তৈরির প্রচেষ্টা বিদ্যাসাগর করেন নি।

পরিভাষা তৈরির একটা প্রধান অন্তরায় শব্দার্থের বহুমাত্রিকতা (polysemy)। মহাজন ভাষার শব্দটি বহুমাত্রিক হলে খাতক ভাষায় তার নির্দিষ্ট পরিভাষা তৈরি করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সচেতনতাও লক্ষ্য করা গেছে। বিদ্যাসাগরকেও এ ব্যাপারে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। যেমন ইংরেজি 'মিউজিয়ম' (muscum) শব্দটি নানা অর্থবোধক; তা কখনও মন্দির, গৃহ বা গ্রিকদেবী মিউজের আবাসভূমি, কখনও পাঠগৃহ, পণ্ডিতের আবাসস্থল, প্রতিষ্ঠান, আবার কখনও শিল্প-বিজ্ঞান-ইতিহাস ও শিক্ষা-বিষয়ক প্রদর্শশালা বা কৌতুক-সংগ্রহশালা।[১২]

বিদ্যাসাগর এই নানা-অর্থকতা (polysemy) নির্ভর ইংরেজি শব্দটির পরিভাষা করেছেন 'চিত্রশালিকা'। তেমনই ইংরেজি 'মেটাফিজিক্স' শব্দটি বহু অর্থবোধক— সাধারণ দর্শনশাস্ত্র, প্রকৃতি ও মনন সম্বন্ধীয় প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ-বিজ্ঞান, গুহ্যবিদ্যা বা অপরসায়ন, অতিপ্রাকৃত, ইন্দ্রজাল সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি। কেবলমাত্র 'মনোবিজ্ঞান' প্রতিশব্দটির সাহায্যে বিদ্যাসাগর 'মেটাফিজিক্স'-এর মূল ধারণাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাঁর এই শ্রেণীর পারিভাষিক শব্দ— ধাতুবিদ্যা (mineralogy), শব্দ (index), কুলাদর্শ (heraldry), অংশ বা অঙ্কাংশ (degree), কীর্তিস্তম্ভ (monument) প্রভৃতি। তবে এ জাতীয় পরিভাষা সৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের সাফল্য সকল ক্ষেত্রে সমান নয়। 'চিত্রশালিকা' (muscum) পরিভাষাটি তার একটি উদাহরণ। 'মিউজিয়ম' তো শুধু ছবির সংগ্রহশালা নয়, আরও অনেক কিছুর সংগ্রহশালা।

পরিভাষা নির্মাণে শ্রুতি-মাধুর্যের কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। শব্দমাধুর্যই ভাষাকে বেশি পরিচিতি দেয়। পারিভাষিক শব্দ যদি শ্রুতি-মধুর হয়, তার ব্যবহার (use) বাড়ে। কালের বিচারে তা স্থায়ী হয়। শ্রুতিকটু পরিভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেরও বরাবরের আপত্তি ছিল। বিদ্যাসাগরও এই দিকটা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর নীহারিকা (nebulae), ছায়াপথ (milky way) জ্যোতিষ্ক (heavenly bodies), ঔপনিবেশিক (colonial), উদ্ভিদবিদ্যা (botany), পান্থনিবাস (inn), শতাব্দী (century), দূরবীক্ষণ (telescope), বিশুদ্ধ গণিত (pure mathematics), বিশ্ববিদ্যালয় (university), স্থিতিস্থাপক (elasticity), সুকুমার বিদ্যা (polite learning), ব্যবহার সংহিতা (law) প্রভৃতি পরিভাষাগুলি আমাদের শ্রুতিকে আরাম দেয়। এদের অনেকগুলিই কালের বিচারে টিকে গেছে।

পরিভাষার যোগ্যতা ও গ্রহণীয়তার প্রশ্নে[১৩] তার সহজবোধ্যতা ও সরলতা নিশ্চয়ই একটা বড়ো মাপকাঠি। এ দুটি বৈশিষ্ট্যই পরিভাষাকে সকল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এই কারণেই 'aesthetics'—এর পরিভাষা নন্দনতত্ত্ব, রম্যশাস্ত্র বা কান্তিবিদ্যা শ্রুতি-সুখকর হলেও অধিকাংশ মানুষের তা পছন্দ নয়, সৌন্দর্যতত্ত্বই তাদের বেশি প্রিয়। স্বীকার করতে হবে, বিদ্যাসাগরের পরিভাষাগুলি সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে নি। ধাতু-প্রত্যয় যুক্ত তৎসম শব্দের বাহুল্য ও সমাসবদ্ধ পদের জটিলতার কারণেই সেগুলি সাধারণের কাছে তেমন সহজবোধ্য নয়। আধিশ্রয়নিক ব্যবধি (focal distance), তূর্যাচার্য (music), তূর্যাজীব বা তূর্যবাদ্য (musician), স্বাত্মরক্ষা (fencing), শঙ্কু (index), শঙ্কুপট্ট (dial plate), অযথাভূত (perverted), বিজ্ঞাপনী (report), চরিতাখ্যায়ক (biographer), দ্বিপাদপ্রমিত বা পাদ্মপাদিক (foot) প্রভৃতি পরিভাষাগুলির অর্থ স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারে না। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর উদ্ভিদবিদ্যা, উপকূল, ঔপনিবেশিক, কুসংস্কার, গবেষণা,



ছায়াপথ, জ্যোতিষ্ক, পান্থনিবাস প্রভৃতির মতো তৎসম শব্দজাত অনেক পরিভাষাই সাধারণের বোধগম্য।

এই সঙ্গে আসে সংক্ষিপ্ততার দাবি। পরিভাষার শারীরিক কৃশতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুবিধা নিশ্চয়ই। কেন্দ্রাভিসারিনী (centripetal) এবং কেন্দ্রাপগামিনী (centrifugal)-র পরিবর্তে কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ যেমন।[১৪] অপেক্ষাকৃত কম সিলেব্‌ল-এর তৈরি পরিভাষা সহজ-উচ্চারণযোগ্য ও আটপৌরে ভাবে ব্যবহারযোগ্য হতে বাধ্য। বিদ্যাসাগরের তৈরি পরিভাষাগুলির মধ্যে দুই সিলেব্‌ল-এর পরিভাষা কক্ষ (orbit), অংশ (degree), কেন্দ্র (centre), শঙ্কু (index), যেমন আছে, তেমনই পাঁচ-সাত-দশ সিলেব্‌ল-এর পরিভাষা রাজবিপ্লব (revolution), নক্ষত্রবিদ্যা (astrology), ব্যবহারসংহিতা (law), প্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ (reflecting telescope), ইত্যাদিও আছে। তাঁর চার, পাঁচ ও ছয় সিলেব্‌ল-এর পরিভাষাই বেশি।

বাংলা পরিভাষা তৈরির একেবারে গোড়ার দিকে অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দই গৃহীত হয়েছিল সংস্কৃত থেকে। বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলনের সময় শ্রীরূপ গোস্বামীর লেখা *উজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থের অনেক সংস্কৃত 'টার্ম' সরাসরি বাংলা পরিভাষার মর্যাদা পেয়েছিল। মধ্যযুগে যে বাংলা পরিভাষার জগতে ফারসি এবং আরবি শব্দেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সে-কথা আগেই বলেছি। উনিশ শতকে বাংলা পরিভাষার বিকাশ-পর্বে তৎসমই ছিল বাংলা পরিভাষার উৎস। ফেলিক্স ফেরীর পরিভাষাগুলিও তৎসম থেকে আহরিত। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও পরিভাষা রচনায় তৎসম শব্দের প্রতি আনুকূল্য দেখিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের সময়ে সাহিত্যের পরিবেশ যখন অনুবাদ-নির্ভর হয়ে একটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে তখন সেখানে বিদেশী ভাষা থেকে বাংলা পরিভাষা গঠনে সংস্কৃতই শব্দের যোগান দিয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত বিদ্যাসাগরও স্বাভাবিক কারণেই বাংলা পরিভাষা তৈরি করতে গিয়ে তৎসমকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পারিভাষিক শব্দ আবিষ্ক্রিয়া (discovery), কুসংস্কার (prejudice), নীহারিকা (nebulae),জাতীয় বিধান (national law),পরিপ্রেক্ষিত (perspective), পর্যবেক্ষণ (observation), প্রতিভা (genius), প্রতিপোষক (patron), স্থিতিস্থাপক (elasticity), বিধানশাস্ত্র (law)প্রভৃতি যেমন আছে, তেমনই আছে গণিত (mathematics), ঔপনিবেশিক (colonial), চিত্রশালিকা (muscum), জ্যোতিষ্ক (heavenly bodies), বঙ্কুর (rough), মণ্ডল (state), বিজ্ঞাপনী (report), শতাব্দী (century) প্রভৃতি সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত শব্দও।

অনেক সময় এইভাবে পরিভাষা তৈরি করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। কৃৎ-তদ্ধিত প্রত্যয় যোগের (derivational morphology) সমস্যা শব্দটির ব্যাকরণগত সম্ভাবনার দিক থেকে পরিভাষা-নির্মাণকারীকে ভীষণ বিপাকে ফেলে।[১৫] শব্দটির বিশেষ্য ও বিশেষণ একরকম (homonym) হলে প্রয়োগে গণ্ডগোল বাধে। উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ 'ভূমা' শব্দটির উল্লেখ করেছেন। ইংরেজি 'সাবলাইম ও 'সাব্‌লিমিটি'-র অনুদিত বাংলা প্রতিশব্দ 'ভূমা'-র বিশেষ্য ও বিশেষণ সমরূপ (homonym)। অবশ্য বিদ্যাসাগরে এ-ধরনের সমস্যা কম। তবে একেবারেই যে নেই তা নয়। অযথাভূত (perverted) ও চিত্রশালিকা (muscum) পরিভাষা দুটির প্রথমটি বিশেষণ এবং পরেরটি বিশেষ্য। কিন্তু শব্দ দুটি থেকে যথাক্রমে বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠন করতে গেলেই অসুবিধায় পড়তে হয়। ব্যাকরণগত সম্ভাবনার চিন্তাটি মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়।

তৎসম শব্দের মতো বিদ্যাসাগরের সমাস-আসক্তিও লক্ষ্য করার মতো। তাঁর প্রণীত পরিভাষার অর্ধেকের বেশিই সমাসবদ্ধ পদের পরিভাষা। যেমন— টঙ্কবিজ্ঞান (numismatics), মনোবিজ্ঞান (metaphysics), কীর্তিস্তম্ভ (monument) পান্থনিবাস (inn), কুলাদর্শ (heraldry), ছায়াপথ (Milky way), বিশ্ববিদ্যালয় (university), পাদ্মপাদিক (foot), দেবালয় (church), দূরবীক্ষণ (telescope), রাজবিপ্লব (revolution), রঙ্গভূমি (theatre) প্রভৃতি।

বিদ্যাসাগর আরবি-ফারসি দিয়ে কোনও পরিভাষা তৈরির চেষ্টা করেন নি। তবে খটোমটো তৎসম শব্দ দিয়ে কিছু পরিভাষা তৈরি করেছিলেন—আধিশ্রয়নিক ব্যবধি (focal distance), তূর্যাচার্য (music), তূর্যাজীব (musician), অযথাভূত (perverted), প্রতিপোষক (patron), তুলামান (libration), দ্বিপাদপ্রমিত (foot) ইত্যাদি। আবার চরণাবরণ-এর (Stocking—মোজা) মতো এক-আধখানা লঘু শব্দ বিদ্যাসাগরের কুলীন পরিভাষা পংক্তিতে ঠাঁই পেয়েছে। ঐ আসনে শিলিং (Shilling)-এরও দেখা মিলবে।

পরিভাষা নির্মাণে বিদ্যাসাগর অস্বচ্ছ (opaque words) ও স্বচ্ছ (transparent words) দুই ধরনের শব্দই ব্যবহার করেছেন। স্বাস্থ্যরক্ষা (fencing), দৃষ্টিবিজ্ঞান (optics), ধাতুবিদ্যা (mineralogy), চরণাবরণ (stocking), দূরবীক্ষণ (telescope), অনুবীক্ষণ (microscope), কীর্তিস্তম্ভ (mounment), জলোচ্ছ্বাস (tide), চায়াপথ (milky way), চরিতাখ্যায়ক (biographer), প্রভৃতি পরিভাষাগুলি তাঁর স্বচ্ছ শব্দের উদাহরণ। এই ধরনের শব্দ ব্যবহারে বিদ্যাসাগরের একটা পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যায়।[১৬] তাঁর নির্মিত অধিকাংশ পরিভাষাই স্বচ্ছ শব্দের। তুলনায় তাঁর অস্বচ্ছ শব্দের তৈরি পরিভাষার সংখ্যা খুবই কম। যেমন—মোজা (stocking), মণ্ডল (state), শঙ্কু (index), কক্ষ (orbit) ইত্যাদি।

উনিশ শতকে পরিভাষা সৃষ্টির সচেতন যুগে বিদ্যাসাগরের পরিভাষা সৃষ্টির সাফল্য নিঃসন্দেহে ঈর্ষার বস্তু। তবে দু-একটি ক্ষেত্রে তাঁর পরিভাষা সৃষ্টিতে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, astrology-র পরিভাষা 'নক্ষত্র-বিদ্যা' শব্দটিতে। এই পরিভাষাটি গ্রিক ভাষার ব্যাকরণ মেনে তৈরি হলেও (astron=নক্ষত্র (logy+logos বিদ্যা) ব্যঞ্জনাধর্মী হয় নি। Astrology বলতে বোঝায় ব্যবহারিক জ্যোতির্বিদ্যা, যার অর্থ এখন সীমিত হয়ে আছে মানুষ এবং জাগতিক ঘটনাসমূহের ওপর প্রভাবশীল জ্যোতির্মণ্ডলের শক্তি সম্বন্ধীয় যে কলা বা বিজ্ঞান তার মধ্যে।[১৭] তাই 'astrology-র পরিভাষা হিসাবে 'নক্ষত্রবিদ্যা'-র স্থলে 'জ্যোতিষশাস্ত্র' হলে বেশি মানাত। ইংরেজি entrance-এর পরিবর্তে বিদ্যাসাগরের 'প্রবেশিকা' পারিভাষিক শব্দটির ব্যবহারও মানানসই হয় নি।

আসলে পরিভাষা চিন্তায় যতটা সময় ও নিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল তা বিদ্যাসাগর দিতে পারেন নি। তাঁর মতো শত-কর্মব্যস্ত মানুষের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। এ সত্ত্বেও তাঁর পরিভাষা চিন্তার অগ্রসরতা আশ্চর্য রকমের। তাঁর পরিভাষা ভাবনা উত্তরকালকেও প্রভাবিত করেছিল। তাঁর উদ্ভাবিত বেশ কিছু পরিভাষা, যেমন—অনুবীক্ষণ (microspcope), উদ্ভিদবিদ্যা (botany), বিশুদ্ধ গণিত (Pure mathematics), বিষুব রেখা (equator), ব্যবহারশাস্ত্র (law), কক্ষ (orbit), ছায়াপথ (milky way), দূরবীক্ষণ (telescope), ঔপনিবেশিক (colonial), উপকূল (coast), কুসংস্কার (prejudice), বন্ধুর (Rough), নীহারিকা (nebulae) প্রভৃতি এখনও বহুল ব্যবহৃত ও মূল্যবান। তাঁর নির্মিত কয়েকটি পরিভাষার সঙ্গে পরবর্তী কালের ভাষাশিল্পীদের দেওয়া পরিভাষার মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। তাঁর স্থিতিস্থাপক (elasticity)-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'স্থিতিস্থাপকতা'-র মিল আছে। পরিভাষা রচনায় বিদ্যাসাগরের সীমাবদ্ধতা থাকলেও চিন্তার দিক থেকে তিনি ছিলেন অগ্রসর। তাঁর পরিভাষা চর্চা আকস্মিক ও বিস্ময়কর।

---

*উল্লেখপঞ্জী*

১, ২, ৫, ১১, ১৩, এবং ১৫ সংখ্যা চিহ্নিত উদ্ধৃতিগুলি গ্রহণ করা হয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার ৯ই মে ১৯৮৬, বিশেষ সংখ্যায় ড. পবিত্র সরকার লিখিত 'পরিভাষা প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্র পরিভাষা' নামক প্রবন্ধ থেকে। সব উদ্ধৃতিই পৃ সংখ্যা ১০২৫ এবং ১০২৬ থেকে নেওয়া।

৩. ড. নবেন্দু সেন, 'অক্ষয় কুমার: পরিভাষা' গদ্যশিল্পী অক্ষয় কুমার দত্ত, ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিজ্ঞাসা, ১৯৭১, পৃঃ ১৬৭

৪. মনসুর মুসা, 'ফেলিক্স কেরী'—বাঙলা পরিভাষা: ইতিহাস ও সমস্যা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙলাদেশ, ১৯৮৪, পৃঃ ১৪-১৫

৬. ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলা গদ্যের জন্ম হয়েছিল। "১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দে লেখা কুচবিহাররাজ নরনারায়ণের একখানি চিঠিই হচ্ছে প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত।" —ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা গদ্যের আদিপর্ব' —বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন, সংস্করণ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২৮০ চিঠির নমুনা: "তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।" (কুচবিহাররাজ নরনারায়ণের একটি চিঠির অংশ বিশেষ থেকে উদ্ধৃত)

৭. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রথম বারের বিজ্ঞাপন, 'জীবন চরিত' সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ২৭-এ ভাদ্র, ১৭৭১ শকাব্দ, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, সম্পাদনা: তীর্থপতি দত্ত, তুলি-কলম, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭, পৃঃ ১৩৬৭

৮. দ্রষ্টব্য, Chambers Twentieth Century Dictionary, Edited A.M. Macdonald, Allied Pub. Reprinted 1977, Page 78-79.

৯. বিদ্যাসাগর 'ভ্রান্ত বা দুষ্ট ধারণা, প্রথা বা ধর্ম বিশ্বাস'কে (রাজশেখর বসু, চলন্তিকা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, সং ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৫২) 'কুসংস্কার', বলেছেন। তুলনীয়, "A judgement or opinion formed before hand or without due examination: A prejudgement".— Chambers Twentieth Century Dictionary Edited by A. M. Macdonald, Allied Pub., Reprinted 1977, Page 880.

১০. Nebulae হল 'আকাশে দৃশ্যমান বহুদূরস্থ নীহারপুঞ্জ সদৃশ বাষ্পীয় পদার্থ বা নক্ষত্র সমষ্টি, (রাজশেখর বসু, চলন্তিকা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, সং ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৮৮)। তুলনীয়, "Mistry appearance in the heavens produced either by a group of stars too distance to be sun singly or by diffused gaseous matter."—Chambers Twentieth Dictionary, Edited by A.M. Macdonald, Allied Pub; Reprinted 1977, Page 880.



১২. "A temple, home, or resort of the houses: a place of study: a resort of the learned: an institution of repository for the collection, exhibition, and study of objects of artistic, scientific, historic, or educational interest; an art gallery (U.S.); a collection of curiosities."—Chambers Twentieth Century Dictionary, Edited by A.M. Macdonald, Allied Pub., Reprinted 1977, Page 868.

১৪. 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' সং ১৩৯১ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী, পৃঃ ২১০

১৬. দ্রষ্টব্য, অপূর্বকুমার রায়, 'বিদ্যাসাগর গোষ্ঠীর শব্দসজ্জা', —বাঙলা গদ্যচর্চা: বিদ্যাসাগর গোষ্ঠী, জিজ্ঞাসা, সং ১ম, ১৯৮২, পৃঃ ১০৪

১৭. Astrology বলতে বোঝায় ব্যবহারিক জ্যোতির্বিদ্যা 'practical astronomy: now almost confined to the once-supposed art or science of the influence of the stars on human and terrestial affairs (Judicial astrology; Gr. logos, discourse) —Chambers Twentieth Century dictionary, Edited by A. M. Macdonald, Allied Pub., Reprinted 1977, Page 79.

১৮. অপূর্বকুমার রায়, 'বিদ্যাসাগর গোষ্ঠীর শব্দসজ্জা' বাঙলা গদ্যচর্চা: বিদ্যাসাগর গোষ্ঠী, জিজ্ঞাসা, সং ১ম, ১৯৮২, পৃঃ ৯৯

# জাত বৈষ্ণব কথা

অজিত দাস

*(পূর্ব প্রকাশিতের পর)*

হরিভক্তি বিলাস' ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্র প্রভাবিত। কিন্তু বৈষ্ণব স্মৃতি গ্রন্থ। তাই ভিন্নতা এসেছে। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকলেই শূদ্র। শূদ্রের অধিকার নেই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার। শূদ্র হচ্ছে ব্রাহ্মণের সেবক মাত্র। নারীরও সেই ভূমিকা। বৈষ্ণব স্মৃতি গ্রন্থে সে কঠোরতা নেই। এখানেও নির্দেশ হচ্ছে বর্ণাশ্রম মানতে হবে। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব মানতে হবে। শূদ্র শূদ্রই থাকবে। কিন্তু শূদ্র এবং নারী এখানে ব্রাহ্মণের সেবকমাত্র নয়। তারাও ধর্মচর্চা, শাস্ত্রচর্চা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার অধিকারী। বৈষ্ণবতায় পুরোহিত নেই, গুরু আছে। এখানে ব্রাহ্মণ যেমন মন্ত্র দীক্ষাদাতা গুরু হতে পারবে, তেমনিই শূদ্র এবং নারীও গুরু হবার অধিকারী।

বাঙলায় বৈষ্ণব আন্দোলনের ফলেই ব্রাহ্মণের ধর্মীয় একাধিপত্যে চিড় খেল। তাই এই আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, নিছক ভক্তি প্রচার উদ্দেশ্যে—এ কথার গুরুত্ব হ্রাস পায়।

এই অধিকার লাভের ফলে বর্ণাশ্রমী হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত থেকেও অদ্বৈত-পত্নী সীতা দেবী এবং নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবী বৈষ্ণব গুরু হয়ে শিষ্য-পরিবৃতা হলেন। মজার কথা এই যে তাঁরা আবার রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজভুক্তও থাকলেন। ফলে বৈষ্ণব আন্দোলনের গুরুত্ব বা মাহাত্ম্য কমল। ইতিহাসের দৃষ্টিতে বৈষ্ণবতা হয়ে দাঁড়াল সুযোগ লাভের হাতিয়ার। তবু এই আন্দোলন সেদিন হয়ে উঠেছিল সামাজিক মুক্তি যজ্ঞ।

শূদ্র পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়ায় কায়স্থরা ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাই পাঠান যুগে দেখা যায় কায়স্থ ভূস্বামীরা অধিকাংশই বৈষ্ণব। মেদিনীপুরে শ্যামানন্দর আন্দোলনের সময় ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলের কায়স্থরা তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব হলে গৌরব বোধ করেন। শূদ্রতা থেকে মুক্তি মিলল বলে। ধর্মচর্চায় আর বাধা থাকল না। এই বাধার সম্মুখীন স্বামী বিবেকানন্দকেও হতে হয়েছিল দাক্ষিণাত্যে, ধর্মসভায়। প্রশ্ন উঠেছিল শূদ্রের অধিকার কোথায় শাস্ত্র ব্যাখ্যা করার? বিবেকানন্দকে বলতে হয়েছিল যে তিনি কায়স্থ। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়। বাঙলার বৈষ্ণব কায়স্থরা ধর্মীয় গুরুর অধিকার পেয়েছেন অনেক আগেই। অবমানিতের জীবন থেকে মুক্তি চায় সকলেই। বৈষ্ণবতায় এসে ধর্মচর্চা বা ধর্মীয় গুরু হবার অধিকার মিলল। কিন্তু বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা যে ভেদ চিহ্ই হয়ে থাকল? মেদিনীপুরের শ্যামানন্দী বৈষ্ণবরা তাই দাবি জানাতে থাকলেন ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য।

> শ্যামানন্দী বৈষ্ণবরা এই তত্ত্ব প্রচার করতে থাকলেন যে, বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে পার্থক্য বিচার করা যায় না। এই তত্ত্ব সম্পর্কে উনিশ শতকের কলকাতাতেও বিচার হয়েছে এবং পরে তা নিয়ে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও দলাদলি শুরু হয়। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের সমতার তত্ত্ব প্রচারিত হওয়ার ফলে বৈষ্ণবত্বের মধ্যে সংস্কার সহ ব্রাহ্মণত্বের সংক্রাম অনিবার্য হয়ে উঠল। ফলতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা অত্যন্ত রক্ষণশীল হয়ে পড়লেন।[১১]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হলেন না অনেক বৈষ্ণবগুরু। অনেকে দলে ঢুকেও দল থেকে বেরিয়ে এলেন, মতভেদ-এর কারণে। হরিভক্তি বিলাসকে অনুসরণ করতে অনীহা। অন্য কারণও অনেকে দেখিয়েছেন। সেটা অর্থনৈতিক। গুরুগিরি তখন অর্থকরী লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত। যে কেউ বৈষ্ণবগুরু হতে পারে। ফলে গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র বৈষ্ণবগুরুর উদ্ভব ঘটল। স্ব স্ব প্রধান।

গোড়ীয় বৈষ্ণবগুরুরা সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়তে চেয়েছিলেন। ফল বিপরীত হয়ে গেল। সাধারণ মানুষ চৈতন্যাশ্রিত হবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। হরি বললেই মুক্তি মিলবে, সামাজিক মানমর্যাদা মিলবে, মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি মিলবে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় জাতপাত, উচ্চনীচ, অধিকারী; অনধিকারী বিচারে



ফিরে গেল। তারই সুযোগে গড়ে উঠল বৈষ্ণবীয় দল উপদল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় আর নির্বিকার থাকতে পারলেন না। দল উপদলের সফলতা দেখে তাঁরা বিচলিত। ক্ষিপ্ত ভৎসনাকারীতে পরিণত। আঠারো শতকে নবদ্বীপে থাকতেন বৈষ্ণব উপাসক তোতারাম। ইঁনিও দক্ষিণদেশীয় দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ। তিনি এই সব উপসম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখে সক্ষোভে ঘোষণা করেছিলেন :

> আউল বাউল কতভিজা নেতা দরবেশ সাঁই।
> সহজিয়া সখী ভাবকী স্মার্ত জাত গোঁসাই।।
> অতিবড়ী চূড়াধারী গৌরাঙ্গ নাগরী।
> তোতা কহে এই তেরোর সঙ্গ না করি।।[১২]

'গৌরাঙ্গ নাগরী'দেরও অচ্ছুৎ বলে ত্যাজ্য করা হয়েছে। অথচ এটি চৈতন্য পার্ষদ নরহরি ঠাকুর প্রবর্তিত সম্প্রদায় এবং সমাজমান্য। তোতারামের ধিক্কারে উপসম্প্রদায়গুলির কিছু যায় আসে নি। তাদের সংখ্যা কমে নি, বেড়েছে। তা দেখে তোতারাম এবার খেদোক্তি করেছেন :

> পূর্ব কালে তেরো ছিল অপসম্প্রদায়।
> তিন তেরো বাড়ল এবে ধর্ম রাখা দায়।[১৩]

তেরো থেকে বেড়ে উনচল্লিশটি উপসম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে গেল।

নবদ্বীপে গৌর নিতাই মানুষের দরজায় ঘুরে ভক্তি প্রচার করেছেন। সর্বস্তরের মানুষকে নিজেদের দলভুক্ত করতে চেয়েছেন। তোতারাম নিজের তখতে বসে সকলকে বলেছেন দূর হটো—অনাচারী।

এ প্রসঙ্গে গবেষক অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর মন্তব্য :

> আঠার শতকের মাঝামাঝি গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে অসহিষ্ণুতা ও ছুৎমার্গ এতটাই প্রবল হয়েছিল এবং সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি এমন জাঁকিয়ে বসেছিল যে আপন ধর্ম সমাজের অন্তর্গত মানুষদেরই তাঁরা অস্পৃশ্য করতে চেয়েছিল মূল ধারা থেকে।[১৪]

তিনি আরও বলেছেন :

> অবক্ষয়িত ও সংরক্ষণপন্থী মৌল বৈষ্ণব ধর্মের অনুদারতাই গৌণ সম্প্রদায়গুলির উদ্‌ভবের প্রধান কারণ।[১৫]

তোতারাম নবদ্বীপের তাঁর সাধনক্ষেত্র গড়েছিলেন। বড়ো আখড়া তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। এই আখড়া স্থাপনের জন্য নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে ছ-বিঘা নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। কোনও বৈষ্ণবকে নদীয়ার রাজা জমিদান করেছেন আখড়া করতে এ সংবাদ মনে চমক লাগায় এবং সন্দেহ জাগায়। কারণ :

> এই রাজ পরিবার চৈতন্যের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ করিতেন।[১৬]

তোতারাম তাহলে চৈতন্যবিমুখ রাধাকৃষ্ণ উপাসক বৈষ্ণব ছিলেন। তাই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। একথা বলার কারণ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রর ভয়ে নবদ্বীপের চৈতন্যোপাসকরা একবার তাঁদের চৈতন্য-বিগ্রহকে ছ-মাস অবধি মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। মহারাজা গিরীশচন্দ্রর কাল অবধি এ অবস্থা চলেছিল।

> নবদ্বীপের রাজা এবং পণ্ডিতগণ
> চৈতন্যকে অবতার মধ্যে গণ্য করেন নাই।[১৭]

বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে শাক্ত রাস প্রবর্তন করেছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। অন্যদিকে অদ্ভুত সব ছড়া সৃষ্টি হয়েছে।

> নবদ্বীপের বাঁধা ঘাটে
> শ্রী চৈতন্য পাঁঠা কাটে
> নিতাই ধরেছে দুটি ঠ্যাং
> বোল হরি বোল - বাদ্যি বাজে
> ড্যাডাং- ড্যাডাং- ড্যাং।।

চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব আন্দোলনের স্বরূপই প্রকাশিত এর ভিতর দিয়ে।

।।ছয়।।

তোতারামের উল্লেখিত তেরোটা অচ্ছুৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতর জাত গোঁসাই সম্প্রদায় একটি। এটাই জাত বৈষ্ণব সম্প্রদায়। আখড়াধারী বাবাজী এবং তার শিষ্য সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল কবে এবং কীভাবে? অনেকের মতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের বাইরে অজানা বৈষ্ণবরা অস্পৃশ্য অন্ত্যজ জাতিসমূহের মধ্যে বাগ্দী ডোম বাউরিদের বৈষ্ণব করেছিল। তা থেকেই জাত বৈষ্ণব সমাজের উদ্ভব। বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জাত বৈষ্ণব সমাজ বর্ণাশ্রমী নয়। যে কোনও বর্ণের মানুষ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে জাত বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশ করতে পারে। ত্যাগ করতে হবে তাকে পূর্বাশ্রমের সকল পরিচয় — নাম, পদবি, গোত্র ইত্যাদি। পরিচয় হবে বৈষ্ণব। তার বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হবে জাত বৈষ্ণব সমাজের মধ্যেই। তারা হবে চৈতন্যোপাসক। তারা হতে পারে গৃহী অথবা সংসারত্যাগী বৈরাগী।

কার বা কাদের নেতৃত্বে এই সমাজের উদ্ভব— আজ তার স্পষ্ট উত্তর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গর স্বপ্ন যেমন ছিল বলে আমরা মনে করি, সেই স্বপ্নই যেন

রূপ নিয়েছে এখানে। মুসলমান এবং ব্রিস্টান সমাজের বাইরে হিন্দু সমাজভুক্ত এমন দ্বিতীয় কোনও সম্প্রদায় আছে বলে মনে হয় না। থাকলেও আমার জানা নেই। বর্ণাশ্রম সম্পূর্ণ অস্বীকৃত এবং যে-কেউ এই সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারেন। কিন্তু কবে থেকে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব? সাধারণভাবে বলা হচ্ছে 'হরিভক্তিবিলাস' বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সমাজে গৃহীত হবার পর জাত বৈষ্ণব সমাজের জন্ম। অনুন্নত, অস্পৃশ্য সমাজের মানুষ জাতে উঠবার জন্য অর্থাৎ সামাজিক অবস্থান্তর ঘটাবার জন্যই চৈতন্যাশ্রয়ী হয়ে পূর্ব পরিচয়কে মুছে দিয়ে এই সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে। এদের এই সুযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে গ্রাম্য মূর্খ বিকৃত রুচির বাবাজীরা। এই বাবাজীরা ছিল কায়স্থ অথবা জলচল নবশাক সমাজের মানুষ। গুরুগিরি ব্যবসায় অর্থকরী লাভের প্রত্যাশায় তারা এ কাজ করেছে।

কিন্তু কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। কোনও কেন্দ্রীয় সংগঠন ছাড়াই বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগত চেষ্টায় মূর্খ গ্রাম্য বাবাজীরা দেশজুড়ে এতো বড়ো এবং সুশৃংখল একটি সম্প্রদায় গড়ে তুলল কীভাবে? পরের প্রশ্ন, জাত বৈষ্ণব সমাজ বঙ্গদেশে 'হরিভক্তি বিলাস' গৃহীত হবার পরে উদ্ভূত — একথা কীভাবে বলা যায়? তৃতীয় প্রশ্ন: জাত বৈষ্ণব সমাজ নিছক অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষ নিয়ে গঠিত—তারও কি তথ্যগত নির্দিষ্ট প্রমাণ আছে? তেমন সমীক্ষা কি হয়েছে?

বীরভদ্র যে বহু নেড়ানেড়ীকে বৈষ্ণব করেছিলেন, তারা কোন সমাজে আশ্রয় নিয়েছিল? শ্যামানন্দ যে মুসলমানদের বৈষ্ণব করেছিলেন তাঁরা কি হরিদাসের মতো জীবনযাপন করেছিলেন? গৃহী থাকলে কোন সমাজভুক্ত হয়েছিলেন? হাড়ি আদিবাসী এবং হিন্দু সমাজেরও বহুজন বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা কোন পরিচয়ভুক্ত হয়েছিলেন? গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার আগে বৈষ্ণবতার উদার হাওয়াই বয়ে চলেছিল। জাত পাত আর ব্রাহ্মণের দাপট তখনও সে আন্দোলনকে স্পর্শ করে নি। তখন বিপরীত ধারাই চলেছিল। তা চলছিল প্রধানত নিত্যানন্দর নেতৃত্বে। নিত্যানন্দর আচরণ ছিল তেদনীতি বিরোধী। জাত বৈষ্ণব সমাজ নিয়ে গ্রাম ও পরিবারভিত্তিক সমীক্ষা না হলে নিশ্চয় করে কোনও কথা বলা অবশ্য সম্ভব নয়, অনুমান ছাড়া গতি নেই।

অভিরাম দাসের বাড়ি ছিল হুগলি জেলায়। শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে তিনি নিত্যানন্দর সহযোগী হিসাবে ভক্তি প্রচারে তী হন। অত্যন্ত প্রতাপশালী প্রচারক। হুগলি বর্ধমান বাঁকুড়া অঞ্চলে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর স্ত্রীর জাতি পরিচয় নিয়ে নানা মত প্রচলিত। কারও মতে তিনি মুসলমান কন্যা। *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থ মতে তিনি ব্রাহ্মণ কন্যা। হুগলি গোস্তেটিয়ার ১৯৭২ সাল (পৃ: ২১২) মতে তিনি মালাকার কন্যা। কোনটি সঠিক? বীরভদ্র যাঁর স্নেহভাজন, শ্রীনিবাস আচার্য যাঁর অনুগত, যিনি চৈতন্য নির্দেশিত হয়ে নিত্যানন্দর সহযোগী — সেই বিশিষ্ট জন অভিরাম দাসের পত্নীর জাতি পরিচয় নিয়ে তাহলে সংশয় আছে। ব্রাহ্মণ কন্যা হলে এমন প্রশ্ন উঠত না। অনুমান হয় অভিরাম দাস তাহলে জাতিভেদ, বর্ণভেদ মানেন নি। ভিন্ন বর্ণের নারীকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ জাত বৈষ্ণব সমাজ প্রতিষ্ঠার সূচনা পর্বের একটি ইঙ্গিত বোধহয় মিলছে এখানে।

১৫০৭ সালে হুগলিতে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তখন উদ্ধারণ দত্ত সপ্তগ্রামে অন্নসত্র খুলেছিলেন বিশালাকারে। হাজার হাজার ক্ষুধিত মানুষ সেখানে অন্ন গ্রহণ করতে আসত। উদ্ধারণ দত্ত তাদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। ধর্মান্তরিত সেই হাজার হাজার মানুষ কি তারপর বর্ণাশ্রমী ছিল, নাকি জাত বৈষ্ণব সমাজ গড়েছিল? অনুমিত হয় নিত্যানন্দ এবং অভিরাম দাসের নেতৃত্বেই জাত বৈষ্ণব সমাজের গোড়াপত্তন হয়েছিল। কোন গ্রাম্য বাবাজীর দ্বারা নয়। অভিরাম দাসের মতো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই সমাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায়, বলা যায় না যে জাত বৈষ্ণব শুধুই নিম্নবর্ণের মানুষ নিয়ে গড়া দল। তাহলে, উচ্চবর্ণের প্রবল চাপে তা স্থায়ী হত না। সামান্য স্বীকৃতিও পেত না। তাদের নিয়ে মাথাব্যথা হত না উচ্চবর্ণের সমাজের।

কিন্তু জাত বৈষ্ণব সমাজ ক্রমেই সুসংহত হয়েছে। সমগ্র দেশ জুড়ে বিস্তৃত হয়েছে এবং সংখ্যার দিক থেকেও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮৮১ সালের আদমসুমারির হিসাব মতো বঙ্গদেশে জাত বৈষ্ণব এর সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ আটষট্টি হাজার বাহান্ন জন (৫,৬৮,০৫২)। ১৮৭৯ সালের হিসাবে মেদিনীপুরে ছিল ৯৬,১৭৪ জন। বর্ধমানে ছিল ২৬,০০০ জন। হুগলিতে ছিল ১২,১০৭ জন। এদের অনেকেই ধনী, ব্যবসায়ী এবং কৃষিজীবী। এই কয়েক লক্ষ ধর্মান্তরিত বৈষ্ণব মিলে একটি সমাজ গড়ে তুলেছিল। পরস্পর বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিল। অবশ্যই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচারে উভয় পক্ষের সমতার প্রশ্ন ছিলই। অন্ত্যজর সঙ্গে উচ্চবর্ণ তখনই সানন্দে মিশে গিয়েছিল—একথা বলা যায় না। এখনও





তা হয় না। তবে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধা ছিল না। কারণ তারা স্বজাতিতে পরিণত। সবাই জাত বৈষ্ণব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এমন কোনও সম্প্রদায় গড়ে নি। গড়তে চায়ও নি। তারা বর্ণাশ্রমী। অন্য বৈষ্ণব দল-উপদল কি এমন কোনও সমাজ গড়েছে? সাধারণ ভাবে দেখা যায়, যে যার বর্ণে স্থিতু থেকে সাধন-ভজনের জন্য মিলিত হয়ে একটা সংঘ গড়ে তুলেছে মাত্র। তাই জাতি বর্ণ হিসাবে তাদের সামাজিক অস্তিত্ব মেলে না। আঠারো শতকে নদীয়া জেলায় উদ্ভব ঘটেছে চারটি গৌণ ধর্ম সম্প্রদায়ের। কুষ্টিয়ায় লালন ফকির সম্প্রদায়, মেহেরপুরে বলাহাড়ী সম্প্রদায়। চাপড় থানার বৃত্তিহুদা গ্রামে সাহেবধনী সম্প্রদায় এবং কল্যাণীর কাছে ঘোষপাড়ায় কর্তাভজা সম্প্রদায়। কর্তাভজা এবং লালন ফকিরের নাম বঙ্গদেশে সুপ্রচারিত। অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী গ্রন্থ রচনা করে অন্য দুটি সম্প্রদায় সম্পর্কে অবহিত করিয়েছেন। এই সম্প্রদায়গুলি সঙ্গীত এবং আচারবিচারের ভিতর দিয়ে যে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তা অতি মহৎ, উদার এবং মানবিক। এঁরা জাতপাত ভেদাভেদ ইত্যাদিতে অবিশ্বাসী। মানবপ্রেমী। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত এবং আলোচিত ব্যক্তিত্ব লালনশাহ। জাতি পরিচয় বিরোধী তাঁর গান সুবিখ্যাত। সভা মঞ্চে, সুধীজনের আলোচনা-সভায় সে বক্তব্য উদ্ধৃত হয়, তা নিয়ে আলোচনা হয়, মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রশংসিত সেই বক্তব্যের প্রয়োগকর্তা মেলে না। লালন সম্প্রদায়ের ভিতরই কি তার প্রয়োগ আছে? শোনা যায়, লালন সম্প্রদায়ের দীক্ষা ব্যবস্থা আছে। শিষ্য মুসলমান হলে তার দীক্ষা হয় ফকিরী মতে। হিন্দু হলে তার দীক্ষা হয় বৈষ্ণব মতে। অর্থাৎ জাতি এবং তার ভিন্নতা স্বীকৃত। সম্প্রদায় আছে, সমাজ গড়ে ওঠে নি।

বলরামী সম্প্রদায় স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য উচ্চনীচ মানে না। কিন্তু এরা বর্ণাশ্রমী এবং জাতিভেদ আছে। হাড়ি ডোম মুচি মাহিষ্য মুসলমান সবরকম শিষ্যই আছে। সকলেই গৃহী এবং নিজের সমাজ মধ্যেই বাস করে। এদের হিন্দু শিষ্যরা বলরামকে বলে হাড়ী রাম। মুসলমান শিষ্য বলে হাড়ী আল্লা।

সাহেবধনী সম্প্রদায়ও জাতি সীমায় আবদ্ধ। বাহ্যিক মিলনে উদার। মুসলমান গুরুর হিন্দু শিষ্য। এবং হিন্দু গুরুর মুসলমান শিষ্য আছে। ধর্মীয় উৎসবে পংক্তি ভোজে জাতি বিচার নেই। হিন্দু মুসলমান মিলিত ভাবে রাঁধে, পরিবেশন করে এবং ভোজন করে। তারপর যে যার সমাজে ফিরে যায়। জন্ম মৃত্যু বিবাহে হিন্দু খোঁজে তার হিন্দু সমাজ, মুসলমান খোঁজে মুসলমান সমাজ। ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে হিন্দু খোঁজে তার স্বরূপ পরিবারকে, আসে ব্রাহ্মণ পুরোহিত আর তার মন্ত্র, শাস্ত্র। মুসলমান ছোটে মৌলভীর কাছে। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের সব তত্ত্ব, আচরণ গান বহিরঙ্গ হয়ে পড়ে থাকে। যে মৌলবাদের বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার — তারই দ্বারস্থ হতে হয় শেষ অবধি। এই সংকট প্রসঙ্গে সুধীর চক্রবর্তী তাঁর একটি গ্রন্থে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের একটি পরিবারের কর্তা কামাল হোসেন। তাঁর ছেলে আর মেয়ের ডাক নাম যথাক্রমে গোপাল আর মীরা। তাদের পোশাকি নাম মকবুল হোসেন আর রোকেয়া সুলতানা। এর কারণ কী?

> কারণ ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে হবে যে। সমাজ বলে একটা জিনিস আছে মানেন? এবারে বলুন, মকবুলকে কোন হিন্দু বাড়ি বিয়ে দেওয়া যাবে? সবাই তো জানেন, আমার ঘরে দীনদয়ালের আসন। হরিমতী দিদির বাস। সবাই এটা ভালো করেই জানে যে আমি পুরান কুরান কোনটাই অন্তর থেকে মানিনি। তবু কি আপনার ভাইপোর সঙ্গে মীরার বিয়ে দেবেন? দেবেন না। সেই জন্যে আমাকে আলেম সাজতে হয়। সবাইকে বলতে হয় নামাজ পড়।[১৮]

কর্তাভজা সম্প্রদায়েও হিন্দু মুসলমান অনুগামী আছে। এই সম্প্রদায়েই উচ্চবর্ণীয় সমাজের মানুষকে অনুগামী হতে দেখা দায়। কিন্তু এঁরাও অনুগামীদের নিয়ে কোনও সমাজ গড়ে তুলতে পারেন নি। শুধু মেলা আর গানে আবদ্ধ।

জাত বৈষ্ণব সমাজের এখানেই সফলতা। এসো মিলিত হও, ফিরে যাবার প্রয়োজন নেই। জন্ম মৃত্যু বিবাহের দায়দায়িত্ব সমাজের। তুমি যে-ই হও, যেখান থেকেই এসে থাক, এখানে তুমি সম্মানিত সদস্য। এদের এই সফলতাই আক্রান্ত হওয়ার কারণ। প্রধান আক্রমণকারী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়। তাঁরা প্রচার করলেন, জাত বৈষ্ণবরা অস্পৃশ্য। গৃহী বাবাজীরা আধ্যাত্মিক জারজ। বিপিন চন্দ্র পাল বলেছেন, জাত বৈষ্ণবরা সমাজ বহির্ভূত। ওরা বৈষ্ণব সমাজে হরিজন। উচ্চবর্ণীয় বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণবরা বলেছেন:

> ওরা ব্রাহ্মণদের কাছে অস্পৃশ্য; ওরা ব্রাহ্মণের আচার মানে না; ওদের বিয়ে হয় মালা চন্দনে। অনুষ্ঠান এতো সাধারণ (simple)যে বিয়ে বৈধ বলে মনে হয় না; ওদের বিবাহ বহির্ভূত সঙ্গম স্বাভাবিক ও বৈধ; ওদের ভিতর জারজ সন্তান ভরতি; অধিকাংশই ভিখিরি।

অভিযোগগুলি ঠুনকো। গৃহী জাত বৈষ্ণব সমাজ সম্পর্কে এ সব অভিযোগ তো খাটেই না।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগুরুরা পতিতাদের এবং শুঁড়ীকে দীক্ষা দিতেন না। জাত বৈষ্ণব বাবাজীরা তাদেরও দীক্ষা দিতেন। দীক্ষা গ্রহণের কারণ একটি প্রতিষ্ঠিত সমাজে আশ্রয়প্রাপ্তি। হিন্দু কাঠামোয় পতিতা এবং শুঁড়ীরা ছিল সমাজচ্যুত। সমাজে বৃত্তি থাকবে, সমাজ তাকে ভোগ করবে, লালন করবে আর শাস্তি ভোগ করবে বৃত্তিধারী? সামাজিক প্রয়োজন ও প্রশ্রয়ে বৃত্তি গড়ে ওঠে, বৃত্তিধারীরা তার শিকার মাত্র। তথাগত বুদ্ধ নিজে কত পতিতাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁর ধর্মে। পাপ বৃত্তি থেকে সরিয়ে এনে সমাজ সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মে পতিতা উদ্ধার যেন একটা বড়ো ব্রত ছিল। বৌদ্ধ-বিরোধী ব্রাহ্মণরা কি সে কারণেই পতিতাদের প্রতি নিষ্ঠুর ছিলেন? জাত বৈষ্ণব সমাজে বৌদ্ধ-প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়।

সম্ভবত খৃ: ১৪ শতকে নবজাগ্রত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম অনেকাংশে বিলীন হয় গিয়েছিলেন।[১৯] সেই বৌদ্ধ-প্রভাব সমাজে তখন সক্রিয় ছিল। এখনও সে প্রভাব যে নেই তা বলা যায় না জোর দিয়ে। বাবাজীদের মনে পরোক্ষভাবে হয়তো সেই বৌদ্ধ-প্রভাবই কাজ করত। একথা বলার কারণ জাত বৈষ্ণব সমাজে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জন্ম মৃত্যু বিবাহে বৈদিক রীতি — হোম যজ্ঞ ক্রিয়া নেই। বর্জিত।

বাংলার সেকালের প্রখ্যাত অভিনেত্রী নটী বিনোদিনী জাত বৈষ্ণব পতিতারই কন্যা। বাল্যকালে তাঁর বিয়েও হয়েছিল জাত বৈষ্ণব ছেলের সঙ্গে। বিনোদিনীর শ্রীচৈতন্যর ভূমিকায় অভিনয় দেখে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রীত হয়েছিলেন। কে বলতে পারে, হয়তো চৈতন্যোপাসক জননীর কন্যা হওয়াতেই বিনোদিনীর পক্ষে চৈতন্য-ভূমিকায় অভিনয়কে অমন সফল করে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

বিধবা এবং কুমারী বৈষ্ণবীদের নামে অনেক কুৎসাই প্রচারিত আছে। সব অভিযোগ মিথ্যা একথা বলা যায় না। শুধু বৈষ্ণব কেন? উনিশ শতকে কৃষ্ণনগরের আদালতে বসে, বিচারক হিসাবে চণ্ডীচরণ সেন মামলার রায় দানকালে লিখিত মন্তব্য করেছিলেন যে, বাঙলার বিধবাদের শতকরা নিরানব্বই জন অসতী। আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর ব্রজবিলাস গ্রন্থে বিধবার সঙ্গে ব্যাভিচার আর ভ্রূণ হত্যা বিষয়ে অনেক কথা লিখেছেন। সে সব উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ঘরেরই কথা। এই পরিস্থিতিতে দরিদ্র যুবতী বৈষ্ণবদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা তো সাধারণ ব্যাপার। তবু এর ভিতরই বলার মতো কথা এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং সমাজ-সংস্কারক অন্য মহাত্মারা যখন স্ত্রী-শিক্ষার জন্য প্রচার করে চলেছেন তখন কলকাতায় এই বৈষ্ণবীরাই শিক্ষা-আলোকপ্রাপ্তা। বনেদীঘরের পুরনারীদের শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত তারাই।

আঠারো শতকের শেষ ভাগে কলকাতার পোস্তার রাজা সাহেবচন্দ্র বাহাদুরের কন্যা হরসুন্দরী দাসীর অক্ষর পরিচয় হচ্ছে একজন কিশোরী বৈষ্ণবীর কাছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারেও অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হত বৈষ্ণবীদের। এমন কি মিস কুক পরিচালিত ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির স্কুলেও শিক্ষয়িত্রী হিসাবে বৈষ্ণবীদের নিয়োগ করা হত। এদেরই উচ্চবর্ণীয় ভদ্রসমাজে পরিচয় ছিল বোষ্টমী। আর এদেরই অভিভাবক, গুরু ছিল নিন্দিত বাবাজীরা। আর এঁদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার নায়ক ছিলেন ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব গুরুরা।

কিন্তু উচ্চবর্ণের বর্ণাশ্রমী মানুষ বিপন্ন হয়ে কেমন করে বৈষ্ণবীর শরণাপন্ন হয়েছে, তারও দৃষ্টান্ত মেলে। বেশি দিন নয়, প্রাকস্বাধীনতা যুগের কথা। বন্ধুবর বিশ্বনাথ সিংহ নদীয়া জেলা গ্রন্থাগারের অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল খুলনা শহর সংলগ্ন একটি সমৃদ্ধ গ্রামে। তিনি সেই গ্রামেরই এই কাহিনীটি জানিয়েছিলেন বৈষ্ণবী প্রসঙ্গে। গ্রামেরই একটি বিশিষ্ট কুলীন কায়স্থ পরিবারের এক বিধবা মহিলা গর্ভবতী হয়ে পড়লেন। পরিবারের লোকজন এবং আত্মীয়রা প্রথমে অতি সংগোপনে নিষ্কৃতির উপায় খুঁজতে লাগলেন। তেমন সুবিধা করতে পারলে না। ক্রমে সেই অদ্ভুত সংবাদ কানাকানি হতে শুরু করল। পরিবারের লোক, আত্মীয়, শুভানুধ্যায়ীরা মহা বিপন্ন। সামাজিক মর্যাদা আর থাকে না। গ্রামে একজন মধ্যবয়সী বৈষ্ণবী ছিল। সে কারও সাতে-পাঁচে থাকত না। কোনও মন্দ আচরণও তার ছিল না। সে নিজের ধর্মকর্ম নিয়ে থাকত। মাঝে মাঝে বাবাজীরা, কীর্তনের দল আসত। তাঁর বাড়িতে তখন কীর্তন, মচ্ছব হত। মাঝে মাঝে সে তীর্থ ভ্রমণে চলে যেত। আর সপ্তাহে একদিন সৈ ভিক্ষায় বার হত। শেষ অবধি সেই পরিবারের কর্তা এবং আত্মীয়রা সেই বৈষ্ণবীকে ধরল। তুমি আমাদের গ্রামের লোক, যেভাবে হোক আমাদের মান রক্ষার ব্যবস্থা করে দাও।

এর পর সেই মহিলা একদিন বৈষ্ণবীর সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণ করতে চলে গেল। ফিরল তিন চার মাস পরে। আসলে



বৈষ্ণবী মহিলাকে নিয়ে গিয়েছিল নবদ্বীপে। কিন্তু এই সম্প্রদায় ভ্রূণ হত্যা করে না। তাই ক-মাস থাকতে হয়েছিল। প্রসবের পর সন্তানকে রেখে দিয়ে মহিলাকে ছেড়ে দিয়েছে। এর ফলে মহিলা তার সমাজে থেকে যেতে পারল। পরিবার এবং আত্মীয়দের মান রক্ষা হল। গ্রাম সমাজ সে কথা ভুলে গেল ক্রমে। বিশ্বনাথবাবু এরপর বলেছিলেন, সত্যিই বৈষ্ণবী সেদিন আমাদের গোটা গ্রাম সমাজকেই রক্ষা করেছিল। এটাও একটা দিক। বৈষ্ণবীরা সেকালের গ্রামে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করত।

তা তো করত। তার বিনিময়ে তারা কি পেত? তিরস্কার নিন্দা, অপযশ, কলঙ্কের ডালি — এই তো তারা, বোষ্টমী, বাবাজীর সেবাদাসী — ছ্যাঃ! এরা জাত বৈষ্ণবের একটি অংশ।

> গোঁড়ামির কারণেই জাত বৈষ্ণবদের ওপর খাপ্পা হয়নি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সমাজ। নিজেদের গোঁড়ামির জন্য তাঁরা সকলকে শিষ্য করতে না পারায় আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। জনসংখ্যা বাড়ছিল শহরে এবং সাধারণ ব্যবসায়ী আর সাধারণ মানুষের হাতে পয়সা আসছে, তাদের শিষ্য করতে না পারায় গুরু প্রনামীর আয় হচ্ছে না। সেটা বাবাজীরা পেয়ে যাচ্ছে। তাই উচ্চবর্ণের গুরুরা তাঁদের ধনী শিষ্যদের বাবাজীদের হাত থেকে রক্ষা করতে অপপ্রচার করতে বাধ্য হতেন যে বাবাজী আর নিম্নবর্ণের বৈষ্ণবরা অস্পৃশ্য।[২০]

উচ্চবর্ণের গুরুরা যখন দেখলেন যে কুৎসা রটনা করেও বাবাজীদের পসার কমানো গেল না। তখনও তাঁরা ফতোয়া জারি করলেন যে:

> ব্রাহ্মণ গুরু দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে দীক্ষা নিতে হবে। অথবা উচ্চবর্ণের (অব্রাহ্মণ) ভেকধারী গৌড়ীয় বৈষ্ণব দিয়ে দীক্ষা নিতে হব।অথবা উচ্চবর্ণের গৌড়ীয় বৈষ্ণব গৃহীগুরু হলেও হবে। জাত বৈষ্ণবরা নিম্নবর্ণ বা অস্পৃশ্য সমাজ থেকে আগত। ওরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব নয়।[২১]

শেষ অবধি উচ্চবর্ণের গুরুরা সফল হয়েছেন। ব্যাপক প্রয়াস এবং প্রচার চালানোর ফলে দীক্ষাগুরু হিসাবে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষাগুরু হিসাবে ডাক পড়ে বৈষ্ণব বাবাজীদের। অর্থাৎ আর্থিক ব্যাপারটা ব্রাহ্মণ গুরুর হস্তগত। বাবাজী সমাজ এবং আখড়ারও আজ পূর্ব গৌরব নেই। গুরুত্ব হারিয়েছে অনেকাংশে।

কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় একবার প্রয়াসী হয়েছিলেন বাংলার সমস্ত বৈষ্ণব সংগঠনকে একজোট করতে। অর্থাৎ সকলকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংগঠনের আওতায় আনতে। নিঃসন্দেহে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ এবং সমর্থনযোগ্য। ঐক্যবদ্ধ বৈষ্ণব সংগঠন জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারত। সে সময় তিনি বৈষ্ণবদের যে শ্রেণী বিভাগ করেছিলেন তাতে সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছিলেন ব্রাহ্মণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব। আর সব নীচে স্থান জাত বৈষ্ণবের। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা জাত বৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলেই স্বীকার করতেন না। কেদারনাথ বললেন, ওদেরও বৈষ্ণব বলে স্বীকার করে নেওয়া হবে। তবে শর্ত সাপেক্ষে। শর্ত হচ্ছে:

১. জাত বৈষ্ণবদের তন্ত্র সাধনার ও আচারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পুরোপুরি বাধাকৃষ্ণ ভজনা করতে হবে।
২. সনাতন ধর্মের নিয়মাবলী মানতে হবে। ধর্মশাস্ত্র সম্মত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা মানতে হবে। ৩. একপত্নীক হতে হবে। ৪. ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে কৃষি, কুটির-শিল্প বা কারিগরি বৃত্তি গ্রহণ করতে হবে।[২২]

শর্তগুলি সুন্দর। জাত বৈষ্ণব সমাজকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিধিবিধানের ভিতর আনার জন্য এই শর্ত। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে শর্তগুলি আখড়ার বৈষ্ণবদের জন্য আরোপিত। গৃহী জাত বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে এসব শর্ত অকারণ—দু একটি ছাড়া। যাই হোক, শর্তের দু একটি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

১. জাত বৈষ্ণব কীভাবে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় ফিরে যাবে? কোন বর্ণে প্রবেশ করবে? অথবা বৃত্তিহীন একটি বর্ণে পরিণত হবে? এবং ভবিষ্যতে আর কাউকে এই বর্ণে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না? অর্থাৎ তাদের মূলনীতি থেকে সরে এসে রক্ষণশীলতাকে, জাতপাত ভেদকে মেনে নিয়ে জাতে উঠতে হবে?

২. সনাতন ধর্মের নিয়মাবলী অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ও বৈদিক রীতিনীতিকে মান্য করা?

৩. শর্ত হচ্ছে, একপত্নীক হতে হবে। প্রথম কথা, জাত বৈষ্ণব গৃহস্থরা একপত্নীক। যে কালে এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে তখন তো বাঙলার হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ প্রথা আইনসিদ্ধ ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সকল সদস্যকে কি এই নীতি মান্য করে চলতে হত? সেখানে কি বহুপত্নীকতা নিষিদ্ধ ছিল?

অদ্বৈত আচার্যর দুই পত্নী। নিত্যানন্দর দুই পত্নী, শ্যামানন্দর দুই কি তিন পত্নী। আর শ্রীনিবাস আচার্য স্ত্রী

বর্তমান থাকতে প্রবীণ বয়সে যুবতীর সঙ্গে প্রেমজ বিবাহে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বহুবিবাহের ক্ষেত্রে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের তো তুলনা নেই।

ভক্তিবিনোদ প্রভু শিক্ষিত ব্যক্তি। বৃত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সে-কারণে অনুমিত হয়, বাংলার নবজাগরণ আন্দোলন, উনিশ শতকের কলকাতায় যা হয়েছিল, তারই প্রভাবে এই শর্ত তিনি আরোপ করেছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ ইত্যাদি বিষয়ে কোথাও টুঁ শব্দ করেছেন বলে তো জানা নেই। তাই প্রশ্ন হঠাৎ জাত বৈষ্ণব সমাজের ক্ষেত্রে এমন আরোপণ কেন? নীতিগত ভাবে অবশ্য তাঁর এই শর্ত অন্যায় নয়।

৪. আরেকটি শর্ত হচ্ছে — ভিক্ষা বৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। ভিক্ষাবৃত্তি নিঃসন্দেহে গ্লানিকর। সমাজ থেকে এ ব্যবস্থা নির্মূল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তেমন সমাজ গঠন কি সম্ভব হয়েছে? গ্লানিময় সমাজই যে ভিক্ষাবৃত্তির স্রষ্টা। সম্পদ সবই সুযোগভোগীদের করায়ত্ত। সাধারণ মানুষের সামনে কাজের সুযোগ নেই। নির্মম বেকারত্ব — অর্ধাশন, উপবাসে দিন কাটে। নিরুপায় মানুষ ভিক্ষার পথ বেছে নেয়।

মাঝে মাঝে মনে হয় ভিক্ষাবৃত্তি বুঝি আর্য সংস্কৃতিরই অবদান। দৃষ্টির সামনে জাগে রবিবর্মার আঁকা ছবি — সামনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষাপ্রার্থী দুর্বাশা মুনি। আর্য মুনিদের অনেককেই ভিক্ষাজীবী রূপে দেখা যায়। সমাজ গুরুও তাঁরা। সংসারীও। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং মুনিঋষিরা রাজদরবারে দান ভিক্ষা চাইতেন। রাজকীয় ভিক্ষাজীবী ছাড়া আর কি? সেটাই বা গ্লানিকর নয় কেন? গৌতম বুদ্ধ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেন। তাঁর শিষ্যরাও। ব্রাহ্মণ বটু উপনয়ন কালে বলে থাকে, ভিক্ষাং দেহি। সন্ন্যাস নেবার পর শ্রীচৈতন্য ভিক্ষাজীবী, বৃন্দাবনের গোস্বামীরাও, শেষে বৈষ্ণব আন্দোলন চলে গেল ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীদের হাতে। ভিক্ষার নাম হল 'মাধুকরী'। ফলে ভিক্ষাবৃত্তি পেল গৌরবের মাত্রা। গৃহস্থের কাছে ভিক্ষাদান হল পুণ্যকর্ম। দরিদ্র অসহায় মানুষ অলস ব্যক্তি, সহজ উপার্জন-পন্থার সুযোগ নেবেই।

এছাড়া, জাত বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে আরেকটা ভাববার দিক আছে। পূর্বাশ্রম ত্যাগ করে বৈষ্ণবতায় এসে অনেকে তার বর্ণগত বৃত্তিও ত্যাগ করত। পূর্ব সমাজে বসবাসই হয়তো সম্ভব হত না। তখন সে কী করবে? অনেকে বৃত্তির কারণেই হীনাবস্থায় ছিল। বৈষ্ণবতা তার উত্তরণ ঘটাল। বৃত্তি পরিচয় ত্যাগই সে চেয়েছে। এখন সহসা সে কোন বৃত্তি গ্রহণ করবে? কুটিরশিল্প বা কারিগরি বৃত্তি—সে তো বৃত্তি ভিত্তিক সমাজে এক একটি নির্দিষ্ট বর্ণের মানুষের করায়ত্ত। সেখানে অনুপ্রবেশ করবে কীভাবে? তাছাড়া সেসব কাজও তো সীমাবদ্ধ। চাইলেই মেলে না। তখন সে কি করবে? নারী সমাজের তো কথাই নেই। দরিদ্র সমাজের বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, দরিদ্র পরিবারের কুমারী কন্যা — বাবা মা যাকে আহার, পরিধেয় দিতে এবং বিবাহ দিতে অক্ষম — আখড়ায় এসে ভেক নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তিকে আশ্রয় করে বাঁচতে চেয়েছে। এদেশে যুগ যুগ ধরে ধর্মের আশ্রয় নিয়ে মাধুকরীর প্রচলন বলেই তারাও ধর্মের ভেক নিয়ে ভিক্ষা করে। বাবাজীরা তাদের আশ্রয়প্রশ্রয় দিয়েছে এই মাত্র। কিন্তু জাত বৈষ্ণব মাত্রই ভিক্ষাজীবী ছিল না এবং নেই। অতঃপর কথা হচ্ছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে অনুপ্রবেশের সার্থকতা কী? সেখানে তো সর্বনিম্নস্তরে ঠাঁই হবে। করুণার পাত্র হয়ে থাকা। বাবাজীরা কেমন সাড়া দিয়েছিলেন, কে জানে।

একটা বিষয় লক্ষণীয়। জাতবৈষ্ণব সম্পর্কে যত কুৎসাই রটনা করা হোক, যত অস্পৃশ্যই বলা হোক, তাদের কিন্তু জল অচল করা হয় নি।

ফলে জল-অচল সমাজ থেকে কেউ জাত বৈষ্ণব সমাজে এলে তার জল-সচল হয়ে যায়। *(ক্রমশ)*


গ্রন্থপঞ্জী

১১. রমাকান্ত চক্রবর্তী : বারোমাস এপ্রিল ১৯৮৬
১২-১৩. শ্রী হরিদাস দাস : গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন
১৪-১৫. সুধীর চক্রবর্তী : বলাহাড়ী সম্প্রদায় আর তাদের গান
১৬-১৭. দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় : ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত
১৮. সুধীর চক্রবর্তী : গভীর নির্জন পথে
১৯. ড. অতুলচন্দ্র ভৌমিক : পূর্বাদ্রি: লোকধন সংকলন-১৯৮৯: দি বুক ট্রাস্ট: ৫৭ বি কলেজ স্ট্রিট
২০-২২. রমাকান্ত চক্রবর্তী : বারোমাস : এপ্রিল ১৯৮৬
২৩-২৪. ড. বিনয় কুমার মাহাত : লোকায়ত ঝাড়খণ্ড


# বর্গাদার প্রসঙ্গ

সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ

বর্গাদার প্রসঙ্গে কৃষক আন্দোলন তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে এই ধারণা বিদ্যমান যে সমস্যাটি নিয়ে প্রথম আন্দোলন করেছে কমিউনিস্টরা এবং কংগ্রেসীরা স্বনামে অথবা বেনামে এর বিরোধিতা করেছে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ এই বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণার কাজ হচ্ছে, এমনকি বিদেশী ছাত্রছাত্রীরাও অনেকেই এই বিষয়ে গবেষণার কাজে আগ্রহী হয়েছেন। আমার এ-রকম কিছু ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকেও অনেক কথা জানতে পেরেছি। ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধারায় এই বিষয়ে গবেষণা করলে তার থেকে আমরা লাভবান হব।

ফসলের ভাগ দেবার অঙ্গীকারে চাষ করার অধিকারীকেই বর্গাদার বলা হয়। বর্গাদার কথাটি ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গ বা উত্তরবঙ্গে চালু ছিল না। উত্তরবঙ্গে সাধারণত আধিয়ার এবং দক্ষিণবঙ্গে ভাগচাষী কথাটি চালু ছিল। বর্গাদার প্রসঙ্গটি ১৮৫১ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্বের আইনের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে উত্থাপিত হয় এবং বর্গাদারকে রায়ত হিসাবে স্বীকৃতি দেবার দাবি ওঠে। যাঁরা এই দাবি তোলেন তাদের প্রধান বক্তব্য ছিল যে বারো বছরের অধিককাল চাষ করলে যদি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের অধিকার পাওয়া যায় তাহলে ফসলের ভাগ দেবার বিনিময়ে বর্গাদার কেন রায়তের অধিকার পাবে না?

এখন বিষয়টি সম্বন্ধে আর একটি দিক বলা দরকার। চল্লিশ দশকে উত্তরবঙ্গে কি দক্ষিণবঙ্গে আমরা যাদের নিয়ে আন্দোলন করেছি উনবিংশ শতাব্দীতে বর্গাদারের পক্ষে যাঁরা কথা বলেছিলেন তাঁরা কিন্তু এই ধরনের ভাগচাষীর উদ্ভব দেখেন নি। নানান ঐতিহাসিক কারণে যেমন অর্থনৈতিক মন্দা, দুর্ভিক্ষ, কৃষি-ফসলের দামের অবমূল্যায়ন, ক্রমাগত খাজনা বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে বিংশ শতাব্দীতে হাজার হাজার কৃষক জমিওয়ালা থেকে জমিহীন ভাগচাষীতে পরিণত হন এবং মুষ্টিমেয় লোকের হাতে শত শত বিঘা জমি একচেটিয়া মালিকানাভুক্ত হয়। সেই পরিস্থিতি প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের পরিস্থিতির মতো নয়। আসলে পূর্ববঙ্গে জমির ওপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকায় অনেক কৃষক ঐ বর্গাদারী প্রথায় জমি বন্দোবস্ত নেন। ১৮৮৫ সালের আইনের আগে মূলত এদের কথা বলেই রায়তের অধিকার দাবি করা হয়েছে; যদিও তখনও আইনত স্বীকৃতিলাভ করে নি কিন্তু কার্যত স্বীকৃতি ছিল। সুতরাং এ সময়ের বর্গাদারের কথা পরবর্তী তে-ভাগা আন্দোলন প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই জড়িত। তবে পরিবেশের ব্যতিক্রম আছে। আমরা আলোচনায় বলতে পারি যে ১৮৮৫ বা উনবিংশ শতাব্দীতে বর্গাদার প্রসঙ্গ এবং এর গঠন-চরিত্র মূলত ক্ষুদ্র চাষীর ন্যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ১৮৮৫-১৯২৮ সালের মধ্যে নতুন বর্গাদার বা ভাগচাষীর জন্মলাভ হতে থাকে এবং বাঙালি সমাজে নতুন মধ্যবিত্তের সংখ্যাও বাড়তে থাকে যারা অর্থনৈতিক সংগঠনের দিক দিয়ে মজবুত। এমতবস্থায় তারা নতুন জমি হাসিল করে বা অর্থবলে কিনে অথবা ছোটো জমিদাররা বাকি খাজনার দায়ে নিলাম করিয়ে অথবা মহাজনী সুদের দায়ে নিলাম করিয়ে সেই জমি স্বনামে বেনামে ডাক দিয়ে সেই পুরনো রায়ত-চাষীকে বর্গাদারে পরিণত করে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গে চা-বাগিচার প্রচলন হয়। চা-বাগিচার সঙ্গে সঙ্গে নতুন মালিক গজাতে থাকে। এরাই ইঙ্গ ভূটান যুদ্ধের পর ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে বহু জমি অধিকার করেন ও বর্গাদার বসাতে থাকেন। অনুরূপভাবে দক্ষিণ মেদিনীপুর এবং ২৪ পরগনার সুন্দরবনে এই পরিস্থিতি দেখা যায়। মেদিনীপুরে বহু জমির মালিক জমির মালিকানা সংগ্রহ করে; অন্য দিকে হাজার হাজার কৃষক ও খেতমজুর ঝাড় জঙ্গল হিংস্র পশু ও লোনা জলের সঙ্গে লড়াই করে জমি হাসিল করে ও ভাগচাষী হয়। উত্তরবঙ্গে যেমন বাইরের শ্রমিক আসে সুন্দরবনেও ব্রিটিশ কোম্পানিরা রাঁচী, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মুণ্ডাদের নিয়ে এসে বসায়। এইভাবে ১৯২৮ সালের মধ্যে বাংলার কৃষিব্যবস্থা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভাগচাষের

আওতায় আসে। এই ভাগচাষের জমির মালিকরা বেশিরভাগই নতুন জোতদার অথবা মধ্যবিত্ত পরজোজী গোছের। এরাই সংগঠিতভাবে ভাগচাষীদের অধিকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

ফলত ১৯২৮ সালে দেখা গেল তদানীন্তন স্বরাজ্য পার্টি এবং মধ্যবিত্তদের পক্ষ থেকে বর্গাদারকে অধিকার দেওয়ার প্রবল বিরোধিতা। ১৮৮৫ সালে যেটা অনুক্ত ছিল ১৯২৮ সালে সেটাই বিধান হিসাবে দেখা গেল। রায়তের সংজ্ঞায় বলে দেওয়া হল যে যারা ফসলের ভাগ দেবার প্রতিশ্রুতিতে চাষ করে তারা কোনক্রমেই রায়ত হবে না। এ প্রসঙ্গেই সে সময়ের মুসলিম ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বক্তব্য রেখে বলা হয় যে এই আইনের দ্বারা আরও পশ্চাদপদ ব্যবস্থা করা হল; কারণ ১৮৮৫ সালের আইনে যে প্রশ্নটি বিবেচ্য বা আলোচনার আকারে ছিল সেটি আর সেরকম থাকল না। হাইকোর্টের তরফ থেকে এরূপ বলা হয়েছিল যে প্রতিটি বর্গাদারের ক্ষেত্রে বিবেচনা করে দেখা হবে যে সে দখলীস্বত্ব রায়তের যোগ্য হয়েছে কিনা? অর্থাৎ কতদিন যাবৎ চাষ করছে, কী কী শর্তে চাষ করছে। এগুলো সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা স্থির করে সে রায়তের অধিকার পাবে কিনা ঠিক করতে হবে। ১৯২৮ সালের সংশোধনীর ফলে সে অবস্থাও রইল না। পরিষ্কার ভাবে বলা হল সে রায়ত হবে না। এ প্রসঙ্গে ১৯২৮ সালের সংশোধনের উপর তদানীন্তন কাউন্সিলের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। একদিকে মৌলভি তামিজউদ্দিন খান, স্যার আব্দুর রহিম প্রমুখের বর্গাদের পক্ষে জোর বক্তব্য অন্যদিকে স্বরাজ্য পার্টির তরফে অখিলচন্দ্র দত্তের প্রবল বিরোধিতা উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় পর্যায়ে এল ১৯৩০ সালের দশকে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট। কৃষি ফসলের দামের নিম্নগতি। হাজার হাজার ছোটো চাষী বাকি খাজনা শোধ করতে না পেরে বর্গাদারে পরিণত হলেন। ১৯৩৮ সালে সংশোধনী আইনে খাজনা বৃদ্ধি করে বাকি খাজনার দায়ে যাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল তাদেরকে জমি ফেরৎ দেওয়া ব্যবস্থা হল না, যদিও অনেক জমিদাররাও সে বিষয়ে আপত্তি করেন নি। কিন্তু নতুন জোতদার ও মধ্যবিত্তদের প্রবল বাধা ছিল। ১৯৪০ পর্যন্ত ভাগচাষীদের পক্ষে মূল দাবি ছিল রায়তের অধিকার পাওয়ার দাবি। আন্দোলনের ক্ষেত্রে কৃষক সমিতি তখনও তে-ভাগা বা ফসলের অংশ বাড়ানোর দাবি করেন নি। বিভিন্ন রকম আব-ওয়াব বা বে-আইনী আদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। যে সব জমি পুরনো জমিদাররা খাস করেছেন, দক্ষিণ বঙ্গে সেই খাস জমি ফেরতের জন্য আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু তে-ভাগা বা ফসলের অংশ বাড়ানোর তখন পর্যন্ত তেমন কোনও আন্দোলন হয় নি।

১৯৪০ পর্যন্ত এই পরিস্থিতি ছিল। ১৯০২ সালের বঙ্গীয় কৃষক সমিতি বা পরবর্তীকালের প্রাদেশিক কৃষক সমিতি মূলত বর্গাদারের বা রায়ত অধিকারের জন্য লড়াই করেছিলেন যা আইনসভাতে প্রতিফলিত হয়েছে। ভূমি রাজস্ব কমিশনারের সামনে কৃষকসভার তরফ থেকে যে স্মারকলিপি দাখিল করা হয় তাতেও ঠিক তে-ভাগার দাবি উত্থাপিত হয় নি। এদিকে নয়া শ্রেণীর জমিদারদের শোষণের মাত্রা বাড়তেই থাকে। এদের শোষণের কথা সাহিত্যেও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়। রবীন্দ্রনাথ রায়তের কথাতে সবুজ পত্রের সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমরা জমিদারদের কথা বলছ কিন্তু এই নতুন জমির মালিকদের শোষণ যে কত মারাত্মক এ বিষয়ে তোমাদের অবহিত হওয়া উচিত। যাইহোক, ১৯৪০-এর আগে বর্গাদের প্রসঙ্গটি উপরোক্ত অবস্থায় থেকে যায়। ইতিমধ্যে বর্গাদের চরিত্র ও শ্রেণীগত কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হয়।

১৯৪০ সালে ভূমি-রাজস্ব কমিশনের রায়ে প্রথম বলা হল যে বর্গাদার তিন ভাগ ফসলের ভুগাদ পাওয়ার অধিকারী হবে এবং একভাগ পাবেন জমির মালিক। এই রায়ের পর কৃষকসভা রায়তের অধিকারের উপর আগে যে জোর দিচ্ছিলেন তা থেকে সরে এসে ফসলের অংশ বাড়ানোর দাবিকে জোর দিয়ে তুলে ধরতে থাকলেন। এর পর এল ৫০ সালের দুর্ভিক্ষ। ৩৫ লক্ষ কৃষক এই মহা দুর্ভিক্ষে শহরের রাস্তাঘাটে প্রাণ দিলেন। যাঁরা গ্রামে ফিরে গেলেন তাঁরা এক মহা বিক্ষোভের আগুন বুকে বয়ে নিয়ে গেলেন। ৪০ সালের পর থেকে আরম্ভ হল প্রত্যক্ষ তে-ভাগা আন্দোলন। যতদূর মনে আছে খুলনার কমরেডরা শোভনায় (খুলনা) ধান ভাগের দাবি করে। উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে আমাদের প্রথম দাবি ছিল 'নিজ খামারে ধান তোল'। জোতদারের খামারে ধান তুললেই ফসল আর ফেরত আসে না বা অংশ যায় কমে। তাই অংশ পাওয়ার হাতিয়ার হিসাবে নিজ খামারে ধান তোলার প্রসঙ্গটি বড়ো হয়ে ওঠে। রঙপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়িতে এই দাবি সোচ্চার হয়, কিন্তু একথাটা ঠিক, যে, সরাসরি তে-ভাগার লড়াই ১৯৪৬-এ ফসলের মৌসুমে যেভাবে শুরু হল আগে তা হয় নি। ১৯৪৬ সালে আন্দোলনের ফলে কৃষক সমাজের এই নিপীড়িত অংশের মধ্যে এক বিরাট রাজনৈতিক চেতনা আসে, সে কথা স্বতন্ত্র।



এই আন্দোলনের ফলে শহীদ সোরাওয়ার্দীর মন্ত্রীসভা একদিকে যেমন গুলি চালায় তেমনই বর্গাদারের দাবি-সম্বলিত আইনও বিধানসভায় উত্থাপিত করে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইতিহাসের চাকা ঘুরেছে। যে মুসলিম সদস্যরা একদিন বর্গাদারের অধিকার নিয়ে লড়াই করেছেন তাদেরই বিরোধিতায় প্রথম বর্গাদার বিল পাশ হতে পারল না। আসলে ৩০-৪০ দশকের মধ্যে বিপুল সংখ্যক মুসলিম জোতদার তৈরি হয়। সোরাওয়ার্দী নিজে কলকাতার অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁর পার্টির মধ্যে এই মুসলিম জোতদারদের ভোটটাই বড়ো; বর্গাদারের অধিকারটা বড়ো ছিল না। গুলির মুখে প্রকৃতপক্ষে আন্দোলন স্তব্ধ হয় নি। খসড়া বিল প্রকাশিত হওয়ায় একটা ধারণা হয়েছিল যে, ওটা পাকা হয়ে যাবে। কিন্তু সেই ধারণা ছিল ভুল। আন্দোলন বিভ্রান্ত হয়। অবশ্য রাজনৈতিক বিভেদও তখন চরমে। সুতরাং ১৯৪৬ সালে দাঙ্গাহাঙ্গামায় আন্দোলন অগ্রসর হলেও বিভেদের বিষে তখন বাংলার চাষী বিভক্ত। এই অবস্থাতে আমাদের স্বাধীনতা এসেছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী যে তে-ভাগা আন্দোলন সেই আন্দোলনে গত ৪৬ বছর একদিকে আইনসভায় বর্গাদারের অধিকারের পরিবর্তন ও সংশোধন চলছে, অন্যদিকে অধিকারগুলোকে রক্ষা করার সংগ্রামী আন্দোলন পাশাপাশিভাবে চলছে। প্রকৃত পক্ষে এই দাবির আন্দোলন না থাকলে আইন কোনও কাজে লাগত না। মজার কথা হল মূল দুটি আইন ১৯৬৫ সালের ভূমি সংস্কার আইন ও ১৯৭১ সালের সংশোধনী কংগ্রেস আমলেই পাকে কিন্তু তা কার্যকর হয় নি; কারণ কংগ্রেস আইন পাকা করলেও তা কার্যকর করার কোনও আগ্রহ তাদের ছিল না। অন্য রাজ্যেও ভূমি সংস্কারের অবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটে নি। পশ্চিমবঙ্গে আইন-সভার ভিতরে ও রাজ্য জুড়ে শ্বেতখামারে আন্দোলন ও সংগ্রাম পাশাপাশি চলার ফলে ভূমি সংস্কার অনেকখানি কার্যকর হয়েছে। গত ১৫ বছরের মধ্যে আরও একটি পরিবর্তিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তারও মধ্যে রয়েছে ভূমি সংস্কার আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাস। সারা ভারতে প্রশ্ন ছিল বা রয়েছে, পাঞ্জাব হরিয়ানা মহারাষ্ট্র গুজরাট এই সব অঞ্চলে অর্থাৎ মূলত তুলা চাষ, গম চাষ ইক্ষু চাষ এবং তৈলবীজ চাষ এলাকায় একটা ধারণা তৈরি করা হয়েছে বড়ো চাষী বা ধনী চাষীদের হাতে পুঁজি দিয়ে ফসলের উৎপাদন বাড়ানো যায়। এই লবির প্রধান নেতা হলেন স্বয়ং কৃষিমন্ত্রী বলরাম জাখর। তাঁর মতে বড়ো চাষীদের আর্থিক সাহায্য করেই কৃষি উৎপাদন বাড়তে পারে, এই দেশ উন্নত হতে পারে। অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট-এর পার্টিগুলি বুঝতে পারে আমাদের কৃষি সংস্কারকে মূলত বর্গাদার, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক তথা মধ্য চাষীদের উপর নির্ভরশীল হতে হবে।

ভূমি সংস্কার আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে ফসল বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা রচিত হয় ইতিহাস প্রমাণ করে যে ভারতবর্ষের মতো ক্ষুদ্র কৃষকদের দেশে এটাই বেশি নির্ভরযোগ্য। কারণ গত ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গে ফসলের উৎপাদন দ্বিগুণের কাছে পৌঁছেছে। উচ্চ ফলনশীল চাষ বেড়েছে, আলুর চাষ প্রায় ১০ গুণ বেড়েছে। তৈলবীজের চাষও বেড়েছে। অবশ্য কৃষি ফসলের দাম ভালো থাকাটা এই পরিস্থিতিকে সাহায্য করেছে। কিন্তু দাম বাড়লেও যদি তার ফল কৃষক না পায় তাহলে কি কৃষক উৎসাহিত হত? ভূমি সংস্কার সেই উৎসাহটা জুগিয়ে দিয়েছে। বর্গাচাষী প্রান্তিক চাষীরা আজ ফসল বাড়ানোর উদ্যোগে সামিল। অবশ্য ভাগচাষী এবং মালিকের সম্পর্কের মধ্যেও নতুন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এখন আর সে যুগ নেই যখন পৌষ মাসে একবার গাঁয়ে গিয়ে ধান তুলে জোতদার চলে আসবে। এখন চাষ মানে প্রতিনিয়ত ব্যাপার। সারা বছরই চাষ লেগে আছে। কাজেই মালিকেরাও বর্গাচাষীর ওপর প্রচণ্ড নির্ভরশীল। অন্য দিকে উচ্চ ফলনশীল ফসলের চাষ মানেই অনেক পুঁজির নিয়োগ যেটা বর্গাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সরকারের পক্ষেও এত পুঁজি যোগান দেওয়া সম্ভব নয়।

সেই অবস্থাতে এখন পারস্পরিক সহযোগিতা আগের থেকে অনেক বেশি কাজ করছে। এই বিষয়ে পূর্ণ আলোচনা অন্যত্র করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল গত ১০০ বছরে কীভাবে বর্গাদার প্রশ্নটির চরিত্র ও সংগঠনের পরিবর্তন হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তার দাবি, তার সংগ্রামের রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। সংক্ষেপে তাই-ই বলা হল।

১৯৩৫ সালে কৃষক সভার প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। ১৯৪৪-৪৮, তিনি ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্পাদক। পশ্চিম বঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে প্রথমে তাঁকে করা হয় বিধান সভার স্পিকার এবং দ্বিতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার আমলে তিনি পালন করেন আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব। সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ দেওয়ানী আইনজ্ঞ হিসাবে কলকাতা হাইকোর্টে একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী। তাঁর লেখা *Laws Wakfs*, ওয়াকফ বিষয়ে অনন্য আইনগ্রন্থ।

*গ্রন্থ সমালোচনা*

# হুতোমের নতুন সংস্করণ

অলোক রায়

পুরনো বইয়ের পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করেন না। এক সময় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা (১৩৪৩-৪৬) নাম দিয়ে অনেকগুলি বই পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন। সজনীকান্ত দাস এই কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন। পরে সম্বোধি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা নামে বোধহয় দুটি বই বেরিয়েছিল (ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ)। যোগেশচন্দ্র বাগলও সম্পাদনাকর্মে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সম্পাদনার দুটি দিক — একটি হলো যথার্থ কোনো দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সন্ধান (অনেক সময় আবিষ্কার) এবং তার ঐতিহাসিক-তাৎপর্য নির্দেশ, অন্যটি হলো শুদ্ধ পাঠ-নির্ধারণ এবং যথাসাধ্য যত্নসহকারে তার পুনর্মুদ্রণ। এখানে পুথি সম্পাদনার কথা বলা হচ্ছে না, সেখানে পাঠ-নির্ধারণ যে সমস্যা সৃষ্টি করে মুদ্রিত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে সে-সমস্যা প্রধান হয়ে ওঠে না। কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণকালেও সম্পাদককে স্থির করতে হয়, কোন্ সংস্করণটি তিনি আদর্শ-পাঠ হিসাবে ব্যবহার করবেন (সাধারণত গ্রন্থকারের জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ সংস্করণটি গ্রহণ করা হয়)। পাঠান্তর তিনি দেবেন কি না এবং দিলেও প্রত্যেকটি সংস্করণের যাবতীয় পাঠভেদ নির্দেশ করা হবে কি না, অপরিচিত শব্দ এবং উল্লেখপঞ্জী টীকা রচনার পদ্ধতি কি হবে ইত্যাদি। মুদ্রণপ্রমাদ-সংশোধন বা বানানের সমতাবিধান/আধুনিকীকরণ ইত্যাদি বিষয়-সংক্রান্ত নীতি নিয়েও সম্পাদককে ভাবতে হবে।

ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্ত যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্, রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, বেদান্তচন্দ্রিকা কিংবা কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ পুনর্মুদ্রণ করেন তখন এই ধরনের বইয়ের বিশেষ কোনো চাহিদা ছিল না, নিজেদের উদ্যোগেই তাঁদের বই ছাপতে হয়েছে এবং ব্যয়সংক্ষেপের জন্য অনেক কিছু করার ইচ্ছা সত্ত্বেও করে উঠতে পারেননি। মুদ্রণপ্রমাদ সম্পূর্ণ পরিহার করতে না পারলেও পাঠশুদ্ধির দিকে তাঁদের নজর ছিল। পাঠান্তর বা পাঠভেদ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালায় নির্দেশ করা যায় নি, কিন্তু পরে যখন তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্র বা মধুসূদনের রচনাবলী/গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন তখন সংস্করণভেদে পাঠান্তর নির্দেশের রীতি প্রবর্তন করেন। একেবারে নির্ভুল বা আদর্শ বিবেচিত না হলেও সুষ্ঠু পুনর্মুদ্রণের নিদর্শন হিসাবে এগুলি স্মরণীয়।

কিন্তু গত কুড়ি-পঁচিশ বছর হলো পুরনো বই পুনর্মুদ্রণের যে-ঝোঁক দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে নিষ্ঠা পরিশ্রম বা দায়িত্ববোধ দূরে থাক, কোনো রকম সম্পাদনানীতি বা সততাবোধের পরিচয় থাকছে না। প্রথম শুরু হয়েছিল গ্রন্থাবলী-প্রকাশ, তারপর উনিশ শতকে প্রকাশিত প্রায় যে-কোনো বই যে ভাবে হোক একটা ভূমিকাসহ প্রকাশিত হতে থাকে। এর ফলে অধুনা-প্রকাশিত পুরনো বিখ্যাত বইয়ের পুনর্মুদ্রণ হয়তো সাধারণ পাঠকের কৌতূহল-চরিতার্থ বা সংগ্রহ-বাসনা পূর্ণ করেছে, কিন্তু পাঠনির্ধারণে এসব ক্ষেত্রে এমনই বিপর্যয় ঘটেছে যে এগুলি পড়াশোনার কাজে আদৌ ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শাকে একালে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বলা যায় না। তবে পুরনো বই হিসাবে হুতোমের একটি সুসম্পাদিত নির্ভরযোগ্য আধুনিক সংস্করণের প্রয়োজন ছিল। শ্রীঅরুণ নাগের সম্পাদনায় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'সটীক হুতোম প্যাচার নকশা' (আশ্বিন ১৩৯৮)। টীকা সংযোজন নিঃসন্দেহে তাঁর গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ, কিন্তু তার আগে পাঠনির্ধারণ ও পাঠভেদ নির্দেশের কথা বলা প্রয়োজন। বইটির বহিরাবরণে গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে জানানো হয়েছে ''সব সংস্করণের হাল এক, মূল ভাষা মার্জিত করা হয়েছে। শব্দার্থ জানা না থাকায় মুদ্রণপ্রমাদ ধরে নিয়ে ভুল শব্দ বসানো হয়েছে, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণে তো হুতোম লিখিত মূল ভূমিকাই বাদ।'' সুবর্ণরেখা-সংস্করণে আমরা পাচ্ছি 'হুবহু মূল পাঠ'। হুতোম প্যাঁচার নকশার ১৯৬৮ সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সুযোগ পাইনি, তবে একাধিকবার যখন মূল পাঠের হুবহু অনুসরণের দাবি করা হচ্ছে তখন ধরে নিচ্ছি এই দাবি যথার্থ। সেদিক থেকে নির্ভুল পাঠ দেওয়ার জন্য সম্পাদককে অভিনন্দন জানাই।

কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ১৩৪৫ সালে হুতোম প্যাঁচার নকশা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হিসাবে পুনর্মুদ্রণ করেন, তখন কি তিনি মূল পাঠ গ্রহণ করেননি? দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত বইগুলিতে ছাপার ভুল থাকতে পারে, কিন্তু সচেতনভাবে সেখানে মূল ভাষা মার্জিত করা হয়েছে বা ভুল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এমন কথা বলা অসংগত হবে। ব্রজেন্দ্রনাথের কোথাও ভুল হতে পারে না, তা নয়; কিন্তু পাঠনির্ধারণে তিনি যে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন, তার অনেক প্রমাণ আছে। পরবর্তীকালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের সম্পাদনায় হুতোম প্যাঁচার



নকশার 'নূতন সংস্করণ' প্রকাশিত হয়। কোনো সন্দেহ নেই বাংলা বইয়ের সংস্করণ থেকে সংস্করণান্তরে ছাপার ভুল বেড়েই যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুবর্ণরেখা-সংস্করণের সঙ্গে পরিষৎ-সংস্করণ (১৩৫৫) মিলিয়ে দেখলে পাঠভেদ খুব বিরাট বলে মনে হয় না। তবে ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্তের অপরাধ, তাঁরা ভূমিকায় বলেছেন ''আমরা ১৮৬৮ সালে গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণকে মূল আদর্শ ধরিয়া পুস্তক মুদ্রণ করিয়াছি; কারণ, গ্রন্থকার জীবিত থাকিয়া যে পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইতে আমরা বাধ্য। তবে এই সংস্করণে যে যে স্থলে শব্দ ও পংক্তি পড়িয়া গিয়াছে, প্রথম সংস্করণের পাঠ ধরিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইয়াছি।'' সুবর্ণরেখা-সংস্করণে দাবি করা হয়েছে ''নিতান্ত স্বল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে অবধারিত মুদ্রণপ্রমাদ ও ভুল যতিচিহ্ন ছাড়া মূলপাঠ বর্ণাশুদ্ধি সহ অবিকৃতভাবে মুদ্রিত।'' অবধারিত মুদ্রণপ্রমাদের সংশোধন এবং বর্ণাশুদ্ধিসহ মূল ভাষা একই সঙ্গে কি ভাবে সম্ভব? এখানেই বোধহয় সম্পাদকের বিবেচনাবোধ কাজ করেছে। অন্যদিকে পরিষৎ-সংস্করণে পাঠান্তর দেওয়া হয়নি. তাই দ্বিতীয় সংস্করণের সঙ্গে তৃতীয় সংস্করণের 'পার্থক্যে'র কথা তাঁরা বলেননি। তবে প্রথম সংস্করণের চার লাইনের 'বিজ্ঞাপন'টি পরিষৎ-সংস্করণে থাকা উচিত ছিল, যদিও এটিকে 'মূল ভূমিকা' বলা যাবে কি না সন্দেহ।

সাধারণ পাঠকের কোনো কাজে না লাগলেও পাঠান্তর নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি। (যদিও যে কোনো পুরনো বইয়ের popular edition এবং scholarly edition একই রকম হতে পারে না — শেষোক্ত সংস্করণ মুষ্টিমেয় পাঠকের পড়াশোনার জন্য প্রয়োজন)। কিন্তু হুতোম প্যাঁচার নকশার তিনটি সংস্করণে যখন নানা ধরনের পাঠভেদ দেখা দেয়, তখন পরিবর্তনের নিদর্শন হিসাবে প্রত্যেকটি পাঠ নির্দেশ করা সুবর্ণরেখা-সংস্করণেও কি সম্ভব হয়েছে? বানানের ক্ষেত্রে যে হয়নি সে কথা সম্পাদক নিজেই জানিয়েছেন। ''নিয়মানুযায়ী বানানের পরিবর্তন পাঠান্তরের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, এ ক্ষেত্রে বাহুল্য বিবেচনায় তা পরিহার করা হয়েছে।'' অথচ কলকাতার উপভাষার বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্য (স্বতোনাসিক্যীভবন) 'হোঁসেন খাঁ' বানান রক্ষা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন (নকশার মধ্যে অবশ্য বেশ কয়েকবার 'হোসেন খাঁ'ই আছে)। কিন্তু প্রথমেই প্রশ্ন দেখা দেয়, 'সূচীপত্রে' যে বানান রক্ষা করা হয়েছে তার সঙ্গে বইয়ের ভিতরে নকশায় ব্যবহৃত বানান মিলছে না কেন (যেমন বাড়ি/বাড়ী, কৃষ্ণানি/কৃষ্ণানী, মিউটিনি/মিউটিনী, সাতপেয়ে/সাত পেয়ে, যেমন/যামন)। এগুলি কি সবই ১৮৬৮ সংস্করণের ছাপার ভুল? সাধারণভাবে উচ্চারণ-অনুযায়ী বানানের দিকে নকশাকারের ঝোঁক ছিল (দ্বিতীয় সংস্করণের গৌরচন্দ্রিকায় — সুদু, অ্যাকবার, ক্যান, কত্তে পাত্তেন, অ্যামন, অ্যাত, য্যামন)। ফলে হুতোমের আদি রূপটিকে রক্ষা করতে হলে বানান অবিকৃত রাখতে হবে। কিন্তু প্রথম নকশার আদি পাঠের (প্রথম সংস্করণ) সঙ্গে মেলাতে গিয়ে দেখছি সুবর্ণরেখা-সংস্করণে যে কয়েকটি পাঠভেদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার বাইরেও অসংখ্য পাঠভেদ আছে, যেমন প্রথম অনুচ্ছেদেই — শুনা (শোনা), যাচ্চে (যাচ্ছে), পীট (পিঠ), ছোবানে তারকেশ্বরে গামচা (তারকেশ্বরে ছোবানো গামছা), সুত (সূতা), বেহারা (বেয়ারা), কর্ত্তেছে (কচ্চে), বন্দ (বন্ধ), গিয়েচে (গিয়েছে), ব্যারাম (ব্যায়রাম) ইত্যাদি। প্রথম সংস্করণে চন্দ্রহার 'আর' সিপাই পেড়ে ঢাকাই শাড়ির কথা ছিল, পরবর্তী সংস্করণে 'আর' বর্জিত, — পাঠভেদ নির্দেশকালে তার উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল। ফলে বুঝতে পারছি পাঠভেদ-সংযোজনের ব্যাপারটি সম্পাদকের নিজস্ব নির্বাচনের ব্যাপার। আসলে তিনটি সংস্করণের ফটোকপি ছাপতে পারলে সম্পাদকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো। অন্তত ১৮৬৮ সংস্করণের ফটোকপি পরিবেশন করা সম্ভব হলে 'পাঠ হুবহু অনুসরণ' বলতে পারা যেত, তা নাহলে আমাদের সংশয় থেকেই গেল, নকশাকার কি সত্যই 'যাচ্চে' এবং 'কচ্চে', 'বন্দ' এবং 'গিয়েচে' বানান পরবর্তীকালে সংশোধন করেছেন? ছাপার ভুল বললে এখানে সমস্যার সমাধান হবে না — সম্পাদকীয় দায়িত্বে 'অবধারিত মুদ্রণপ্রমাদ ও ভুল যতিচিহ্ন' সংশোধন করলে তাকে আর 'হুবহু' পুনর্মুদ্রণও বলা যাবে না।

সাধারণ পাঠক (সাধারণ পাঠক অবশ্য একশো টাকা দাম দিয়ে হুতোমের নকশা কিনবেন কি না জানি না) পাঠভেদ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, বানানের ব্যাপারও তাঁর আগ্রহ সীমাবদ্ধ। তুলনায় বড়োলোকদের কেচ্ছাকাহিনী হিসাবে হুতোম প্যাচার নকশা সেকালেও যখন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, একালেও তেমনি সেই বড়োলোকদের শনাক্তকরণ প্রয়াসে আশা করা যায় সাধারণ পাঠকমহলে সুবর্ণরেখা-সংস্করণটি আলোড়ন সৃষ্টি করবে। রাগাম্বর মিত্র, ছুঁচো শীল, পেঁচো মল্লিক, বর্ধমানের হুজুর আলী,

প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ হলেন সম্পাদকের মতে যথাক্রমে রাজা দিগম্বর মিত্র, মতিলাল শীল, হলধর মল্লিক, বর্ধমানের মহারাজা, প্যারীচাঁদ মিত্র ও শিবচন্দ্র দেব। হুতোমের নকশায় এরকম আরও অসংখ্যজন আছেন। তবে সম্পাদক কয়েকজন সম্বন্ধে 'নিঃসন্দেহ'। কারণ সেখানে পদবি, জাত, দৈহিক আকৃতি মিলে যাচ্ছে। কিন্তু অনেকেরই 'শনাক্তকরণ বিতর্কমূলক' অথচ সম্পাদক অনায়াসে তাঁর অনুমান বা সন্দেহসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম করেছেন যেমন অঞ্জনারঞ্জন দেব হলেন রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, প্যালানাথ বাবু হলেন রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বা কালীপ্রসাদ দত্ত, কিংবা পূজারী দাদাঠাকুর হলেন হরু ঠাকুর। মিস স্টো, মিস টমসন, মিসেস বর্করলি কে অনুমানগুলি বেশ উপভোগ্য — স্টো বা টমসন বিবাহ করা সত্ত্বেও কেন 'কুমারী' বলে অভিহিত, বর্করলির পরিচয় 'অজ্ঞাত'। তবে কেন তিনি লিডিয়া অ্যান বর্করলি হতে পারেন — এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। আসলে হুতোম প্যাঁচার নকশার চরিত্রগুলিকে শনাক্তকরণ আদৌ সহজ নয়, পনেরো আনা ক্ষেত্রে নিঃসংশয় হওয়া যায় না — একথা স্বীকার করতেই হবে। অথচ পাতার পর পাতা শনাক্তকরণ প্রয়াস চলেছে, যার সত্যই কোনো প্রয়োজন ছিল কিনা বুঝতে পারছি না। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত নিলেই এই ধরনের প্রয়াসের নিরর্থকতা বোঝা যাবে — 'কেষ্টা বাগদী — শোনা যায়, রাজা নবকৃষ্ণ দেবের এক নাতির গায়ের রং ঘোর কালো ছিল বলে তাঁকে লোকে 'বাগদি রাজা' বলত। শোভাবাজারের রাজপরিবারে ছোটো তরফের সকলের নাম — কৃষ্ণদেব, মধ্যপদ 'কৃষ্ণ'-এর অপভ্রংশ 'কেষ্টা', তবে তাতেই প্রমাণ হয় না হুতোম-উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তিনিই।'' অন্যদিকে সম্পাদক সে কালের 'মহাপুরুষ'দের জীবনীগ্রন্থের উপর নির্ভর করতে পারেননি কারণ সেখানে তাঁদের ''মহাপুরুষ বানানো হয়েছে, তাঁদের চরিত্রের উজ্জ্বল দিকগুলি আলোচনা ও পুনরালোচনার ফলে লোকের মনে বিশ্বাস হয়ে প্রথিত, অন্ধকারদিকের প্রমাণ বা প্রমাণসূত্র অধিকাংশই লুপ্ত, যা স্বল্প কিছু ছড়িয়ে আছে আদালতের নথি, সম্পত্তির খতিয়ান, মহাফেজখানার দলিল আর মুষ্টিমেয় স্মৃতিচারণায়। সেগুলি একত্র করে এতকালের প্রচলিত বিশ্বাস ভাঙার মতো সওয়াল তৈরি করতে গেলে টীকার স্বল্প পরিসরে কুলোয় না, পৃথক বই লিখতে হয়।'' অর্থাৎ সেই মূর্তি-ভাঙার প্রয়াস। তাতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু টীকার স্বল্পপরিসরে তা যখন সম্ভব নয়, তখন কিসের ভিত্তিতে মহাপুরুষকে পাষণ্ড হিসাবে শনাক্ত করবো। দিগম্বর মিত্রের দুখণ্ড জীবনী লিখেছিলেন ভোলানাথ চন্দ্র। জীবনী হিসাবে সে গ্রন্থ নির্ভরযোগ্য না হতে পারে, কিন্তু দিগম্বর মিত্র সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র, এররকম ভয়ানক জানোয়ার, তার আলোচনা তো টীকাতে নেই; তাহলে ''বাগাম্বর মিত্র নিঃসন্দেহে দিগম্বর মিত্র'' একথা বলি কি করে।

ব্যক্তি শনাক্তকরণের পরে আসছে শব্দার্থ নির্দেশ বা শব্দ টীকা। নকশায় ব্যবহৃত বেশ কিছু শব্দের সন্ধান অভিধানে মেলে না, ফলে সেখানে সম্পাদকও অসহায়, যেমন — লাবেল, বসমা, গদাই নাচ, জবাবি, আতুরী, গ্যাদাড়া, মেটো প্রভৃতি। অন্যদিকে সাধারণ পাঠকের কথা ভেবেই এমন কিছু শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যার হয়তো খুব একটা দরকার ছিল না, যেমন — মধুপর্কের বাটি, অগ্রদানী, আটকৌড়ে, শালের শামলা, ঝাঁপটা, বেহদ্দ, ব্রহ্মসভা, ভাট, নিজ্জলা, ধূপছায়া চেলী প্রভৃতি। তবে প্রয়োজনীয় এবং অধিকাংশ জনের অজানা শব্দের অর্থ, ব্যক্তি ও স্থাননামের পরিচয় অনেক দেওয়া হয়েছে — সেগুলি সকলেরই কাজে লাগবে। শুধু টীকায় ব্যবহৃত উদ্ধৃতির উৎস-উল্লেখের অভাবে অনেক সময় অসুবিধা হয় — সম্ভবত এ ব্যাপারে সম্পাদকীয় নীতি ঠিক বুঝতে পারি নি।

হুতোমের এই নতুন সংস্করণের কিছু বিচ্যুতি বা সীমাবদ্ধতার কথা বলেছি। কিন্তু বইটির মূল্য তাতে কমে না। সম্পাদক 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা'কে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য সত্যই পরিশ্রম করেছেন, দীর্ঘদিনের অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা ছাড়া এরকম একটি সংস্করণ প্রকাশ করা যায় না। উনিশ শতক সম্বন্ধে প্রায় যাবতীয় তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন — ছবি, মানচিত্র এবং টীকা মিলিয়ে গ্রন্থটিকে উনিশ শতকের বাঙালি জীবনের কোষগ্রন্থ বলা যায়। বইটি ছাপার ব্যাপারেও প্রকাশক যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন — ছাপার ভুল আছে (টীকা অংশে), তবে সংখ্যায় খুবই কম। এরকম একটি শোভন সুন্দর গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সম্পাদক এবং প্রকাশককে অভিনন্দন জানাই — আশা করি বইটি সাধারণ পাঠক ও বিশেষজ্ঞ উভয়ের কাছেই সমাদর লাভ করবে।।

*সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা* সম্পাদনা অরুণ নাগ
সুবর্ণরেখা, কলিকাতা ৯ একশো টাকা



# বাঙালির ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ

**পুলক নারায়ণ ধর**

বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন ''সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যায়, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গলার ইতিহাস নাই''। বাঙ্গলার ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হলেও ''সে কার্য্যে ক্ষমতাবান বাঙ্গালী অতি অল্প''। কিন্তু ''বাঙ্গলার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।''

বঙ্কিমচন্দ্রের আশা সম্পূর্ণ না মিটলেও সামান্য যে কয়েকজন ঐতিহাসিক এই বিপুল কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন — রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, নীহাররঞ্জন রায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

বাঙালির ইতিহাস অনুসন্ধিৎসা ও চর্চা এবং বাঙালির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তা আবার নতুন করে জাগছে। জাতি হিসাবে বাঙালি তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারবে কি না এই প্রশ্ন বাঙালির মনে উঁকিঝুঁকি শুরু করেছে। বাঙালির পরিচয় কী? সে কি বাংলাদেশী? না সে কি ভারতীয়? হিন্দু না মুসলমান? 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' কি শুধু রাজনৈতিক ভাবেই বিচ্ছিন্ন না কি সংস্কৃতিগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত বিচ্ছিন্নতাও দুটো আলাদা বাঙালি জাতির জন্ম দিচ্ছে? এ সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আমাদের জানতে হবে। এড়িয়ে গেলে চলবে না।

এই চিন্তাপটে মুহম্মদ হাবিবুর রহমান ও শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই দুটি আমাদের বিচার্য।

হাবিবুর রহমানের বই *গঙ্গাস্তম্ভি থেকে বাংলাদেশ* ঢাকা বাংলা আকাডেমি থেকে প্রকাশিত। বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে। কিছু নতুন সংযোজনা সহ দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৯ সালের অকটোবরে। হাবিবুর রহমান খ্রিস্ট-পূর্ব সময় থেকে বর্তমান বাংলাদেশের বিবর্তনের ধারা তুলে ধরেছেন তাঁর বইয়ে।

বাঙলাদেশের ও জাতির নামের উৎপত্তি, বিবর্তন ও তার প্রাচীনতা লেখক সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে হিন্দু পুরাণের পাশাপাশি মুসলমান পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। বাঙালি বিজয় সিংহ কর্তৃক লঙ্কাজয়ের ইতিহাস নিয়েও লেখক পুরনো প্রশ্ন তুলেছেন। এ প্রশ্নের উত্তর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর *বাঙলার ইতিহাস* গ্রন্থে (১৩৭০) আলোচনা করেছেন সিংহল 'মহাবংশ' ও 'দ্বীপবংশ' পুস্তকের সূত্র ধরে। নীহাররঞ্জন রায়ও *বাঙালীর ইতিহাস* গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সে দিক থেকে বিচার করলে বাঙালির ইতিহাস নিয়ে হাবিবুর রহমান যে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে কোনও নতুন তথ্য বা মত নেই। পাল ও সেন বংশের ইতিহাস আলোচনাও মোটামুটি একই ছকে বাঁধা। তবে বখতিয়ার খিলজীর তেরোজন লোক নিয়ে নদীয়া জয়ের কাহিনী তার কাছে কোনও আশ্চর্য ঘটনা নয়।

তুর্কি শক্তির আবির্ভাব, স্বাধীন সুলতানী আমল, এবং পাঠান-মোঘল দ্বন্দ্ব, মোঘল শাসন ও ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস সবই আলোচনা করেছেন। কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস। সাধারণ মানুষ বা সমাজ পেছনে থেকে গেছে। এ ক্ষেত্রেও লেখক চিরাচরিত বা গতানুগতিক ধারাই অনুসরণ করেছেন। এই সকল শক্তির দ্বন্দ্বে বাংলার মানুষের ও বাংলার ভাগ্যচক্র কী ভাবে বিবর্তিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে দুচার কথা থাকলে ভালো হত।

লেখক দেশভাগের মানসিক পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে **বঙ্কিমচন্দ্রের** কিছু বিচ্ছিন্ন উক্তি দ্বারা হিন্দু মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরেছেন। কিন্তু এ কথা মেনে নেওয়া মুশকিল যে দেশ ভাগের পেছনে সাধারণ হিন্দু মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি তীব্র ঘৃণাই ছিল বড়ো কারণ। হিন্দু মুসলমান যদি পাশাপাশি তাদের ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়েই দীর্ঘ কাল বসবাস করে আসতে পারে তবে ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে যাবার আগে তারা পরস্পরের গলা টিপে ধরে দেশভাগ চাইবে কেন? আসলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বাধাবাঘা নেতারা দেশভাগ চেয়েছিল নিজেদের দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য। সাধারণ মানুষদের দুর্বল জায়গাগুলি তারা সর্বদা উস্কে গেছে। লেখক যথার্থই বলেছেন ''চিরস্থায়ী সংখ্যাগুরু ও চিরস্থায়ী সংখ্যালঘু হিসাবে প্রতিটি সম্প্রদায় চিন্তা করেছে ও শঙ্কিত হয়েছে'' (পৃ: ৮৯)। কিন্তু এ চিন্তার পেছনে কাদের স্বার্থবুদ্ধি কাজ করেছে তা স্পষ্ট ভাবে বলার প্রয়োজন আছে।

সমস্ত বাঙলায় প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের সবচেয়ে উত্তাল ও আবেগপূর্ণ যে গণবিক্ষোভ হয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মাধ্যমে সে সম্পর্কে লেখক বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি স্বদেশী আন্দোলনকে বিচার করেন নি। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি ছেলেদের উজ্জ্বল ভূমিকার কোনও পরিচয় তিনি দেন নি। এ কেমন স্বচ্ছিন্নযুক্ত বাঙালি ইতিহাস?

'পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ' পর্বের আলোচনাতেও

মোটামুটি খবরের কাগজের তথ্য পরিবেশনই প্রাধান্য পেয়েছে। এর মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু যে বাঙালি জাতীয়তাবোধ এর মূলে তার গভীরতার তেমন পরিচয় লেখক দেন নি। ইস্‌লাম ধর্ম বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষিত হবার পর এর পরিচয় সবচেয়ে বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে।

লেখক নিজেই বলছেন: ''বর্তমানে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় পরিচয় সব চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ধর্মের পরিচয় দিয়ে নিজের সীমানাও পার হওয়া যায় না, ...বর্তমান দুনিয়ায় ধর্ম যার যার তার তার হয়েও রাষ্ট্র সকলের হতে পারে''।

এই প্রত্যয়ে যদি বাংলাদেশের হৃদয় আজ দগ্ধ হয় তবে অরুন্তুদ ধর্মান্ধতার আবরণ ছিন্ন করে হয়তো বাংলাদেশই আবার নতুন পথের সন্ধান দেবে।

বইটির ভাষা এত সুন্দর ও সাবলিল যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনিরুদ্ধ গতিতে তা পড়ে ফেলা যায়। বিপুল ইতিহাসকে অল্প কথায় গুছিয়ে বলার মুন্সীয়ানাও প্রশংসনীয়। বাঙালি পাঠকের কাছে বইটির প্রচার বাঞ্ছনীয়, কিছু সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও।

প্রখ্যাত গান্ধীবাদী চিন্তাবিদ শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *বাঙলা ও বাঙালী* বইটি লেখকের চল্লিশ বছর কালের ২৭টি ছোটো-বড়ো প্রবন্ধের সংকলন। ভূমিকা লিখেছেন অন্নদাশংকর রায়। বিহার বাঙলা আকাডেমির উদ্যোগে ১৯৯০ সালে বই হিসাবে প্রকাশিত হয়। বইটির কোথাও গুরুভার পাণ্ডিত্যের দাপট নেই। আছে দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা ও মমত্ববোধের অকৃত্রিম প্রকাশ। ''উত্থান পতনের ঊর্ধ্বে বাঙলা ও বাঙালীর একটা শাশ্বত রূপে''র সন্ধান রচনাগুলির ঐকতান।

বাঙলা ও বাঙালির সম্বন্ধে আলোচনা লেখক পশ্চিমবঙ্গ অথবা তার বাসিন্দাদের পরিধির মধ্যে সীমিত রাখা উচিত মনে করেন নি। এই বাঙলা রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে তার ''আধ্যাত্মিক সত্তাকে স্পর্শ করে''। তাই পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ এবং আন্দামানের বাঙালি (যারা একক জনগোষ্ঠী হিসাবে বৃহত্তম) লেখকের আলোচনার পরিধিতে এসেছেন।

লেখক একজন কল্পিত বন্ধুর সঙ্গে কথোপকথনের ভঙ্গিতে সরসভাবে অনেকে গম্ভীর প্রশ্নের অবতারণা করেছেন এবং বন্ধুর মুখ দিয়ে তার উত্তরও দিয়েছেন। বাঙালির বিবর্তন, বাঙালির সংস্কৃতি ও ভবিষ্যত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কখনও কখনও খুব রূঢ় উত্তরও শুনিয়েছেন বন্ধুর মুখ দিয়ে, যা আসলে তাঁর নিজেরই মত। যেমন, ''বাঙালির সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। বাঙালির বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে — তার পৃথক সংস্কৃতি নেই।'' কারণ, ''সমগ্র পৃথিবীতে মাত্র একটিই সংস্কৃতি আছে, আর তার নাম মানবীয় সংস্কৃতি।''

বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতির মধ্যে কী পার্থক্য তিনি করতে চেয়েছেন তা স্বচ্ছ নয়। মানবতাবোধ ও স্বার্থহীনতা ছাড়া সংস্কৃতি বলতে তিনি অন্য কোনও কিছুকেই গুরুত্ব দিতে নারাজ। পৃথিবীতে একটিই মাত্র সংস্কৃতি আছে; মানবিকতাকে বড়ো করতে গিয়ে এটা বলা বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি বলেই বিবেচিত হবে।

বর্তমান বাঙলা ও বাঙালি সমাজের অধঃপতনের মূলে স্বার্থপরতা ও লোভই প্রধান। সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতিদ্বারা সে রাহুগ্রস্ত। জন্মের পর থেকে প্রায় দেড় শতাব্দী কাল বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বর্ণযুগ ছিল। কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে দেখা যাচ্ছে '' মহাকাল মধ্যবিত্ত বাঙালির কপালে মৃত্যু-পরোয়ানা অঙ্কিত করে দিয়েছেন'' (পৃঃ ৪০)। লেখকের মতে বাঙালি যদি উৎপাদন কর্মে কায়িক শ্রমে আরও বেশি করে অংশগ্রহণ করে এবং কৃষিশিল্পের (Agro-Industry) বিস্তার ঘটাতে প্রয়াসী হয় তবেই তার বাঁচার পথ সে খুঁজে পেতে পারে। যে ভূমি সংস্কারের কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় তাতে চমক থাকলেও বাস্তব সমস্যার সমাধান তাতে কিছুই হবে না এবং হয়ও নি।

বাঙালি জাতিটাকে ''খয়রাতি সাহায্যের'' ওপর নির্ভরশীল করিয়ে ''ভিখারীর জাতে'' পরিণত করা হয়েছে। অনুৎপাদক সরকারী কর্মচারীরা তার কাছে ''বুলবুলি বাহিনী''। তাদের ধান যোগাতে ও তোয়াজ করতেই সরকারের ভাঁড়ার শূন্য। সুতরাং বাঙালি যুবক যুবতীদের স্বাধীন কৃষক বা শ্রমিক দুই হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

যে কালোছায়া বাঙালির জীবনে ক্রমপ্রসারমান হতে হতে আজ প্রায় গোটা জাতিটাকেই ঢেকে ফেলেছে তা হচ্ছে শ্লোগানধর্মী সংকীর্ণ রাজনীতি। দলীয় রাজনীতিকদের গুরুত্ব না দিয়ে শিল্প, সাহিত্য, সংগীত বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরই সমাদর করা উচিত। রাজনীতিকদের অর্থ ও বিজ্ঞাপনের আশায় যেন এই সব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সামনে ডেকে এনে না বসানো হয়। কারণ, ইতিমধ্যেই 'বিপ্লবের' নামে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মন থেকে রাজনৈতিক নেতারা ''শ্রদ্ধা





সমীহ ইত্যাদি সদর্থক অথবা লজ্জা সঙ্কোচ ইত্যাদি নেতিবাচক''-মানসিকতার প্রভাব অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিয়েছে। রাজনীতির প্রসঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গের সমাজবিরোধী ও মস্তানদের অনুপ্রবেশের কথা বলেছেন। কিন্তু বাংলাদেশও এই দুঃখজনক অবস্থা থেকে মুক্ত কিনা তা আমরা জানতে পারি নি। তবে একথা অনেকেই মানবেন যে ''এই মস্তানধর্মী রাজনীতির পরিণামে বাঙালির সভ্যতা-সংস্কৃতি যে অধোগতি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সব বাঙালীর রুখে দাঁড়াবার সময় হয়েছে।'' (পৃঃ৫৬)

বাঙালির বর্তমান অধোগতির জন্য লেখকের গভীর বেদনাবোধের অংশীদার হয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। 'স্বর্ণযুগের বাঙালি জীবনে বাঙালি যুবকযুবতী ও নারীর দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবন থেকে আজকের বাঙালি যুবকযুবতী বা নারীর কোনও ভিন্ন প্রগতিশীল মাত্রা কি লেখকের চোখে পড়ে নি? আজকের বাঙালি-নারীপুরুষ নির্বিশেষে কি অকুণ্ঠ পরিশ্রমী ও সাহসী নয়? 'বাবু সংস্কৃতি' ও কোচান ধুতি ছেড়ে এসে কি খুব ভুল বাঙালি করেছে? তবে গোলমালটা কোথায়? কতগুলি শাশ্বত মূল্যবোধ — শ্রদ্ধা, স্বার্থহীনতা, ভালোবাসা ইত্যাদি আমাদের মধ্যে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। আসলে জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলচিত্ত ও উন্মার্গগামী যুবকযুবতীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা সংগঠিত। তাই তাদের দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়ে বেশি।

কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে তারই পাশাপাশি চলেছে সুস্থ সবল খেটে-খাওয়া সাধারণ বাঙালি যুবকযুবতীব মৌন স্রোত। এরাই ভরসা।

বইটির প্রতিটি প্রবন্ধই চিন্তাসমৃদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রেই তার বক্তব্যের সঙ্গে দূরদেশ-বাসী আরেক জন বিদগ্ধ বাঙালি চিন্তাবিদ নীরদচন্দ্র চৌধুরীর বক্তব্যের সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভগ্ন জাতিকে দুর্দশার পার থেকে টেনে তোলার প্রচেষ্টায় লেখকের আকুতি অনন্য। এবং এ জন্য তিনি সুদূর আন্দামানের বাঙালিদের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বাঙালি আজ ''আত্মঘাতী''। কিন্তু লেখকের ভাষায় ''উত্থান পতনের ঊর্ধ্বে বাঙলা ও বাঙালীর একটা শাশ্বত রূপ আছে।'' অবশ্যই আছে, এবং এখানেই আছে বাঙালির বিশ্বাসের জগৎ। পরিশেষে, সুমুদ্রিত ও সুপাঠ্য এই বইটির প্রচ্ছদে আছে খাঁটি বাঙালি ঘরানার ছাপ যা সত্যিই প্রসংসনীয়

*গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাঙলাদেশ* হাবিবুর রহমান বাংলা একাডেমী ঢাকা কুড়ি টাকা

*বাঙলা ও বাঙালী* শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিহার বাঙলা আকাডেমি পাটনা-৮০০০০১ মূল্য ত্রিশ টাকা

# বাংলাদেশের দুই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের জীবন ও সাধনা

নিবেদিতা চক্রবর্তী

আজাহারউদ্দিন খান রচিত *মেধাবী নীলিমা* ও *রক্তাক্ত প্রান্তর: বিষন্ন নায়ক* গ্রন্থদুটি মূলত পূর্ববাংলার দুই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের জীবন ও সাধনার ইতিহাস বলা যায়। সেই সঙ্গে নির্দ্বিধায় এ কথাও উচ্চারণ করা যায় যে পুববাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের দুই বিরল জ্যোতিষ্কের পথ পরিক্রমার মধ্যে সমগ্র পূর্ববঙ্গীয় বাংলা সাহিত্য সাধনার নানা ধারা বিকশিত হয়েছে।

*মেধাবী নীলিমা* অখণ্ড বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যসেবী ও চিন্তানায়ক ডকটর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের জীবন ও সাহিত্যের এক নির্মোহ মূল্যায়ন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে পশ্চিমবাংলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার পেয়ারা গ্রামে এই মহান ব্যক্তিত্বের জন্ম। কর্মোপলক্ষে ঢাকার বাসিন্দা শহীদুল্লাহ সাহেব বাংলা সাহিত্যের প্রায় সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন। দেশবিভাগের পর ঐ বাংলার পঠন-পাঠন, গবেষণা, নানা ধরনের লেখালেখি সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত প্রায় সমস্ত কাজেই নিজেকে উজার করে দিয়েছেন। এমন দুর্লভ প্রজ্ঞাবান মানুষ তখন ঐ বাংলায় প্রায় কেউ-ই ছিলেন না বলা চলে। বাংলা সাহিত্যের সৃজনকর্ম ও তার লালন-পালন প্রায় সব কিছুর দায়িত্বই এই বিশাল কর্মময় ব্যক্তিত্বের উপর বর্তেছিল। অর্থাৎ সূচনাপর্বের সুষ্ঠু পরিচালক তাঁকে বলা যায়।

আজাহারউদ্দীনের দ্বিতীয় গ্রন্থ *রক্তাক্ত প্রান্তর: বিষন্ন নায়ক*-এর বিষয় বাংলাদেশের প্রখ্যাত নাট্যকার, গল্পকার, সমালোচক প্রাবন্ধিক ভাষাতাত্ত্বিক, মরমী অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর বিষন্নতাময়, বর্ণবহুল, ঘটনাতরঙ্গিত, বেদনা-রক্তিম জীবনছবি।

দুটি মহান ব্যক্তিত্বের পরিক্রমা আমাদের বিভাগপরবর্তী পূর্ববাংলার সামগ্রিক সাহিত্য সংস্কৃতিকে চোখের সামনে হাজির করে। দুটি মানুষের জীবন ও কর্মের মধ্যে ধরা

রয়েছে নতুনভাবে জেগে ওঠা, গড়ে ওঠা একটি জাতির হৃদস্পন্দন।

নির্ভীক শান্ত, অনলস, এক জ্ঞান-তাপস, মানবদরদী শহীদুল্লাহ সাহেবের কীর্তি এ-বাংলার মানুষের কাছে যথাযথ ভাবে পৌঁছে দিয়ে আজাহারউদ্দীন খান একধরনের ঋণ স্বীকার ও শোধ করার চেষ্টা করেছেন। একদা এ-বঙ্গের সন্তান শহীদুল্লাহ সম্পর্কে দেশবাসীর প্রায় নিরুত্তাপ ভঙ্গি লেখককে ব্যথিত ও আহত করেছে। জীবনী সাহিত্য রচনা করতে হলে যে সতর্ক সাবধানতা ও সংযম দরকার লেখকের তা আয়ত্তাধীন। এখানে লেখক জ্ঞানতাপস অধ্যাপকের সারাজীবনের কীর্তি ও জীবনদর্শনকে নানা তথ্য ও ঘটনার মধ্য দিয়ে যে ভাবে উপস্থিত করেছেন তাতে শব্দবিদ শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রতি এপার বাংলার সমগ্র সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের শ্রদ্ধাই উচ্চারিত হয়েছে।

বাংলা ভাষার যথার্থ অভিধান রচনা করতে হলে বাংলা উপভাষাগুলির সঙ্গে সম্যক পরিচিত হওয়া দরকার — আচার্য সুনীতিকুমারের এই আদর্শ মেনে শহীদুল্লাহ অভিধান রচনার আন্দোলন শুরু করেন। বাংলা উপভাষার ধ্বনি ও রূপতত্ত্ব নিয়ে নানা গুণীজনের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করেছেন। বাংলাভাষায় সম্পূর্ণ আঞ্চলিক অভিধান ছিল না, যা ইতিপূর্বে রচিত হয়েছিল তা খণ্ডিত। লোকসাহিত্য বা আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে তিনি লোকসাহিত্য সংগ্রহ সমিতি গড়েছিলেন। নানা সংগ্রাহকের সাহায্যে এক বিপুল কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন যা সমগ্র বাংলা সংস্কৃতিকেই প্রভাবিত করে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা লোকসাহিত্যের যে ধারা তৈরি করেছিলেন তার অনুপ্রেরণা নিঃসন্দেহে ড. শহীদুল্লাহ সাহেব। অভিধান রচনা, ভাষাতাত্ত্বিক নানা নিরীক্ষা ভাষাকে এক চলমান গতি দেয়। আচার্য সুনীতিকুমার ও শহীদুল্লাহ দু-জনেই ভাষাচর্চা ও চর্যায় নিবেদিত-প্রাণ মানুষ। তবু এই বঙ্গে ড. শহীদুল্লাহ সুনীতিকুমারের মতো সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব নন।

প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে মুনীর চৌধুরীর আবির্ভাব। এই বিরল প্রতিভাধর মানুষটি এক অভিজাত পরিবারের সন্তান। কিছুদিন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় পরে ঢাকা ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও সম্মান লাভ ঘটে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে ইংরেজি বিভাগে পরে পাকাপাকিভাবে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। শহীদুল্লাহের মতোই সার্থক ছাত্রদরদী শিক্ষকটি শিক্ষার পাশাপাশি বিচিত্র সৃজনকর্মে নিজেকে ব্যাপৃত, মগ্ন কখনও উত্তাল করে তুলেছেন। রাজনীতির দোলাচলতা তাঁকে স্পর্শ করেছে। রাজরোষে একাধিক বার হাজতবাস ঘটেছে। এত কিছুর মধ্যে সৃজনকর্মে কখনও ভাটা পড়ে নি। নাটক রচনায় তার দক্ষতা ও সহজাত-ক্ষমতা বিস্ময়কর ছিল। বেতার সম্প্রচারের প্রয়োজনে বহু একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন। এর অনেক রচনাই সাময়িকতাকে অতিক্রম করেছে। বহু বিখ্যাত বিদেশী নাটক তিনি অনুবাদ করেছেন। একটি অসমাপ্ত নাটকের অনুবাদ তাঁর সহধর্মিনী লিলি চৌধুরী সম্পূর্ণ করেছেন।

*রক্তাক্ত প্রান্তর, কবর, নষ্টছেলে* - প্রভৃতি বহু নাটক ও একাঙ্কিকা রচনা তাঁকে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী ও স্বতন্ত্র আসন দিয়েছে। প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা পরবর্তী, দেশকাল, সমাজ, মানবজীবন, রাজনৈতিক জীবনের উচ্চাবচ্চতা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ধরা রয়েছে।

ছাত্রবৎসল শিক্ষক, আন্তর্জাতিক সম্মানে স্বীকৃত ভাষাতাত্ত্বিক, গদ্যশিল্পী, নাট্যকার — তাঁর সীমিত জীবনে বড়োই বিষণ্ণ ও নিঃসঙ্গ ছিলেন। কোন কোন সহকর্মী, নিকটজন এমনকি পরিবারের ঘনিষ্ঠজনেরা তাঁর কর্মপন্থার তীব্র সমালোচনা করেছেন। রাজনীতি করা ও ছেড়ে দেওয়া — দুটি পর্যায়েই তাঁকে কঠোর বিরোধিতার মুখোমুখী হতে হয়েছে। মুনীর চৌধুরী এমন একটি নাম যার উচ্চারণ বাংলাদেশের মানুষকে ভাবায়, উদ্বেলিত করে, বেদনায় ক্ষুব্ধ করেও তোলে। অজ্ঞাত ঘাতকের হাতে এমন একটি জীবনের পরিসমাপ্তি কল্পনাও করা যায় না। ১৯২৫-এর ২৭ নভেম্বর যে মানুষটি অসীম সম্ভাবনা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন ১৯৭১-এর ১৪ ডিসেম্বর তাঁর পিতৃভবন থেকে অপহৃত হয়ে চিরকালের মতো হারিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল একটি সৃষ্টির স্বাভাবিক উৎসারণ।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সুদীর্ঘ স্বাস্থ্যল জীবন তাঁর আরাধ্য পথ যাত্রায় সাহায্য করেছে। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ্ ভাষাতাত্ত্বিক, শিক্ষক ও সমাজসেবী। তাঁর সম্পর্কে সুনীতিকুমারের সশ্রদ্ধ উচ্চারণ সমগ্র বাঙালি জাতিরই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন হিসাবে ধরা যায়। তিনি শোক প্রকাশ করে বলেছেন, ''তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী, বাঙলার প্রতি ভালবাসাও ছিল অপরিসীম, বাঙালি .... সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্যেও তিনি কাজ করে গেছেন। তাঁর বেশ রসজ্ঞান ছিল............। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ।''

হিন্দুমুসলমান একতা আনতে হলে মুসলমান সমাজকে উন্নত হতে হবে বলে তিনি মনে করতেন। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে ভাবে সাহিত্যকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে,



মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি সাহিত্যে সমান গুরুত্ব পেলে তবেই তা সমগ্র বাঙালির সম্পদ হয়ে উঠবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমন্বয় ও সমতা এলে তবেই একটি জাতি বলিষ্ঠ হতে পারে এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ''একজাতি হইতে গেলে এক পর্ব দিন চাই। আমি মনে করি ১লা বৈশাখকে আমরা জাতীয় নববর্ষ দিন করিয়া লইতে পারি।'' তাছাড়া বহু মহাপুরুষের জন্মদিনকেও এভাবে 'পর্বদিন' হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়ে সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। এই সবের ভিতর দিয়ে তিনি সম্প্রদায় বিরোধী, সমন্বয়বাদী জাতি হিসেবে বাঙালি জাতিকে দেখতে চেয়েছিলেন এবং এই ইচ্ছারই রূপান্তর পাকিস্তান থেকে বাঙলাদেশে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জ্ঞানের মশালটি জ্বেলে দিয়েছিলেন মুনীর চৌধুরী বিপুল সামর্থ্যে তাকে বহন করে মধ্যপথে হারিয়ে গেলেন। সেই মশাল বহনের দায়িত্ব পরবর্তী প্রজন্মের হাতে।

আজাহারউদ্দীন রচিত জীবনী গ্রন্থ দুটি সুরচিত বলা যায়। তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থদুটি কৌতূহলী পাঠকের পক্ষে রোচক হবে আশা করা যায়। *মেধাবী নীলিমা*-তেকয়েকটি মূল্যবান চিঠি সংযোজিত হয়েছে। তাছাড়া নানা তথ্যপঞ্জী দুটি গ্রন্থের শেষে সন্নিবেশিত করে জীবনীকার পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইদুটির নামকরণের কাব্যিকতা বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট হতে দেয় নি অবশ্য।

*মেধাবী নীলিমা*আজাহার উদ্দীন খান্ সাহিত্যশ্রী : কলি : ৯ দাম : ৩২ টাকা *রক্তাক্ত প্রান্তর : বিষণ্ণ নায়ক* ঐ অনন্যপ্রকাশন লি : ৭৩ দাম- ১৫ টাকা

## স্মৃতি সুধা

**ভবতোষ দত্ত**

'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়' একটি উপন্যাসকল্প দাম্পত্য প্রেমের বিবাহপূর্ব উন্মেষ এবং বিবাহোত্তর প্রেম এবং নায়িকা ভবানীর মৃত্যু দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কাহিনী। একে ঠিক উপন্যাস বলা যায় না, তার কারণ এর প্রায় সবটাই বাস্তবে সংঘটিত কাহিনী। ফলে উপন্যাস শিল্পের বিন্যাস (জীবনের সঙ্গে তুলনায় যা অবশ্যই কিছু কৃত্রিম) এতে নেই। আবার এই ব্যক্তিগত কাহিনী সমস্ত বাস্তবতা নিয়েও এমন এক নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের স্মৃতিচারণায় পরিণত হয়েছে যে তার রস সৃষ্টির বিশেষত্বকে স্বীকার না করেও উপায় নেই।

খুলনা জেলার একটি ছোট ঝোপঝাড়-পুকুর ঢাকা শহরে যে দুই কিশোর-কিশোরীর প্রেমের উন্মেষ, তার পরিণতি কলকাতায় পঞ্চাশ বছরের দাম্পত্য জীবনের অবসানে। এই শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে অষ্টম দশক পর্যন্ত ব্যাপ্ত এই কাহিনী কেবল নিভৃত আত্মবিস্মৃত প্রণয়কূজন নয়, সমাজের বিস্ময়কর পরিবর্তন এবং জীবনসংগ্রামের কঠোরতার মধ্যে সেই কৈশোর প্রেমের মগ্ন উপাখ্যান। দাম্পত্য প্রেম স্নিগ্ধ উপসংহারে পৌঁছেছে পুত্রকন্যাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের মধ্যে।

আপাতদৃষ্টিতে এই কাহিনীতে লোককে শোনাবার মতো চমকপূর্ণ ঘটনা নেই। একটি মফঃস্বলের তরুণ কিশোর জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে সংগ্রাম করেছে, লেখকের বর্ণনার সে বিবরণ কখনোই তীব্র মর্মঘাতী হয়ে ওঠে নি। পাঠক সে সব চোখের সামনে দেখতে পান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এবং পরে তখনকার এক তরুণ নায়কের জীবনযুদ্ধের পটভূমি হিসাবে। এই নায়কের প্রাণে প্রেমের ব্যাকুল প্রেরণা নিভৃতভাবে লালিত হয়ে তাকে শক্তি দিয়েছে। অসামান্য সংযম এবং সুরুচি নায়ককে সাধারণের মধ্যে অসাধারণ করে তুলেছে। প্রেমই এই কাহিনীর মুখ্য উপজীব্য, সমাজচিত্রণ থাকলেও তা মুখ্য নয়। বরং সমাজজীবনের বাস্তবতার অভিঘাতে প্রেম উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে।

আর এর অসামান্য সুন্দরী নায়িকা — যে নিভৃতে তার হৃদয়কে উৎসর্গ করে য়েছে। তার নিষ্ঠা এবং অনুরাগ এক বিচিত্র সার্থকতায় তৃপ্ত। তার চরিত্রটিও বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যময় এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ। লেখক এই নায়িকার চরিত্রটিকে যেভাবে এঁকেছেন তাতে তাকে দেখলে মনে হয় যে যেন এক অতল গভীরতাকে বহন করে চলেছে। সংসারের দুঃখ কষ্ট গ্লানি কেবল উপরে উপরে ক্ষণিক তরঙ্গ তুলতে পারে কিন্তু গভীরতাকে আলোড়িত করতে পারে না।

'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়'তে এই দুই চরিত্রই প্রধান। কিন্তু আনুষঙ্গিক আরও চরিত্র এসেছে — আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু, প্রতিবেশী। লক্ষ্য করা গেল এদের মধ্যে দুর্জন প্রায় কেউ নেই — দু-একজন নেই এমন নয়। কিন্তু লেখক খুব হালকাভাবেই তাদের বর্ণনা দিয়েছেন। বরং ভালোলোকের সাক্ষাৎই যেন তিনি বেশি পেয়েছেন যাঁরা তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে আনুকূল্য করেছেন। কল্পিত দুর্জন চরিত্র এনে লেখক উপন্যাসে নাটকীয়তা সৃষ্টি করবার প্রলোভন সংবরণ

করেছেন।

এই উপন্যাসের টেকনিকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সারাজীবনের সযত্ন সঞ্চিত চিঠির থেকে উদ্ধৃতি এবং উল্লেখ দিয়ে এর গ্রন্থনা। চিঠিগুলি অবলম্বন, লেখকের (এখানে নায়ক সত্যেনের বন্ধু গোবিন্দ) দেওয়া বিবরণ দিয়েই এই উপন্যাস। সত্যেনের সঙ্গে নায়িকা ভবানীর ভালোবাসার কাহিনী পরস্পরের লেখা চিঠিপত্রের সাহায্যে বলতে গিয়ে গোবিন্দ কখনও কখনও নিজেকে সত্যেনের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছে। তাই পাঠকের সন্দেহ জাগে সত্যেন নামটার আড়ালে এ কাহিনী গোবিন্দর। আবার দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক গোপাল মজুমদার, প্রবোধচন্দ্র সেন এবং কলকাতার ডাক্তার ঘোষ আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি যেমন ভাবে এসেছেন — তাতেও মনে হয় সমস্ত কাহিনীটাই কল্পিত গোবিন্দ নয়, লেখক সন্তোষকুমার দে-রই দীর্ঘ আত্মগুঞ্জন, একটা স্মৃতিভারাতুর দীর্ঘশ্বাসের মতোই উচ্চারিত।

*ভরা থাক স্মৃতিসুধায়* সন্তোষকুমার দে (উপন্যাস) ৪০ টাকা ডি.এম.লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণি, কলিকাতা -৬

## জাস্টিস মাসুদ

**শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**

কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-শিল্প-সমাজসেবা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবত বিচারপতি সাদাত আবুল মাসুদ বা সংক্ষেপে এস এ মাসুদ এক উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর বিশিষ্ট ক্ষেত্র আইন ও আদালতের কথা ইচ্ছা করেই গৌণ রাখা হচ্ছে, যদিচ সেক্ষেত্রেও তাঁর স্থান প্রথম সারিতে। সম্প্রতি (৩ জানুয়ারি, ১৯৯১ খ্রিঃ) পরলোকগত ঐ সৌম্যদর্শন, মৃদুভাষী, অপরকে সাহায্যের জন্য সদা সম্প্রসারিতহস্ত — এক কথায় বিশিষ্ট ভদ্রলোক মাসুদ সাহেবের স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর দীর্ঘ দিনের বন্ধু এবং বাংলাদেশের অগ্রগণ্য সাহিত্যিক শওকত ওসমান।

বলা বাহুল্য এটি মাসুদ সাহেবের পূর্ণাঙ্গ জীবনী নয়। ইংরেজিতে যাকে Pen picture বলে তাই, হৃদ্যতার প্রীতিনিষিক্ত। তবে লেখকের দীর্ঘ দিনের অন্তরঙ্গতা এবং স্বাভাবিক লিপি কুশলতায় ও বিশেষ করে কয়েকটি চিঠি উদ্ধৃত করায় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আয়তন সত্ত্বেও মাসুদ সাহেব জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। সেই দিক থেকে লেখক শওকত ওসমান উভয় বঙ্গের সংস্কৃতিপ্রেমী নর-নারীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

হালকা চালের রচনাশৈলীর মধ্যে লেখক পাক-ভারত (এবং বর্তমানে বাংলাদেশেরও) সম্বন্ধের ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনিয়েছেন। মুসলমানদের বৃহদংশ পাকিস্তান চাইলেও দেশবিভাগের পর ''অধিকাংশ মুসলমানের জান্ পড়ে রইল পাকিস্তানে যদিও ধড় হিন্দুস্থানে। পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য ব্যাপার তেমনি উল্টো ভাবে।'' আবার : ''দেখা গেল, চব্বিশ বছর পরেও দ্বিজাতি তত্ত্বের ভূত কিভাবে মুসলমানদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে আছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে 'জয় বাংলা' স্লোগান উদ্দীপনামুখর প্রেরণাময় ঐক্যতান হয়ে ওঠে। সেই স্লোগান পর্যন্ত স্থানীয় মুসলমানদের নিকট উপহাসের টার্গেট হয়ে দাঁড়ায়।.....বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রথম দিকে অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানদের অকুণ্ঠ সমর্থন পায়নি।''(পৃঃ ১০)।

লেখক আর একটি তথ্য দিয়েছেন যা সাম্প্রতিক কালের পাঠকদের কাছে সুবিদিত নয় বলে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। পাক-ভারত স্বাধীনতার প্রাক্কালে মাসুদ সাহেবের সুপরিচিত নাসিরউদ্দীন রোডের বাড়িতে উভয় দৃষ্টিভঙ্গির বুদ্ধিজীবীদের জোরালো বিতর্ক সভা বসে। দুই বিশিষ্ট বক্তার একজন তরুণ আইনজীবী বি এ সিদ্দিকী (বর্তমানে বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি) ''ঘোর ঘোর পাকিস্তানী''। অপর তরুণ আহমদুল কবির (বর্তমানে ঢাকার *সংবাদ* পত্রিকার সম্পাদক) ''নিরাবেগ যুক্তি-আরোহী, দার্ঢ্য বনিয়াদের সন্ধানী'' এবং স্বভাবতই প্রথমোক্ত বক্তার বিপরীত শিবিরের অধিবাসী। যেটা এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় তা হল ''সেই সভায় অধিকাংশ আলোচনা পাকিস্থান আন্দোলনের বিপক্ষে যায়।'' (পৃঃ ১৪)

কিন্তু গোড়াতেই যেমন বলা হয়েছে পাক-ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক, ইতিহাস বা রাজনীতি শওকত ওসমান সাহেবের এ-গ্রন্থের উপজীব্য নয়। এ গ্রন্থের কেন্দ্রবিন্দু বিচারপতি মাসুদ সাহেব, যিনি তাঁর উদার যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং দরদী মনের জন্য কেবল এই বঙ্গের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অতীব বাঞ্ছিত সেতুই ছিলেন না, উভয় বঙ্গের মধ্যেও ছিলেন সংবেদনশীল যোগসূত্রস্বরূপ। সেই দিক থেকে লেখকের এই প্রয়াস অকুণ্ঠ অভিনন্দনযোগ্য। অনুযোগ কেবল এই যে লেখক ব্যক্তিগত আবেগের স্তরে নিরস্ত না হয়ে যদি আর একটু তথ্যনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতেন তবে



''শান্তিনিকেতনের উপাচার্য স্বয়ং ভারতের প্রধানমন্ত্রী''(পৃ ৩০) জাতীয় ভুল, অথবা তাঁর সমাজসেবার কর্মসূচিতে, পঃ বঙ্গের গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটি এবং এজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের উল্লেখ (যদিও এসব তথ্য মাসুদ সাহেবের দুই ভাই-এর কাছে প্রাপ্ত বলে লেখক উল্লেখ করেছেন) বাদ যেত না।

মাসুদ সাহেবের জীবন-দর্শনের যে প্রেরণা তাঁর সুহৃদ শওকত ওসমান সাহেবকে এই মূল্যবান স্মৃতি-চিত্র রচনায় অনুপ্রেরিত করেছে, তা যত বেশি মানুষের হৃদয়ে অনুরণন তোলে উভয় বাংলার অধিবাসীদের পক্ষে ততই মঙ্গল।

***গুডবাই জাস্টিস মাসুদ*** **শওকত ওসমান সাগর পাবলিশার্স ঢাকা মূল্য ২৫ টাকা মাত্র**

## কার্পেটের অন্যদিক ও 'নরকে এক ঋতু'

**মঞ্জুষ দাশগুপ্ত**

প্রখ্যাত রুশ কবি রসুল গমজাতভ-এর মতে অনুবাদ হল কার্পেটের অন্যদিক। প্রতিদিনকার অজস্র অনুবাদকর্ম প্রসঙ্গে প্রবাদপ্রতিম অভিযোগটি যে কত সত্য তা আমরা প্রায়শই লক্ষ করে থাকি। কিন্তু কিছু কিছু অনুবাদ এতটাই মূলানুগ যে তখন মনে হয় এই উক্তিটি পুনর্বিবেচিত হবার অপেক্ষা রাখে। এমনি একটি যোগ্য ভাষান্তর কর্ম *নরকে এক ঋতু* — অনুবাদক বাংলার সুপরিচিত কবি লোকনাথ ভট্টাচার্য। প্রথম যৌবনের পরিশ্রমী নিষ্ঠায় লোকনাথ ভট্টাচার্য র‍্যাঁবোর এই অসাধারণ কাব্যগ্রন্থটির অনুবাদ করেছিলেন পঞ্চাশের গোড়ার দিকে। প্রকাশিত হয়েছিল নাভানা থেকে ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে — র‍্যাঁবো শতবার্ষিকীতে। পরে নবার্ক থেকে ফিরে বেরুল এইতো সেদিন পুরনো অঙ্গসজ্জায় — সুধীর চট্টোপাধ্যায়ের ব্যতিক্রমী প্রচ্ছদটি আবার দেখা গেল।

*নরকে এক ঋতু* (une saison en enfer) র‍্যাঁবো লিখেছিলেন ১৮৭৩ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বছর। তাঁর আগের বছরের রচনা 'Les Illuminations' যেন এই কাব্যগ্রন্থের অগ্রদূত। প্রথাপ্রবল ছন্দকে নির্বাসন দিয়ে রচিত এই দুটি গ্রন্থ ফরাসি সাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের আভাস দিয়েছিল সেদিন। আর্তুর র‍্যাঁবোর মতে কবি একজন দ্রষ্টা 'Un Voyant' কিন্তু তিনি এরই সঙ্গে যোগ করলেন : 'It s'agit d'arriver à l'inconnu par le déreglement de tous les sens' সমস্ত অনুভবের শৃঙ্খলা-বিহীনতার দ্বারাই পৌঁছে যেতে হয় অচেনার কাছে। যদি বিশৃঙ্খল আবেগের ফেনিলতা অন্তিম বাস্তবতাকে মূর্ত করে তুলতে চায় তাহলে তার জন্যে প্রয়োজন শব্দের ম্যাজিক। তাই শব্দ তাঁর কাছে এতটা জরুরি হয়ে যায় এবং নিজস্ব কাব্যভাষা অনুসন্ধান করতে করতে লিখে ফেলেন গ্রন্থ দুটি। একা তিনি হেঁটে গেছেন প্রতীকী নির্মাণের যেন শেষ সীমা পর্যন্ত এবং উপলব্ধি করেছেন ভাষা ধরতে পারে নি তাঁর দর্শন। শেষাশেষি কবিতা লেখা ছেড়েই দিয়েছিলেন।

ফরাসি কবিতার জগতে কিংবদন্তিপ্রতিম এই কবির প্রতিটি লেখাই প্রহেলিকাময়। তাঁর জীবনযাপন, উচ্চাশা, ব্যর্থতার একটি মরমী আলেখ্য রচনা করেছেন অনুবাদ গ্রন্থটির প্রারম্ভে অনুবাদক কবি। সহজ সাবলীল সুবিন্যস্ত সেই রচনাটি পাঠকের এক মূল্যবান সম্পদ হয়ে যায়। র‍্যাঁবো লোকনাথ ভট্টাচার্য-এর 'অন্যতম প্রিয়তম কবি' কিন্তু কোথাও তাঁর মুগ্ধতা প্রতিবন্ধের কাজ করে নি। উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য তাঁর হাত থেকে কখনো লাগাম তুলে নেয় নি। র‍্যাঁবো চর্চায় আগ্রহী যে কোনো বাঙালি পাঠককে এই ভূমিকাটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। অবশ্যই গ্রন্থটিও।

অনুবাদ কর্মের সর্ত হল মূলভাষা এবং লক্ষ্যভাষায় সমান দক্ষতা — লক্ষ্যভাষায় আপেক্ষিক দক্ষতা একটু বেশি হলেই যেন ভালো। লোকনাথ ভট্টাচার্য বাংলা এবং মূল ফরাসি ভাষায় সমান পারঙ্গম বলেই এমন একটি উল্লেখযোগ্য ভাষান্তর কর্ম আমাদের উপহার দিতে সক্ষম হয়েছেন। র‍্যাঁবোর কবিতা কতটা যত্নে তিনি যে অধ্যয়ন করেছেন তা বুঝতে পারা যায় সাবলীল অনুবাদ পড়তে পড়তে। মূল কবিতার রসগ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা ঘটছে না — আমরা পেয়ে যাচ্ছি র‍্যাঁবোর কবিতার রহস্যময় শব্দের ম্যাজিক। বলতে দ্বিধা নেই কখনো কখনো এমনও মনে হয়েছে অনুবাদক লোকনাথ ভট্টাচার্য কবি বলেই এমনটি সম্ভব হয়েছে। মনে পড়ে যায় র‍্যাঁবোরই কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে রবার্ট লোয়েল বলেছিলেন : 'কেউ নিজে কবি না হলে তাঁর পক্ষে অপর ভাষার কবিতাকে নিজভাষার কবিতা করে তোলা সম্ভব নয়।' অনুবাদ কবিতার প্রতি 'প্রায়' আক্ষরিক আনুগত্য রক্ষা করে লোকনাথ ভট্টাচার্য বাংলা অনুবাদ কবিতার জগতে একটি স্মরণীয় নাম হয়ে থাকবেন অন্তত র‍্যাঁবোর *নরকে এক ঋতু* অনুবাদের সূত্রে। পূর্ববর্তী

বাক্যে 'প্রায়' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যেহেতু কোথাও কোথাও অনুবাদক কবি মূল থেকে একটু আধটু সরে গিয়েছেন তবে লেখা বাহুল্য সে খুব অল্প ক্ষেত্রেই এবং তাতে অনূদিত গ্রন্থটির মূল্য কমে যায় নি।

ধরা যাক শেষ কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি: মূল ফরাসিতে রয়েছে:

> L'automne. Notre barque élevée dans les brumes immobiles tourne vers le port de la misère, la cité énorme au ciel taché de feu et de boue.'

এর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন William Rees এভাবে:

> 'Autumn. Our ship raised up in the motionless mists turns towards the port of wretchedness, the vast city, its sky stained with fire and mud.'

লোকনাথ ভট্টাচার্য এর বাংলা অনুবাদ করেছেন:

> 'হেমন্ত। আমাদের নৌকোখানা অনড় কুজ্ঝটিকা ভেদ ক'রে ছুটেছে দুঃখের বন্দরের মুখে — আকাশে এক বিশাল নগরী কলঙ্কিত হ'লো আগুনে আর পাকে।'

বাংলা অনুবাদ অংশটি পড়তে ভালো লাগলেও তিনি যে মূল থেকে একটু সরেছেন এ অভিযোগ এড়াবেন কি করে! এখানে এবং আরো কয়েকটি ক্ষেত্রে যে সামান্য চ্যুতি তা পাঠক অগ্রাহ্য করতেই পারেন। গ্রন্থটির কিছু কিছু অসামান্য অংশ তুলে দিতে ইচ্ছে হয়:

> 'সকল রকম কাজের প্রতি আমার এক অদ্ভুত জবড়জং ভয়। শাসকই হোক, শ্রমিকই হোক, সবাই চাষা, সবাই নীচ, হীনকুলোদ্ভব। লাঙল ধরে যে হাত, তার থেকে কিছু কম নয় যে হাত লেখনী ছোঁয়।'
>
> (দূষিত রক্ত)
>
> 'মেয়েরা চাইতে জানে, সবসময় চায়, শুধু নিরাপত্তা — একটা নিশ্চিন্ত নির্ভয় আশ্রয়। অথচ সেই অবস্থায় যেই সে উঠলো, হৃদয় থেকে সৌন্দর্য তফাৎ হ'য়ে গেলো, অবশিষ্ট হ'য়ে প'ড়ে রইলো এক বিজাতীয় ঠাণ্ডা, বিবাহের পরের খাদ্য আজকের।'
>
> (প্রলাপ - ১ : নারকী প্রেমিক)
>
> 'ঈর্ষা করেছি পশুর সুখ, শুঁয়োপোকার নিরপরাধ বিস্মৃতিলোক, গন্ধমূষিকের কৌমার্যময় তন্দ্রা।'
>
> (প্রলাপ - ২ : শব্দের রসায়ন)
>
> 'আমার এই পাকা দেহটা মৃত্যুতে টুপ ক'রে ঝরে পড়বার জন্যে প্রস্তুত — ঝঞ্ঝাকুল পথে শৈথিল্য আমাকে টানে পৃথিবীর প্রান্তদেশে, ঘূর্ণি আর আঁধারের মাতৃভূমি সিমেরির রাজ্যে।'
>
> (বুভুক্ষা)

যাঁরা এখনো র‍্যাঁবো পড়েন নি তাঁদের জন্যে একটু উদ্ধৃতিশঙ্কুল আলোচনাই করা হল। 'Absolute-কে ছুঁতে চেয়েছিলেন, আঙুল দিয়ে বিঁধতে চেয়েছিলেন র‍্যাঁবো — তা তিনি করে গেছেন অন্তত তাঁর কবিতায়। তাঁর লেখনীকে ব্যবহার করেছেন জাদুকরের সোনার কাঠির মতো।' র‍্যাঁবোর বোন ইজাবেল যাঁকে বলেছিলেন 'পথভ্রষ্ট হতভাগ্য জীব' তাঁকেই শ্রদ্ধার, বিস্ময়ের আসনে বরণ করে নিয়েছিলেন পরবর্তী ফরাসি কবিরা এবং এই বাংলার আধুনিক যুগের সূচনা পর্বের কবিরাও। 'মায়াবী কবি র‍্যাঁবো'র পুনশ্চর্যার প্রয়োজনে যে কোনো গবেষককে লোকনাথ ভট্টাচার্য-এর 'কবিতা' পত্রিকায় ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধটিও পড়ে দেখতে হবে এই অনূদিত কাব্যগ্রন্থটির সঙ্গে।

পরিশেষে আর একটি অনুযোগ করতে চাই। লোকনাথ ভট্টাচার্য যখন *নরকে এক ঋতু* গ্রন্থটির নবার্ক সংস্করণটি প্রকাশ করতে চাইলেন তখন কেন ফিরে সমগ্র গ্রন্থটি আরেকবার সম্পাদনা করলেন না। আমরা পেলাম নাভানা সংস্করণেরই একটি ফটো কপি মাত্র। অথচ ইতিমধ্যে প্রায় তিরিশ বছর পার হয়ে গেছে — তিনি কি র‍্যাঁবো সম্পর্কে ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত আরো অনেক লেখার মুখোমুখি হন নি! অনুমান করি অবশ্যই হয়েছেন এবং তার প্রেক্ষিতে একটি ভূমিকা আমাদের উপহার দিলে উপকৃত হতাম। অন্তত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মায়াবী কবি র‍্যাঁবো' সংযুক্ত হলে কিছুটা তৃপ্তিকর নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যেত।

**_নরকে এক ঋতু_ : র‍্যাঁবো লোকনাথ ভট্টাচার্য অনূদিত নবার্ক, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা ১৯৮৫ ১২ টাকা**

## বিচিত্র কাহিনী

**সুরজিৎ দাশগুপ্ত**

প্রায় পঁচিশ বছর আগে অধীর ঘটক মশায় সাংবাদিকতা পড়তে ব্রিটেনে গিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর বিলাত প্রবাসের কাহিনী বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধাবলির আকারে লিখেছিলেন। এতদিন পরে সেই স্মৃতিকথাগুলি একত্র করে তিনি *ধূসর স্মৃতির দেশে* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর ভালো করেই জানার কথা যে নিছক ঘটনানিষ্ঠ রচনার মূল্য প্রধানত সাময়িক। ফলে এ গ্রন্থের অধিকাংশ রচনার প্রাসঙ্গিকতাই আজ জীর্ণ।





তবে ইমিগ্রান্টদের সমস্যা কি মিটেছে? বরং বেড়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে পৃ.১১৫-১৫৫-র অংশে। এই অংশের বিষয়বস্তুগুলি কোন-না-কোন ভাবে আমাদের জীবনকে এখনও ছুঁয়ে আছে। প্রবাসে থাকাকালে লেখক বিবিসির কিছু বাংলা অনুষ্ঠানও করেছিলেন। বিবিসি ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষা নিয়েই প্রথম অনুষ্ঠান শুরু করে। এই তথ্যটাকে লেখক অগ্রাহ্য করলেন কেন? ভারত স্বকীয় হওয়ার পরে হিন্দি অগ্রাধিকার পায়। আবার বাংলাদেশ জন্মলাভের পরে বাংলা ভাষা বিবিসির অনুষ্ঠানসূচিতে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য গভীর। কিন্তু সেই মুক্তিযুদ্ধের পরিণাম সেখানকার সাধারণ মানুষের জীবনে কী রকম তার খানিকটা ধারণা পাওয়া যায় ওম প্রকাশ ঘোষ রায়ের *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* বইটি থেকে। 'মইষা জোঁক' ও 'হারামজাদী' গল্প দুটিতে দেখি যে পাকিস্তানের আমলে যারা প্রতিপত্তিশালী ছিল স্বাধীন বাংলাদেশেও তারাই মাতব্বর এবং সাধারণ মানুষের জীবনে আজও সেই আগের হাহাকার। এই গল্প সংকলনের সমস্ত গল্পেরই পশ্চাৎপটে আছে আন্তর্জাতিক অর্থে আশ্চর্য উদ্দীপক এবং সাধারণ মানুষের জীবনে তেমনই হতাশাজনক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। তবে অধিকাংশ গল্পই শিথিল ও ভাবালু। যেন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির প্রভাবে লেখকের চিন্তাভাবনা বিস্রস্ত। সংকলনের যে দুটি গল্প মধ্যে গাঁথুনি ও নাটকীয়তা আছে সে দুটি হল 'ধর্ষিতা' আর 'মা'। 'ধর্ষিতা' গল্পে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রীর তথা পারিবারিক জীবনে পরিণামের কাহিনী আর 'মা' গল্পে কঠিন পরিস্থিতিতে একজন মায়ের কঠিন সিদ্ধান্তের কাহিনী পাঠকের অভিনিবেশ ও চেতনাকে চমৎকৃত করে।

*ভারতীয় রূপকথা ও লোককথা*-র গল্পগুলি পরম্পরাগত বহু স্মৃতিসমৃদ্ধ এক গভীর বিস্ময় ও মুগ্ধতার জগৎকে এবং প্রাচীন ভারতীয় কল্পনাবৃত্তি, জীবনধারা ও সংস্কৃতির অপূর্ব পরিচয়কে আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরেছে। সুধীন ঘোষ যখন প্রথম এই গল্পগুলি নির্বাচন করে দুটি সংকলনের আকারে ইংরেজিতে প্রকাশ করেছিলেন তখনই সংকলন দুটি পাশ্চাত্য পাঠকসমাজে প্রচুর সাড়া তুলেছিল। বাংলায় গল্পগুলির অনুবাদ করেছেন সরিৎশেখর মজুমদার। সুন্দর ঝরঝরে অনুবাদ। কিন্তু ঝুলি অর্থে 'ব্যাগ' (পৃ.৮), প্রশস্ত কক্ষ অর্থে 'হলঘর' (পৃ.৯), মোড়ক অর্থে 'প্যাকেট' (পৃ.১৫), ঘোড়দৌড় অর্থে 'রেস' (পৃ.৯৭) প্রভৃতি অনুবাদ সঙ্গত কি? বিজয়োৎসবে 'কত বাজি পুড়লো, বহ্নুৎসব হলো, গান বাজনা হলো' তার বিবরণে (পৃ.১০৩) 'বহ্নুৎসব' শব্দটা কি সুপ্রযুক্ত? মনে হয় অনুবাদক ভাষা নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরিক্ষার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গল্পগুলি এতই আকর্ষণীয় যে ঐ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চোখে পড়ে না। সবশেষের গল্পটি পদ্যে লেখা। সংক্ষিপ্ত রূপ, শাণিত ভঙ্গি। শিক্ষামূলক। বইটির ছাপা বাঁধাইও সুন্দর। সবদিক থেকে ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখবার মতো বই।

আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন হল অসীম রেজের *হরাংহল ও অন্যান্য*। অদ্ভুত নাম। আরও অদ্ভুত 'হরাংহল' নামে গল্পটি। স্বপ্ন, স্মৃতি, সত্য ঘটনা, অবদমিত কল্পনা, সময়ের পরম্পরা সম্বন্ধে ধারণার বিপর্যয় — সব মিলেমিশে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। শুধু নাম-গল্পটি নয়, অধিকাংশ গল্পই স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে আমাদের অভ্যস্ত বোধগুলিকে ভেঙেচুরে দিয়ে নতুন নতুন রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছে। অধিকাংশ গল্পের পাত্রপাত্রীর কোনও নাম নেই, তারা নামহীন অর্থাৎ অচিহ্ন, অধিকাংশ গল্পের কাহিনীই ছিন্নবিচ্ছিন্ন উপলব্ধির সমষ্টি, খবরের কাগজের প্রথম পাতার গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলোও যেমন পারস্পরিক সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন এক বিশেষ কালে ভাসমান একরাশ ঘটনা। প্রথম গল্প 'স্মৃতির অন্য নাম সূর্যমুখী'তে লেখক খবরের কাগজের তুলনাটাকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছেন। মানুষ ও তার ছায়া মিলে যেন দুটি ব্যক্তিত্ব, ক্ষণে ক্ষণে তার আচরণ পালটায়, সময়ের স্রোতে বেরিয়ে পড়ে তার বিবিধ রূপের অসামঞ্জস্য। আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে 'এই ছায়া তার ঘর'। আধুনিক জীবনের চাপে বিশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তির পরিচয় সমস্যা ও বহুবিধ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কৌতূহলোদ্দীপক প্রতিফলনে *হরাংহল ও অন্যান্য* সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যে একটা উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

**_ধূসর স্মৃতির দেশে_ অধীর ঘটক দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানী**
**৫৪/৩ কলেজ স্ট্রিট কলকাতা ৭৩ মূল্য একুশ টাকা**
**_মুক্তিযুদ্ধের গল্প_ ওম প্রকাশ ঘোষ রায় জনতা বুক হাউস ১৫৫ আঞ্জুমন বিপণি চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) মূল্য চল্লিশ টাকা**

**_ভারতীয় রূপকথা ও লোককথা_ ড. সুধীন এন. ঘোষ অনুবাদ সরিৎশেখর মজুমদার রূপা অ্যান্ড কোম্পানী ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭৩ মূল্য ষাট টাকা**
**_হরাংহল ও অন্যান্য_ অসীম রেজ প্রমা প্রকাশনী ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ কলকাতা ১৭ মূল্য কুড়ি টাকা**

# এক নজরে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং শিল্পের বর্তমান সঙ্কট

বেণু গুহঠাকুরতা

আজকাল কাগজ খুললেই একটি ইংরেজি শব্দের দেখা মেলে। শব্দটি হল scam যার অর্থ বহু ইংরেজি অভিধানে পাওয়া যায় না। কারণ শব্দটির কৌলিন্য নেই। অর্থাৎ শব্দটি একটি ইংরেজি slang — তাই এর স্থান সাধু-সন্ত মহলে অচল। এক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে অশাস্ত্রীয় আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে।

আমাদেশ দেশে এই scam-এর সঙ্গে যাকে জড়িত দেখা যাচ্ছে সব থেকে বেশি, তা হল এদেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা। যদিও এর সিংহভাগের মালিকানা রাষ্ট্রের এবং এই ব্যবস্থার সমর্থক বাম-ডান নির্বিশেষে সবাই। তাহলে এ ধরনের ঘটনা ঘটে কেন এটাই এ প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

*ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাতে scam নতুন নয়*

আমাদের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার যে হিসেবপত্র প্রতি বছর জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয়, তার অনেকটাই আপাত সত্য, প্রকৃত তথ্য এর মধ্যে থাকে না। কারণ সঠিক তথ্য প্রকাশ হলে অর্থনীতিতে বিপদ আসতে পারে।

১লা জুলাই The Statesman পত্রিকায় যে রিপোর্ট তাঁদের বিশেষজ্ঞ পেশ করেছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি যে "The salient feature of Indian banking is that nationalised banks prepare their annual accounts largely on the basis of unreconciled book of accounts. And even if conservative estimates are considered, the variation between published profit and actual figures will easily exceed Rs 10,000 crores." অর্থাৎ গোঁজামিলের পরিমাণ দশ হাজার কোটি টাকারও বেশি। শুধু তাইনয় "According to a parliamentery committee on government assurances report, the amount involved in inter-bank reconciliation was Rs 231,000 crores. Yet this did not move anybody to action" !

*১৯৯১-৯২ তে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শিট*

একটু পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে বেশির ভাগ ব্যাঙ্কের হিসাবপত্রই শাস্ত্রসম্মত নয়। এক এক করে দেখা যাক।

১. *কানাড়া ব্যাঙ্ক* এ বৎসর এরা লাভ দেখিয়েছেন ১৫৬.৬ কোটি টাকা। কিন্তু এর ৫৫৮ টি শাখার হিসেবপত্র অডিটার দ্বারা পরীক্ষিত নয়।

২. *ব্যাঙ্ক অব বরোদা* এ বৎসর লাভ দেখানো হয়েছে ৯৫ কোটি টাকা। হিসেব পরীক্ষিত নয় এমন শাখার সংখ্যা ৯১৫টি।

৩. *সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া* লাভ দেখিয়েছেন ৩০.৪৯ কোটি টাকা। হিসেব পরীক্ষিত হয় নি এমন শাখার সংখ্যা ১৪৯৫টি।

৪. *ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক* লাভ দেখানো হয়েছে ৯ কোটি টাকা। হিসেব পরীক্ষা করা হয় নি ৪৯২টি শাখার।

৫. *ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক* লোকসান দেখানো হয়েছে ২০.৯৮ কোটি টাকা (এদের Accumulated loss - এর পরিমাণ ১১৯ কোটি টাকা)। হিসেব পরীক্ষা করা হয় নি ৮৫২টি শাখার।

৬. *ইউ বি আই* লাভ দেখিয়েছেন ৬.৬৯ কোটি টাকা। ৬৬০টি শাখাতে অডিট হয় নি।

৭. *এলাহাবাদব্যাঙ্ক* লাভদেখানো হয়েছে২৮ কোটি টাকা। অডিট হয় নি ৯৫০টি শাখাতে।

তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। চিত্র মোটামুটি সর্বত্র একই।

*অডিটাররা কী বলেন এ সম্পর্কে*

ব্যাঙ্ক অব বরোদার অডিটাররা এদের ব্যালান্স শিটে মন্তব্য করেছেন যে এতে সংযুক্ত করা হয়েছে "Unaudited returns in respect of branches not visited by us."এমনকি এদের বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে অবস্থিত দুটি শাখার হিসাবপত্র ১৯৬৫ থেকে অর্থাৎ গত ২৭ বৎসর ধরে অডিট হয় নি। The auditors point out right at the outset that the Bank of Baroda's balance sheet does not conform to the accounts standard issued by the Institute of Chartered Accountants and that they have not ventured into the exercise of ascertaining the impacts of their standard on the profits. Nor do the accounts conform to the requirements of the Third schedule of the banking regulations 1949, since





the Bank of Baroda failed to supply all informations relevant to the format. There have also been reclassification of the figures following amendment (to the third schedule) which the auditors were unable to verify." এদের গত বৎসরের ব্যালান্স শিটেও অডিটাররা মন্তব্য করেছিলেন "Pending completion of the aforesaid balancing / reconciliation / matching / follow-up. the effect of consequential adjustments on these accounts is not currently ascertainable (Statesman 1st July '92)

এ ছাড়াও আছে নানান মন্তব্য যা থেকে বেরিয়ে আসবে যে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক তাদের লাভের যে অঙ্ক জনসাধারণের কাছে পেশ করেছেন তা শাস্ত্রসম্মত নয়। যেমন ধরুন

১. *সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া* লাভ ঘোষণা করেছেন ৩০.৪৯ কোটি টাকা। অথচ এরা ৭১.১৯ কোটি টাকা ইনকাম ট্যাক্স এখনও দেন নি এবং এই বাবদ কোন টাকা ব্যালান্স শিটে প্রভিশন করেন নি। যদি তা করা হত তা হলে তাদের লাভের পরিবর্তে লোকসান দেখাতে হত (৭১.১৯ — ৩০.৪৯) ৪০.৭০ কোটি টাকা।

২. *ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া* লাভ দেখিয়েছেন ৬.৬৩ কোটি টাকা। এদের অডিটর মন্তব্য করেছেন যে ব্যাঙ্ক "has taken credit for unrealised gain on certain foreign exchange transaction, commission income and also interest on hard, sticky and certain other specified advances." এ ছাড়া এরা ট্যাক্সমাতে যে টাকা প্রভিশন করেছেন আর সরকার যা দাবি করেছেন তার মধ্যে ফারাক হল ১৪৭.১১ কোটি টাকা। এবার আপনি হিসেব করুন এদের ক্ষতির পরিমাণ।

৩. *ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক* লাভের অঙ্ক দেখানো হয়েছে ৯.০৫ কোটি টাকা। অথচ এদের বিদেশে bad and doubtful debt -এর পরিমাণ হল ৪৯৫.৫৪ কোটি টাকা, যা এরা ব্যালান্স শিটে প্রভিশন করেন নি। যদি তা করা হত তা হলে লাভের বদলে ক্ষতি দেখাতে হত (৪৯৪.৫৪ — ৯.০৫) ৪৮৬.৪৯ কোটি টাকা।

৪. *ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক* এদের Accumulated loss এর পরিমাণ হল ১১৯কোটি টাকা। এদের অডিটার মন্তব্য করেছেন এরা ১২৫ কোটি টাকার "bad and doubtful debts" প্রভিশন করেন নি। যদি তা করা হত তাহলে তাদের মোট লোকসানের পরিমাণ হত ২৪৪ কোটি টাকা।

৫. *এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক* এ বছরে লাভ দেখানো হয়েছে ২৮.১১ কোটি টাকা। এরাও bad and doubtful debts বাবদ ২৫.০৯ কোটি টাকা প্রভিশন করেন নি। যদি তা করা হত তাহলে লাভের অঙ্কটা কমে গিয়ে দাঁড়াত (২৮.১১ — ২৫.০৯) ৩.১০ কোটি টাকা। স্থানাভাবে এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করছি।

এই যে অঙ্ক ওপরে বলা হল এটাও কিন্তু পাক্কা নয়। কারণ Accounting procedure অনুযায়ী ব্যাঙ্কের হাতে যে লোন বণ্ড আছে (যাকে সিকিউরিটি বণ্ড বলা হচ্ছে সেই বণ্ডের মূল্য বাজারদর অনুযায়ী ব্যালান্স শিটে দেখানো উচিত। কিন্তু বেশির ভাগ ব্যাঙ্ক তা করে না। তারা ওটাকে কেনামূল্যেই ব্যালান্স শিটে দেখায়। এই ব্যবস্থাটা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে কারণ এর বাজারদর সবসময় কম থাকে। আগামী বছর থেকে তাদের এই Security Portfolio-তে ৩০% ডেপ্রিসিয়েশন বাধ্যমূলকভাবে দিতে হবে। এ বছরের ব্যালান্স শিটে যদি তার প্রতিফলন দেখানো যায় তাহলে অবস্থাটা কী হবে সেটা নীচে দেখানো হল।

১৯৯১ — ৯২

| | ঘোষিত লাভ | লাভ হত |
|---|---|---|
| ১. কানাড়া ব্যাঙ্ক | ১৫৬.৬০ কোটি | ১৫৬.৬০ কোটি |
| ২. ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া | ৫৬.৬০ কোটি | ৫৬.৬০ কোটি |
| ৩. পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক | ১১২.৪৪ কোটি | ১১২.৪৪ কোটি |
| ৪. ব্যাঙ্ক অব বরোদা | ৯৫.১০ কোটি | ২৪.৫০ কোটি |
| ৫. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া | ২৯.৪৫ কোটি | — ৮.০৮ কোটি |
| ৬. সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া | ৩০.৪৯ কোটি | — ৪৫.০৮ কোটি |
| ৭. এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক | ২৮.১০ কোটি | — ৩০.৫৪ কোটি |
| ৮. ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক | ৯.০৫ কোটি | — ১৩.০৫ কোটি |
| ৯. ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক | — ২০.৯৮ কোটি | — ৪০.৯৮ কোটি |
| ১০. ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া | ৬.৬৯ কোটি | — ৪১.৩০ কোটি |

*সূত্র : Business To-day জুলাই '৯২ ৭-১২ সংখ্যা*

অর্থাৎ যেদিক দিয়েই দেখি না কেন এই তথ্যগুলি থেকে এটা পরিষ্কার যে বেশির ভাগ ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শিট শাস্ত্রসম্মত নয়।

***এই দুর্বলতা কেন ?***

এর মূল কারণ ব্যাঙ্কের হাতে যে অর্থ জনসাধারণের আছে ডিপোজিট হিসেবে (যার বর্তমান পরিমাণ প্রায় ২৪০,০০০ কোটি টাকা) এর বেশির ভাগটাই চলে যায় সরকারের দখলে। যেহেতু আমাদের অর্থনীতিটাই নড়বড়ে অতএব ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাটা সবল হওয়া সম্ভব নয়। একটু খুলে বলা যাক। যেমন সরকারের বাজারে লোনবণ্ড আছে দু-লক্ষ কোটি টাকার। সরকার নিয়ম করলেন এই বণ্ডের শতকরা ৪০ ভাগ ব্যাঙ্কের পক্ষে কেনা বাধ্যতামূলক। অতএব ব্যাঙ্কের

৮০,০০০ কোটি টাকা আটকে রইল ঐ খাতে যার ওপর সরকারী সুদ ১১%। এতে ব্যাঙ্কের কোন লাভ নেই কারণ ব্যাঙ্কও টাকাটা বাজার থেকে আনছে সুদ দিয়ে যার পরিমাণ সকলেরই জানা। এটা গেল একদিক। অপরদিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি ব্যাঙ্ককে একটা নিয়তম অঙ্কের টাকা দেনদারদের স্বার্থে অথবা জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে রাখতেই হয় যার পরিমাণ কম নয়। বর্তমানে প্রতিটি ব্যাঙ্কের মোট ডিপোজিটের শতকরা ৩০ ভাগ টাকা রাখতে হয় Stautory Liquidity Ratio হিসেবে। এছাড়াও তাকে রাখতে হবে আরও ১৫ ভাগ টাকা Cash Reserve Ratio খাতে। অর্থাৎ প্রতি ১০০ টাকার মধ্যে ৪৫ টাকা ব্যাঙ্ক বাজারে লাগিয়ে উপার্জন করতে পারবেন না। এবং এই Ratio যদি কমে যায় তাহলে Reserve ব্যাঙ্ক তাঁদের Penalty clause অনুযায়ী শাস্তি বিধান করবেন।

এবার যে ৫৫ টাকা রইল তার ৪০ ভাগ টাকা অর্থাৎ ২২ টাকা তাকে নিয়োজিত করতে হবে high risk low yielding area-তে অর্থাৎ কৃষি এবং অন্যান্য প্রায়রিটি সেক্টরে। যেখানে লাভের আশা অত্যন্ত কম। ধরুন যদি অজন্মা হয় তখন চাষীদের কাছে মূল ফেরৎ পাওয়াই মুশকিল। সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার এই টাকাটাও ব্যাঙ্ক এনেছে বাজার থেকে ধার করে সুদের বিনিময়ে। এছাড়াও আছে Export Credit ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেখানে সুদের হার কম। এক্ষেত্রে আটকে থাকে আরও পাঁচ টাকা। অর্থাৎ প্রতি একশো টাকায় ৭২.৫০ টাকা থেকে ব্যাঙ্কের উপার্জনের কোনও রাস্তা নেই বললেই চলে। অপরদিকে যে ৮০,০০০ কোটি টাকা সরকারী বণ্ড ব্যাঙ্কের হাতে আছে, সেটা থেকে তার কোনও আয় তো হয় না বরং লোকসান দিতে হয় কারণ এর বাজারদর সবসময়ই এর face value থেকে কম থাকে। অতএব এর লোকসানের দায়টা ব্যাঙ্কের ঘাড়েই চাপে, যে কথা একটু আগে বলেছি।

তাহলে বাজারে খাটিয়ে যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করার জন্য ব্যাঙ্কের হাতে রইল প্রতি একশ টাকার মধ্যে মাত্র ২৭.৫০ টাকা। এটাকে খাটিয়েই তাকে উপার্জন করতে হবে, তার দেনদারদের সুদ এবং তার কর্মচারীদের বেতন সর্বোপরি একটা ভদ্রস্থ মুনাফার অঙ্ক; যাতে তাদের কর্তাব্যক্তিদের সুনাম বজায় থাকে। ফলে অভাবে স্বভাব নষ্ট। চট্‌জলদি মুনাফা সর্বকালেই চোরা পথে হয়। এদেশেও তাই হয়েছে। তা নাহলে চাকরি থাকে না। এটাও scam এর অন্যতম একটি কারণ।

বর্তমানে যেটা নিয়ে এত হৈচৈ হচ্ছে, সেটা হল সরকারী Treasury function-এর টাকার শেয়ার বাজারে প্রবেশ।



Statutory liquidity Ratio বজায় রাখবার জন্য প্রতিদিনই সরকারী বণ্ড বেচাকেনা হয় দালালদের মারফৎ। এর হিসেব রাখেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তার জন্য আলাদা অফিস আছে যার নাম, পাবলিক ডেট অফিস। এই সমস্ত ব্যাপারটা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে লেজারে নথীবদ্ধ হতে সময় লেগে যায় ছয় সপ্তাহ। প্রতিদিন প্রায় বেচাকেনা হয় ৬০০০ কোটি টাকার বণ্ড। যে ব্যাঙ্ক এই বণ্ড কিনবে তাকে বিক্রেতা ব্যাঙ্কের উপর সমমূল্যের একটি চেক দেবার কথা। এই চেক পাওয়ার পর ক্রেতা ব্যাঙ্ক বিক্রেতা ব্যাঙ্ককে দেবেন একটি রসিদ যেটা ব্যাঙ্কারস রিসিপট বলে পরিচিত। এক্ষেত্রে সবই হচ্ছিল কিন্তু টাকাটা গিয়ে জমা হচ্ছিল ব্রোকারের একাউন্টে, ব্যাঙ্কের একাউন্টে নয়। ফলে হাজার হাজার কোটি টাকা এইভাবে শেয়ার বাজারে এসে প্রবেশ করছিল। এছাড়াও ছিল জাল ব্যাঙ্ক রিসিপট, যাকে ভাঙিয়ে আবার ব্রোকাররা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে শেয়ার বাজারে নিয়ে আসছিল। এর থেকে যে লাভ হচ্ছিল তার একটা অংশ নানাভাবে ব্যাঙ্কের ঘরেও ঢুকছিল। এই বর্তমানের ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শিটগুলির দিকে তাকালে এই তথ্যটা হয়তো বেরিয়ে আসবে।

যেখানে অর্থনীতিতে ভাটা চলছে, শিল্প-উৎপাদনের হার কম, রপ্তানি বাণিজ্যের মরণদশা সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির ফলে, কৃষিতে সমস্যা, আবার খাদ্য আমদানির কথা শোনা যাচ্ছে, তখন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাতে এমন কি হল যাতে তাদের মুনাফার হার এত বেড়ে গেল? সন্দেহ হতেই পারে যে টাকাটা সৎপথে উপার্জিত হয় নি। এ ব্যাপারটাতে একটু পরে আসা যাবে।

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাতে এই scam বহুদিন থেকেই চলে আসছিল। ১৬ই জুলাইয়ের The Telegraph এর পাতায় Mr. Nimesh Kampany যিনি JM Financial Service and Investment Consultancy Service-এর চেয়ারম্যান, লিখেছেন, "Finally here is an illustration of how practices which have now been termed as scam were prevalent in the market longback. Four years back we had purchased tax-free bonds for a client through some brokers form Calcutta. We were not getting delivery of the bonds and when we insisted on delivery, the brokers said, they were holding a bank receipt from a foreign bank. So through our good offices we requested the bank to make delivery to the Calcutta brokers. This bank said they are holding the bank receipt of another bank in Bombay. We went to the particular Bombay branch of the foreign bank and requested delivery to the bank in Calcutta and settlement of the matter by delivery to brokers or directly to us. But the bank said they are holding a receipt of a Madras-based bank. This whole ridiculous farce took us about two and half months to go through and ultimately we gave up on the chase and opted for a direct settlement with the Calcutta broker after some compensation. এ ধরনের আরও উদাহরণ দেয়া যেতে পারে প্রয়োজনে।

হাতের কাছে যা তথ্য আছে তার থেকে দেখা যায় স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া গত বৎসরের তুলনায় মুনাফা করেছে ৯২৮% বেশি। গত বৎসর এরা লাভ করেছিল ১০৭ কোটি টাকা, এবার করেছেন ৯৯৩ কোটি টাকা। তবে এই জালিয়াতি ধরা পড়ায় তাদের ৭৯৮ কোটি টাকা প্রভিশন করতে হয়েছে, ফলে তা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৫ কোটি টাকায়। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া গত বৎসর লাভ করেছিল ৯.৪৭ কোটি টাকা। এবার তা বেড়ে হয়েছে ৩০.৪৯ কোটি টাকা অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ২২২%। ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার লাভের হার বেড়েছে ২০০ %। এছাড়াও ১৪টি ব্যাঙ্কের যে তথ্য আমার হাতে আছে তাতে দেখা যায় গত বৎসর এরা Provision/Contingencies খাতে দেখিয়েছিল মোট ৯৭২ কোটি টাকা। এর থেকেও এদের মুনাফার বহরটা কিছু আন্দাজ করা যেতে পারে। কারণ এই টাকাটা বাদ দিয়েই এরা বর্তমান লাভের অঙ্কে পৌঁছেছেন। অতএব কে কতটা এই scam এ জড়িত একথা প্রমাণিত না হলেও সবাই যে quick money-র পেছনে ছুটছিল এটা বুঝতে পারা যায়।

সবার? যে সিকিউরিটি বিক্রির টাকা ব্যাঙ্কে জমা না করে শেয়ার বাজারে খাটাতে দিয়েছেন তা তো নয়। সিকিউরিটি ছাড়াই টাকা দিয়েছেন ন্যাশনাল হাউসিং ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক অব কারাদ জানা ব্যাঙ্ক রিসিটে বাজার ছেয়ে দিয়েছিল। আর তাই দেখিয়ে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কাটাতে লাগানো হয়েছিল। এছাড়াও টাকা দেয়া হয়েছে নানা ভাবে। যেমন ইউকো ব্যাঙ্ক Bill financing-এর নাম করে কোন রকম লেনদেন ছাড়াই দালালদের টাকা দিয়েছে।

মনমোহন সিং এক ইন্টারভিউতে বলেছেন "But let me be candid . People mostly thought frauds occur in credit transactions. Nobody could imagine that the treasury function of the bank's would be misused in the manner in which it has. This was the weak point of the bank system — The treasury management function."

অর্থমন্ত্রীর মতে "Computerisation cannot prevent frauds" এতে একমাত্র চুরি আগে ধরা পড়বে। তিনি যে সমাধানের কথা বলছেন সেটা হল "So we need to strengthen the RBI's inspection machinery" কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হবে কি? ব্যাঙ্ককর্তারা যদি মিথ্যে কথা বলেন তাহলে কী হবে। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন "RBI did face certain tendencies, bankers receipt has been misused and it issued a circular when it noticed (this). It also got compliance from the SBI, from standard chartered bank, that these banks had looked into this, that all these things would not be repeated and treasury operations of the bank would be conducted in accordance with the guide lines." পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে ব্যাঙ্কের কর্তারা শুধু মিথ্যে কথাই বলেন নি ব্যাঙ্কের মুনাফা বাড়াবার জন্য এতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেছেন "Perosnally I think its a case of fraudulent collaboration between various bank functioneries and those who operate in the stock market. তিনি আরও বলেছেন "The primary responsibility for what has happened is that of the bank managements (Business World 15 — 31 July 1992)

এত কথা বলার পরেও একটা কথা থেকেই যায় যে বর্তমান ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার যে সঙ্কট তার থেকে ব্যাঙ্ক ম্যানেজমেন্ট বের হবেন কোন পথে? কারণ ডিপোজিটের বেশির ভাগ টাকার উপর সরকারি খবরদারির ফলে ব্যাঙ্কের কর্তাদের কাছে বাজারে খাটাবার মতো অর্থের স্বল্পতায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে তো শিল্পকে লাভজনক করে তোলা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। অথচ লাভজনক করে তুলতে না পারলে কোনও শিল্পই স্থায়ী হতে পারে না। এই অবস্থায় ব্যাঙ্ক ম্যানেজমেন্ট করবেন কী? সঙ্কটের এই দিকটা নিয়ে কেউ কি কিছু ভাবছেন?

# SAARC-এর অভিজ্ঞতা কনফেডারেল ব্যবস্থার পক্ষে আশাব্যঞ্জক নয়

শিবনারায়ণ রায় মহাশয়ের ''নিশিদিন ভরসা রাখিস: ফেব্রুয়ারির উত্তাল বাংলাদেশ'' (চতুরঙ্গ মে সংখ্যা) প্রবন্ধটি পড়লাম। অত্যন্ত মননশীল এবং সৃজনশীল। এই জাতীয় লেখাই বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা দূর করে দিতে পারে। তবে এই লেখার একটি অংশ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেওয়ায় এই চিঠির অবতারণা। অবশ্য তা কখনোই কিন্তু সমালোচনা নয়। শুধুই কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা। এই প্রবন্ধের ১৭ পৃষ্ঠার শেষ কয়েকটি লাইন সম্পর্কে। লেখক তাঁর প্রদত্ত ভাষণে এক স্থানে বলেছেন যে, ''এক ভাষাভাষী যে সব দেশে চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশ বছর আগে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছিল এখন তারা অনেকেই পুনর্মিলিত হয়েছে বা হবার চেষ্টা করেছে।'' এখন প্রশ্ন সেই সব রাষ্ট্রগুলি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছিল না তাদের বিভক্ত করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত ৪০/৪৫ বছরে অনেকেই পুনর্মিলিত হয়েছে বা হবার চেষ্টা করছে বলতে লেখক স্পষ্টতই পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি ও উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার কথা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি এবং উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে কি পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের তুলনা করা চলে? শুধু ভাষার দ্বারাই কিন্তু তারা একত্রিত একথা সঠিক ভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব কি? খবরের কাগজ পড়ে যেটুকু জেনেছি তাতে বুঝেছি যে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির ধর্ম, ভাষা, ও সংস্কৃতি একই। তাছাড়া দুই রাষ্ট্রের জনগণের মিলেমিশে যাবার ইচ্ছাও ছিল প্রবল। সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার পশ্চিম জার্মানির আর্থিক দিক থেকে সাফল্য ও সর্বব্যাপারে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পূর্ব জার্মানির লোকেদের মিশে যাওয়ার ইচ্ছাটি ছিল প্রবল। যদিও আমরা এখন জানতে পারছি পূর্ব জার্মানির অনেকে আতঙ্কিত যে পশ্চিম জার্মানির প্রভুত্ব সর্বক্ষেত্রে দেখা দেবে কি না। তা সত্ত্বেও দুই দেশের জনগণের মধ্যে কিন্তু 'কে প্রধান' এই জাতীয় কমপ্লেক্স দেখা দেয় নি। তারা একই রাষ্ট্রের এই ধারণা ছিল বদ্ধমূল।

কিন্তু যদিও লেখক বলেছেন, ''না, বাংলাদেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে এ প্রস্তাব একেবারেই অসঙ্গত এবং আমার কাছে একেবারেই কাম্য ঠেকে না''—তখন প্রশ্ন জাগে তাহলে কি করে দুই ভাষাভাষীর মিলন সম্ভব? তাহলে কি পশ্চিমবঙ্গ ভারত থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্তি ঘোষণা করবে? যদিও লেখক বলেছেন 'আমি মুখ্যত সাংস্কৃতিক নৈকট্যের পথে বাধার অপসারণের কথাই ভাবছি'—তবুও তাঁর কাছে প্রশ্ন থেকে যায় সাংস্কৃতিক মনন সম্পন্ন ক-জন লোক পরস্পরের কাছাকাছি আসেন? সাংস্কৃতিক নৈকট্য যতদিন সকলের মধ্যে সত্যিকারের শিক্ষা না আসবে ততদিন কি আসা সম্ভব? বই মেলায় দু-দেশের বই এলে বা গেলেই কি সাংস্কৃতিক নৈকট্য বাড়বে? মনে তো একেবারেই তা হয় না। যদি তাই হত তবে নিশ্চয়ই দু-দেশের বুদ্ধিজীবীরা দেশ বিভাগের পর প্রায় ৫০ বছর কেটে গেছে অন্তত একবার দু-দেশের মিলনের জন্য মিছিল বের করতে বা সংগ্রাম কমিটি তৈরি করতে পারতেন। আসলে আপনি ও আপনার মতো গুটিকয়েক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন গুণীজনেরা মিলনের ব্যাপারটিকে সহজভাবে দেখলেও অনেকেই কিন্তু বই কিনতে হয় কিংবা হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই বা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ একই ভাষাগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও বিভক্ত—এই জাতীয় কথা বলতে হয় তাই বলেন। তাঁরা সব সময়ই মিলন শব্দটিকে অধরা রাখতে চান।

সবশেষে লেখক বলতে চেয়েছেন যে ভারতে যদি একটি যথার্থ সমামেল বা কনফেডারাল ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তবে একদিন দু-রাষ্ট্রের বিশেষ করে দু-বাংলার মিলন সম্ভব। কিন্তু ভারতের বর্তমানে যে রাষ্ট্রিক ও প্রাকৃতিক গঠন আছে সেই ব্যবস্থায় কি করে যথার্থ সমামেল ব্যবস্থা সম্ভব? তাছাড়া SAARC নামে দক্ষিণ এশিয়ায় যে একটি সংগঠন আছে তারও কিছু সাংস্কৃতিক কাজ আছে; তা সত্ত্বেও কিন্তু জন্মলগ্নেই SAARC ব্যর্থ বলতে পারি। কারণ বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের মনের ব্যাপারটি তো আর মুছে ফেলা যায় না। তাই বিভিন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি কিন্তু এখনো পর্যন্ত এমন কোন অভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারে নি, যা রাষ্ট্রগুলির বন্ধনকে জোরদার করে।

*পার্থ সারথি রুদ্র*
*করিমপুর, নদীয়া*



# ফকিরমোহন সেনাপতি ''১৩৫০-এর মন্বন্তর.....''

'চতুরঙ্গে'র জুন ১৯২২ সংখ্যায় শ্রীমতী এথা দে ওড়িয়া উপন্যাসের জনক ফকিরমোহন সেনাপতি' সম্বন্ধে যে-মন্তব্যগুলি করেছেন সেগুলির সঙ্গে আমি কয়েকটি কথা যোগ করতে চাই। ফকিরমোহনের প্রথম উপন্যাস *ছমান আঠগুণ্ঠা* সাহিত্য আকাদেমি কর্তৃক *উনিশ বিঘা দুই কাঠা* নামে বাংলায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর অপর বিখ্যাত উপন্যাস *মাযু*। তাঁর অসাধারণ আত্মকথারও বাংলা অনুবাদ *অলেখা* নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

*উনিশ বিঘা দুই কাঠা* ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে লেখা প্রথম ওড়িয়া উপন্যাস, স্বাভাবিক ভাবেই বাঁধুনি কিছু শিথিল। উপন্যাসটি সম্বন্ধে শ্রীমতী দে লিখেছেন, 'নকশাপন্থী বর্ণনারীতি'। তবে ঐ বর্ণনারীতিকে সাংবাদিকতার লক্ষণাক্রান্ত বললেই বোধহয় যথার্থ হয়। উপন্যাসটির শেষে আছে খুনের মামলা। ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশের সময় ঐ মামলার কথা পড়ে নানা জায়গা থেকে অনেকে কটকের আদালতে শুনানি শুনতে এসে জানতে পারেন যে মামলাটা আসলে গল্প। খুব কম উপন্যাসই পাঠক মহলে এভাবে প্রকৃত ঘটনার বিভ্রম জাগাতে পারে।

বিষয়ের দিক থেকে উপন্যাসটি আমাদের অভিনিবেশ দাবি করে। কৃষিপ্রধান সমাজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা লোভ-লালসা-লুণ্ঠন-শোষণের অশুভ শক্তিকে সেই ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ফকিরমোহন যেভাবে শনাক্ত করেছেন এবং তার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন তেমনভাবে কোনও বাঙালি ঔপন্যাসিক করেন নি। আজকের বিচারে উপন্যাসটি ততখানি শিল্প-সমৃদ্ধ নয় যতখানি বিষয়বস্তুর জন্যে তাৎপর্যপূর্ণ। একান্নবর্তী সংসারের নস্টালজিক কাহিনী উদ্ভাবনে নয়, উপন্যাসটির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য সমাজে আর্থনীতিক কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্যে মানুষের অমানুষিক প্রচেষ্টার বিশ্বস্ত রূপায়ণে। বিত্তে শক্তিমান কীভাবে দুর্বলকে শোষণ করে তার এমন জ্বলন্ত কাহিনী ভারতীয় সাহিত্যে দুর্লভ।

*সুরজিৎ দাশগুপ্ত*
*৯৭এ রিজেন্ট এস্টেট কলকাতা-৯২*

আমার '১৩৫০-এর মন্বন্তর: বিক্রমপুর ঢাকা' (মার্চ ১৯৯২) লেখাটির উপর জুন সংখ্যায় শ্রীতাপস সিং হরায়ের মন্তব্যটি পড়ে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই। আমার রচনা বই হিসাবে এখনও ছাপা হয় নি, বইতে যথাস্থানে শ্রীসিং হরায়ের মন্তব্যের উল্লেখ আমি করব।

যে সব জেলায় ডিনায়াল পলিসি চালু হয় সেখানে গ্রামে গ্রামে ইউনিয়নের বোর্ডের চৌকিদাররা ঢোল-ট্যাটরা পিটিয়ে সরকারী হুকুম জারি করেন অল্প আগে। তদানীন্তন মন্ত্রীর মন্তব্যের কথা শ্রীসিংহরায় উল্লেখ করেছেন, কিন্তু গভর্নর বা প্রশাসন তাতে বিশেষ কর্ণপাত করেন নি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো নির্ভীক সম্পাদক এবিষয়ে প্রবাসীতে লেখেন, তবে তাঁরও লেখা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ তীক্ষ্ণ নয়, মৃদু। শ্রীসিংহরায় যে সব পাক্ষিক রিপোর্টের উল্লেখ করেন, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৫২ সালে আমি যখন মহাফেজখানায় খোঁজ করি তখনও এই কাগজগুলি গুছিয়ে রাখা হয় নি। তবে এগুলি এসডিও হিসাবে আমি মুন্সিগঞ্জে পেতুম। এখন সেগুলির কথা জেনে আমি বিশেষ আনন্দিত। নিউ দিল্লির ১৪।৭।৪২, ফাইল ৩৮০/৪২১-এর নির্দেশের কথা শ্রীসিংহরায় যে উল্লেখ করেছেন, শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর কাছে আমি পরে শুনি। এ নিয়ে কেন্দ্রীয় সভায় তিনিই অনেক প্রশ্ন তুলেছিলেন। বলা বাহুল্য নথিপত্রে সব সাফাই সাজিয়ে দুরস্ত থাকবে অথচ কার্যত অন্য রকম হবে, এরকম নীতি বৃটিশ সরকার চিরকালই অনুসরণ করেছেন, যাতে পরে খুব দোষ না পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ কতখানি পালিত হয়েছে, তার হিসাবনিকাশ চাওয়া বা দেবার কথা আমার জানা নেই। এসব আমার সাফাই হিসাবে শ্রীসিংহরায় যেন না নেন। তিনি যে বাঙালি গবেষকের উপযুক্ত ধ্যান আমার সামান্য লেখায় দিয়েছেন, তার জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। পত্রটি ছাপিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক
*অশোকমিত্র*
৫০৫ যোধপুর পার্ক
কলকাতা ৭০০ ০৬৮

# প্রমথ চৌধুরীর ছেলে রবীন্দ্রনাথের জামাই নন

ওয়াকিল আহমদ 'লোকসাহিত্যে আত্মীয়তা সম্পর্ক' প্রবন্ধে (চতুরঙ্গ, জুন ৯২) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মেয়ে-জামাইয়ের সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে একটা মারাত্মক তথ্যগত ভুল করেছেন। ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন ''রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঋণ করে মেয়ের যৌতুক দেন—জামাতা ছিলেন প্রমথ চৌধুরীর ছেলে''। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর ছেলে রবীন্দ্রনাথের জামাই নন। তাছাড়া প্রমথ চৌধুরী নিঃসন্তান এবং নিজেই রবীন্দ্রনাথের 'ভাইজামাই' (দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাই)। সকলেই জানি প্রমথ চৌধুরী ইন্দিরা দেবীকে কীভাবে বিয়ে করেন। ওঁদের বিবাহপূর্ব প্রণয়লিপি বাংলায় পত্রসাহিত্যের মর্যাদা বাড়িয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকেও জামাইদের জন্য যৌতুক দিতে হয়েছিল। এই যৌতুকের কারণে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট অর্থকষ্ট মনোবেদনার মধ্যে থাকতে হয়েছিল। প্রত্যেক পণ যে জামাইকে দিতে হয়েছিল সেই জামাই শ্রীমান শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। যিনি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র। যে বিহারীলাল ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একদা সাহিত্যগুরু। এ প্রসঙ্গে বলা যায় রবীন্দ্রনাথরা একাধারে পিরালী এবং ব্রাহ্ম হওয়ায় ওঁদের বাড়ির মেয়েদের বিয়ে দেওয়ায় যথেষ্ট সমস্যা হয়েছিল। অধিকাংশ জামাইদের বিয়ের পরে 'জাত হারিয়ে' ব্রাহ্ম হয়ে ঘরজামাই হয়ে ঠাকুর বাড়িতে থাকতে হত।

রবীন্দ্রনাথের বড়োমেয়ে মাধুরীলতার সঙ্গে বিহারীলাল চক্রবর্তীর ছেলে শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর বিয়ে হয়। যোগ্য ছেলে এম. এ.বি.এল। মজঃফরপুরে ওকালতি করতেন। যদিও মেয়ের তুলনায় জামাই বয়সে ঢের বড়ো তবু তাঁরা উচ্চঘর 'সোনার বামুন' তাই পণের দাবি অঢেল। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন পণের টাকা দেবেন 'ঠাকুরবাড়ির নিয়মানুসারে বিয়ের পর। কিন্তু আর এক কবির ছেলে হবুজামাই বিশ্বকবিকে ছাড়লেন না—বিয়ের আগেই টাকা চাই, গয়না চাই। কবি তো কি, কবি তো মেয়ের বাবা। তাই কবির আর্তি, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার আর্তি জামায়ের কাছে ব্যর্থ হল এ বিয়ে হয় ১৩০৮ সনে। ঘটক প্রিয়নাথ সেন।

বড়োমেয়ের বিয়ের একমাসের মধ্যেই মেজো মেয়ে রেনুকা বা রানীর বিয়ে হল। এবার জামাই ডাক্তার। জামাইয়ের নাম — সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এল. এম. এস। মেজো-জামাইকেও কন্যাপণ দিতে হয়েছে কবির। তবে অন্য ভাবে। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যেটাকে কটাক্ষ করে বলেছেন ''বিবাহের পরেই ছেলেটি তার অ্যালোপ্যাথি ডিগ্রির উপর হোমিওপ্যাথির চূড়া চড়াবার জন্য আমেরিকা রওনা হলেন''। কটাক্ষ কেন? কবিকে জামাইয়ের ''হোমিওপ্যাথির চূড়ার' সব খরচ বহন করতে হয়েছিল। আবার রানীর বয়স কম বলে জামাইকে ফুলশয্যার আগেই বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

ছোটমেয়ে মীরার বিয়ে হয় ১৩১৪ সনে। এবার জামাই নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এ জামাই সুদর্শন তার উপর ব্রাহ্ম। কবির খুব পছন্দ। শান্তিনিকেতনের মন্দিরে আদি সমাজ পদ্ধতিতে বিয়ে হল। এই জামাইকেও পণ দিতে হয়েছে অন্যভাবে। কবি জামাতা নগেন্দ্রকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান পড়াতে পাঠালেন। যাবতীয় খরচ কবির নিজের। জীবনীকার বলছেন— 'রথীন্দ্রনাথ ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ...বিদেশে উভয়ের ব্যয়ভার বহন করতে কবিকে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছে। তখন তাঁর জীবন খুবই অনাড়ম্বর ছিল.....''।

*হাসির মল্লিক*
*জাঙ্গিপাড়া*
*হুগলি*

# প্রমাদ সংশোধন

আপনার চিঠি কালকেই পেয়েছি। আপনি যে দু-টি কালোল্লেখ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন তার প্রথমটির বেলায় আমারই ভুল হয়েছে। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কিন্তু সংশয় নিরসন সম্ভব হয় নি।

আমি ন্যাশান্যাল বুক ট্রাস্ট প্রকাশিত ''Prasanta Chandra Mahalanobis'' বইটি (লেখক প্রশান্তচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র অনীকেন্দ্র মহলানবিশ) আবার দেখলাম। সেখানে স্পষ্টই বলা আছে রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড বর্জন করলেন ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে (১৯২৬-এ নয়)। আমার এ-ভুলের জন্যে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। ''সঞ্চয়িতা''-র প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে। পৌষ মাসের কোন্ তারিখ হবে তা



কোথাও (''সঞ্চয়িতা''-র প্রথম দিকের পৃষ্ঠাগুলিতে বা ''রবীন্দ্ররচনাবলী''-তে) বলা নেই। যেহেতু এ-মাসের প্রায় অর্ধেক ছিল ১৯৩১-এর ডিসেম্বর, বাকিটা ১৯৩২-এর জানুয়ারি, তাই ১৯৩১ বা ১৯৩২ কোনোটাই না লিখে ১৯৩১-৩২ লেখা সঙ্গত হবে।

*তথ্যগত প্রমাদ*

আমি প্রকাশিত নিবন্ধটি আবার ভালো করে পড়লাম এবং যে সব বই থেকে তথ্য নিয়েছি সেসবও ঘাঁটলাম। আমার চোখে যেসব ভুল ধরা পড়েছে তার একটা তালিকা এ-সঙ্গে পাঠালাম। আপনি এ-গুলি সংশোধনের ব্যবস্থা করলে বাধিত হব।

*মুদ্রণ প্রমাদ*

| স্থান | মুদ্রিত রূপ | সঠিক রূপ |
|---|---|---|
| পৃঃ ৯১, প্রথম স্তম্ভ, ৩৩ম পংক্তি | বহুতল-বিশ্লেষণ | বহুচল-বিশ্লেষণ |
| —, দ্বিতীয় স্তম্ভ, ১ম পংক্তি | '' | '' |
| পৃঃ ৯২, প্রথম স্তম্ভ, ২১শ পংক্তি | কৃতি | কৃতী |
| —, দ্বিতীয় স্তম্ভ, ২৭শ পংক্তি | আর্থনীতির | আর্থনীতিক |
| পৃঃ ৯৪, দ্বিতীয় স্তম্ভ, ২৫শ পংক্তি | সমাজ পরিবর্তনে তাঁর এ আর একটি (নিদর্শন) | সমাজ পরিবর্তনে তাঁর উদ্যম বা প্রয়াসের এ আর একটি (নিদর্শন) |
| পৃঃ ৯৬, প্রথম স্তম্ভ, ৩৬শ পংক্তি | অপূর্ণ কুমার চন্দ্রের | অপূর্বকুমার চন্দের |
| পৃঃ ৯৮, প্রথম স্তম্ভ, ২৭শ পংক্তি | যোজন কমিশনের | যোজনা কমিশনের |
| পৃঃ ৯০, প্রথম স্তম্ভ, ২৯শ পংক্তি | (তাঁর) কাকা সুবোধচন্দ্র | (তাঁর) জ্যেঠামশাই সুবোধচন্দ্র |
| পৃঃ ৯৫, দ্বিতীয় স্তম্ভ, ৫ম পংক্তি | ১৯২৬-এ | ১৯১৯-এ |
| ——, ——, ২৪শ থেকে ২৮শ পংক্তি | ''কবি-পরিচিতি'' নাম দিয়ে..... সে-পত্রিকায়। | ''রবীন্দ্রপরিচয়'' নাম দিয়ে প্রশান্তচন্দ্র একটি প্রবন্ধমালা রচনা করেন, তা প্রকাশিত হয় তখনকার সেরা মাসিকপত্র ''প্রবাসী''-তে। |
| পৃঃ ৯৬, প্রথম স্তম্ভ, ৯ম পংক্তি | ১৯৩২১-এ | ১৯৩১-৩২ সালে |
| পৃঃ ৯৮, দ্বিতীয় স্তম্ভ, ১৭শ পংক্তি | তাঁকে | মহলানবিশ-দম্পতিকে |
| ——, ——, ২৫শ পংক্তি | তিনিই তার একমাত্র যাত্রী | তাঁরা দুজনই শুধু সে বিমানের যাত্রী |

*অতীন্দ্রমোহন গুণ*
*রাশিবিজ্ঞান বিভাগ প্রেসিডেন্সি কলেজ কলকাতা-৭৩*